মাসুদ রানা

# কুচক্র

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

# কুচক্র

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৮৯

## এক

হাতঘড়ি দেখল অরবিদ সিংহে ওরফে মাসুদ রানা। ভারতীয় সময় বিকেল চারটে পনেরো। এবার রওনা হতে হয়। সাক্ষাৎ করার জায়গাটা চাণক্যপুরী অর্থাৎ অশোকা হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে নয়, এক কিলোমিটারের মত হবে। চারতলার জানালা থেকে দেখা গেল ফুটপাথে ট্যুরিস্টদের ভিড়, বিকেলের ম্লান রোদ আর ফুরফুরে বাতাসের ভেতর হাঁটতে ভালই লাগবে। রেড ক্রস রোড চেনে রানা, তবে দিল্লী কাফেটা কোথায় জানা নেই—ওখানেই আসবে তাপস গাঙ্গুলী। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান বলে দিয়েছেন, 'সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে।' পাঁচটার মধ্যে তাপস যদি না পৌঁছোয়, এক দণ্ডও আর অপেক্ষা করবে না রানা।

রুমমেটরা সবাই বাইরে, লাল কার্পেট মোড়া করিডরে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগাল রানা। মনটা অস্থির হয়ে আছে ওর, এ-ধরনের সাক্ষাতে গুরুতর অঘটন ঘটে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। তবু, মন যতই উদ্বিগ্ন থাক আর করিডর যতই ফাঁকা হোক, চেহারায় ট্যুরিস্টসুলভ হাসিখুশি ভাব নিয়ে এগোল ও। অ্যাশ কালার স্যুট, সাদা পপলিন শার্ট আর কালো জুতো পরে আছে; সিংহলী যুবক অরবিদ সিংহের পকেটে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই।

এলিভেটর আর ফাঁদ প্রায় সমতুল্য, এড়াবার সুযোগ থাকলে ছাড়ে না রানা। সিঁড়ির দিকে হাঁটছে, একটুর জন্যে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল। এঞ্জিনের শব্দটা আগে শুনতে পায়নি, কারণ স্টার্ট নিয়েছে একেবারে শেষ মুহূর্তে। ড্রাইভারের বয়স পাঁচ কি ছয়, বাঁক ঘুরে রানার সামনে পড়েছে তিন চাকার সাইকেল, রানাকে দেখে মটরসাইকেল স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ হুবহু নকল করেছে। আঁতকে ওঠার ভান করে ছোট্ট এক লাফে সরে গেল রানা, পরমুহূর্তে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করল। ভাবগম্ভীর চেহারা নিয়ে কপালে হাত তুলল ছেলেটাও। হোটেলে ওঠার পর গত তিনদিন ধরে দেখছে রানা, সারাক্ষণ করিডরেই থাকে সে। তার মা-বাবা কাছাকাছি একটা স্যুইটে উঠেছে, একবার আধখোলা দরজার ভেতর তার মাকে দেখেছে ও, শাড়ি পরা নেপালী এক যুবতী—ছোটখাট হলেও শক্ত-সমর্থ। এর আগে যতবার দেখা হয়েছে, ছেলেটাই প্রথম স্যালুট করেছে রানাকে।

তিন আর চারতলার মাঝখানে ল্যান্ডিংটা অস্বাভাবিক চওড়া, রিসেপশন রুমের কাজ তো চলেই, সেই সাথে অভ্যাগতদের জন্যে বসার সুন্দর আয়োজন। সোফায় যারা বসে রয়েছে তাদের মধ্যে নেপাল, পাকিস্তান, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, ভারত ও বাংলাদেশ অর্থাৎ সার্কভুক্ত সব দেশের লোকজনই উপস্থিত। অতিথিদের সাথে নিচু স্বরে আলাপ করছেন ভারতীয় দু'জন রাজনীতিক। ডেস্কে চাবি রেখে সিঁড়ি বেয়ে

নিচে নামার সময় একটা কথা ভেবে মনে মনে হাসল রানা—ওদের যদি বলা হয়, এইমাত্র তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল একজন বাংলাদেশী স্পাই, কে কি ভাববে ওরা?

গ্রাউন্ড ফ্লোরের হলরুমে অনেক লোকের ভিড়। রানাকে দেখে হাইহিলের খট খট শব্দ তুলে ছুটে এলেন জয়া মালহোত্রা, ওদের গ্রুপের জন্যে ভারতীয় ইন্টারপ্রেটর। 'আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে রওনা হচ্ছি, মি. সিংহে।'

জয়া মালহোত্রার বয়স পঞ্চাশের কম নয়, সার্কভুক্ত দেশগুলোর সব ক'টা রাষ্ট্রীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন। শুধু ভাষা নয়, নৃত্যচর্চাতেও তিনি সমান পারদর্শী, তাঁর হাঁটা-চলার মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের বহর দেখলে যে-কোন বঙ্গললনা লজ্জা পাবে। অন্তত পাওয়া উচিত।

'রওনা হচ্ছি কোথায়, মিসেস মালহোত্রা?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল রানা।

সাধারণ সুতী শাড়ি আর ব্লাউজ পরে আছেন জয়া মালহোত্রা, বাম কব্জিতে ছোট হাতঘড়ি বাদে অন্য কোন অলঙ্কার পরেননি, তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়েছে বাহুল্যবর্জিত সাদামাঠা পোশাক আর মার্জিত হাবভাবে। 'লালকেল্লা দেখব, শুধু ওটাই তো বাকি।'

মৃদু হেসে একটা হাত তুলল রানা। 'যাব আর আসব, দু'একটা জিনিস না কিনলেই নয়—যদি দেখেন ফিরতে দেরি হচ্ছে, আমাকে ছাড়াই বেরিয়ে পড়বেন, প্লীজ।'

রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর, হোটেলের গেটে সশস্ত্র পুলিস। তাদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে এল রানা, ফুটপাথ ধরে রেড ক্রস রোডের দিকে এগোল। মন জুড়ে আবার ফিরে এল তাপস গাঙ্গুলী। আসবে তো সে? অর্থাৎ, আসতে পারবে তো? প্রসঙ্গক্রমে বি. সি. আই. চীফ রাহাত খানের সাথে আলাপের প্রতিটি মুহূর্ত মনে পড়ে গেল ওর। এই তো, মাত্র কয়েক দিন আগের ঘটনা…

সব সেই আগের মত আছে, কিছুই বদলায়নি। মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার সাততলা বিল্ডিংটা যেমন ভূমিকম্পে ধসে পড়েনি, তেমনি লৌহকঠিন ব্যক্তিত্বের অধিকারী মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের কুঁচকে থাকা ভুরুজোড়াও পেকে একেবারে সাদা হয়ে যায়নি। তাঁর ডাক পড়লে এখনও রানার বুক কাঁপে, হার্টবিট বেড়ে যায়, ঘামে ভেজা ভেজা হয়ে ওঠে হাতের তালু, ঢোক গিলতে ইচ্ছে করে। তাঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে 'শালা বুড়ো' বলে গাল দেয়, অনুভব করে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, সেই সাথে ওর প্রতি বুড়োর লুকিয়ে রাখা ভালবাসা আর স্নেহ উপলব্ধি করে ভিজে ওঠে চোখের কোণ। রাহাত খানের সাথে ওর সম্পর্ক নিজে যেমন অনুধাবন করে, আর কাউকে সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না। কখনও সন্দেহ জাগে, ওরা পরস্পরের বন্ধু, কিন্তু আর সবার কাছে ব্যাপারটা সুকৌশলে গোপন রাখা হয়েছে। আবার কখনও মনে হয় স্বাধীনচেতা পুত্র আর প্রতাপশালী পিতার সমতুল্য সম্পর্ক রয়েছে ওদের মধ্যে—পিতা সর্বক্ষণ শাসন করে চলেছেন আর

পুত্র প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চাইছে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে কি লেনদেন ঘটছে সে খবর কারও জানা নেই–বিচক্ষণ গুরু নিষ্ঠার সাথে শিক্ষাদান করছেন, উপযুক্ত শিষ্য সাগ্রহে সব গেঁথে নিচ্ছে মনের দেয়ালে। কখনও কখনও ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষও বাধে, কিন্তু পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস আর আস্থার ভাবটুকু সব সময় অক্ষুণ্ন থাকে। লুকোচুরি খেলায় কেউ কারও চেয়ে কম যায় না–রানা ভাব দেখায়, বুড়োর প্রতি তার কোন স্পেশাল ভক্তি নেই; রাহাত খান বোঝাতে চান, রানার প্রতি তার বিশেষ কোন দরদ নেই। দু'জনেই যেন ঠিক উল্টোটা প্রমাণ করার জন্যে একটু বেশি মাত্রায় তৎপর।

না, কিছুই তেমন বদলায়নি। এখনও সেই আগের মত ছেলেমানুষি করে সোহেল আহমেদ, কান মলে দিলে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে রানার সিগারেট চুরি করে। অনেক দিন পর আবার ঢাকায় ফিরে আসছে রানা, খবরটা পাবার সাথে সাথে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে গোটা অফিস–বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অপেক্ষাকৃত তরুণ ও নবাগত এজেন্টরা কিংবদন্তীর নায়ককে স্বচক্ষে দেখতে পাবার আশায় উত্তেজিত হয়ে থাকে, কিভাবে তার সামনে দাঁড়াবে, কি কথা বলবে, কি বলে সম্বোধন করবে, ইত্যাদি ভেবে রীতিমত নার্ভাস বোধ করে। ওর পুরানো বন্ধুরা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে বৈঠকে বসে, আলোচনা হয় পুরানো পাপীটাকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানানো হবে–তাদের সুচিন্তিত পরিকল্পনায় বেমক্কা ধাক্কার মত সারপ্রাইজ দেয়ার উপকরণ দু'একটা না থেকেই পারে না। আর ওর পুরানো বান্ধবীরা রোমাঞ্চিত হয়, সেই সাথে বিষণ্ণও বোধ করে। ইলোরা, কান্তা, সোহানা, সালেহা, রূপা, রীতি, শাহানা, লিলি, রুমানা–এ-রকম কত মেয়ে, কে না বাঁধতে চেয়েছে রানাকে। ওদের মধ্যে একজনই মাত্র প্রায় সফল হতে যাচ্ছিল, সোহানা চৌধুরী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীরব ব্যথা নিয়ে তাকেও মনটাকে কষে বাঁধতে হয়েছে। রানার সান্নিধ্য লাভ করার, রানাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসার সুযোগ এদের প্রায়-সবাই একবার না একবার অর্জন করেছে, কিন্তু কেউ তারা রানাকে জয় করতে পারেনি। আগুনে ঝাঁপ তারা নিজেদের ইচ্ছায় দিয়েছে, রানাকে কখনও পাবে না জেনেই। তাই ব্যর্থতার জ্বালা পুরোমাত্রায় থাকলেও, রানার প্রতি কারও কোন অভিযোগ নেই। রানা কখনও কাউকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেয়নি, বরং প্রতিটি আগ্রহী মেয়েকে প্রথমেই সতর্ক করে দিতে দ্বিধা করেনি ও। কারও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করা স্বভাব নয় ওর। পুরানো বান্ধবীদের অনেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে, স্বামীটি হয়তো রানারই কোন বন্ধু বা ভক্ত, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই এখনও তারা রানার প্রতি আগের মতই আকর্ষণ বোধ করে।

একনাগাড়ে দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে দেশে ফেরার জন্যে ছটফট করছিল রানা, এই সময় রাহাত খান ওকে ডেকে পাঠান। ঢাকায় ফিরেছে সাতদিন আগে, উঠেছে সিদ্ধেশ্বরীর নতুন কেনা একটা অ্যাপার্টমেন্টে। কিন্তু প্রাণপ্রিয় ঢাকা শহরের সাথে পরিচয়টা নতুন করে ঝালিয়ে নেয়ার বা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ এখনও ঘটেনি ওর। বসের অনুমতি না পাওয়ায় অফিসেও যাওয়া হয়নি। প্রায় বন্দী জীবন-যাপন করছে ও, দিনের মধ্যে আঠারো ঘণ্টা বই-পুস্তকে মুখ ডুবিয়ে

থাকতে হয়। একজন মেসেঞ্জারকে দিয়ে ওগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন রাহাত খান, বেশিরভাগই সিংহলী ভাষায় লেখা, কিছু ইংরেজি বইও আছে। সিংহলী ভাষাটা অল্প কিছু জানে রানা, বসের নির্দেশে জানার পরিধি যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে নিতে হচ্ছে। এছাড়াও, গোটা একটা টপ সিক্রেট ফাইল মুখস্থ করতে হয়েছে রানাকে।

বইগুলো পড়া হয়ে গেছে, অন্যান্য কাজও প্রায় শেষ, সময় আর কাটতে চায় না। রানার প্রিয় খাবারগুলো রেঁধে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টায় রাঙার মা'র কোন ত্রুটি নেই, ব্যস্ত নয় বলে তার এই অত্যাচার এবার অন্তত উপভোগই করছে রানা। হঠাৎ হঠাৎ নিজেরই ভারি অবাক লাগে, রাঙার মা'র সাথে গল্প করার সময়ও সে পাচ্ছে! রাঙার মা মোখলেসের কথা ভোলেনি, প্রায়ই তার কথা তুলে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মোছে সে। রানার গায়ে টাকা ছুঁইয়ে আঁচলে বেঁধে রাখে, সময় করে মীরপুরের মাজারে দিয়ে আসবে বলে, তাতে নাকি আপদ-বিপদ ওর ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারবে না। প্রৌঢ়া রাঙার মা আগের মতই ঘোমটা দিয়ে সামনে আসে, আবদারের সুরে ঘরে বউ আনার আবেদন জানায়। রানা হাসে।

হাসলেও, মনটা বিষণ্ন হয়ে ওঠে ওর। বিয়ে করে ঘর-সংসার পাততে ইচ্ছে যে হয় না তা নয়। কিন্তু জানে, তা কোনদিন সম্ভব হবে না। দেশকে ভালবেসে এই বিপজ্জনক পেশা বেছে নিয়েছে ও, নিজের অনিশ্চিত আর ঝুঁকিবহুল জীবনের সাথে আরেকজনকে জড়াবার কোন অধিকার ওর নেই। কাউকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেয়াটা তেমন কঠিন কিছু নয়, কিন্তু তাকে তার প্রাপ্য অধিকারটুকু দেয়ার ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব নয়। না—মধুর দাম্পত্যজীবন, সুখের ঘর-সংসার ওর জন্যে নয়। সিদ্ধান্তটা পুরানো, অনেক আগেই এ-সব প্রশ্নের ফয়সালা হয়ে গেছে। তবু মাঝে-মধ্যে ছোট্ট একটা বাড়ি, সুন্দরী একটি বউ আর ফুটফুটে একটা শিশুর অভাবে হাহাকার করে ওঠে মনটা।

টেলিফোনে ডাক এল হঠাৎ করে, সাতদিনের দিন। 'কাল সকালে অফিসে এসো। আশা করি বইগুলো থেকে যা শেখার তুমি শিখে নিয়েছ।' বেশি কথা না বলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন রাহাত খান।

নতুন অ্যাসাইনমেন্টের আভাস আগেই পেয়েছে রানা, ধারণাও করে নিয়েছে এবার বোধহয় শ্রীলংকায় পাঠানো হবে ওকে। দেশে ফিরতে না ফিরতে আবার বিদেশে যেতে হবে, ভাবতে খারাপ লাগলেও নতুন অ্যাসাইনমেন্ট পাবার আনন্দ আর উত্তেজনার কাছে সেটা ম্লান হয়ে গেল। ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে ও, বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভালবাসে। রোমাঞ্চের হাতছানি আছে বলেই তো এই পেশা এত প্রিয় ওর।

চিরকালের অভ্যেস মত, কাঁটায় কাঁটায় সকাল ন'টায় অফিসে পৌঁছুল রানা। মনে মনে উত্তেজনা বোধ করছে, সহকর্মী আর বন্ধুদের খুব একচোট চমকে দেয়া যাবে। রাহাত খানের কাছ থেকে আভাস পেয়েছে ও, ঢাকায় ওর ফিরে আসা বা উপস্থিতি সম্পর্কে অফিসের কেউ কিছু জানে না এখনও। এলিভেটরে চড়ে ছয়তলায় উঠল ও, করিডরে বেরিয়ে সাদা পোশাক পরা প্রহরীকে পরিচয়-পত্র দেখাল। লোকটা নতুন, তবে স্যালুট ঠুকল এমন ভঙ্গিতে যেন কতদিনের চেনা। রানার মনে হলো লোকটা অহেতুক গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে। দরজা খুলে দেয়া হলো, আরেক

করিডরে চলে এল রানা।

দু'পাশে অনেকগুলো দরজা, পর্দা ঝুলছে। বসার আয়োজন যদি না বদলে থাকে, কোন্ রুমটা কার জানা আছে রানার। হাতের ডান দিকে প্রথম কামরাটা জাহিদের। পরেরটা সোহানার। বাঁ দিকের শেষ কামরাটা সলীলের, প্রথম দুটো রাশেদ আর আনিসের। বিল্ডিঙের আরেক দিকে বসে অন্যান্য এজেন্টরা। ব্রিগেডিয়ার সোহেল বসে সাততলায়।

প্রথম চমকটা জাহিদকেই দেয়া যাক। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল রানা, টাইয়ের নটটা ঠিক করে নিয়ে আস্তে করে হাত বাড়িয়ে পর্দা সরাল, 'কি রে, শালা!' বলার জন্যে তৈরি। ধ্যেৎ, কামরা খালি, ভেতরে কেউ নেই। চট করে করিডরের দু'দিক চোখ বুলিয়ে নিল রানা। এখনও কেউ ওকে দেখে ফেলেনি। ভাবল, রুম যখন খোলা দেখা যাচ্ছে, অফিসে পৌঁছে গেছে ব্যাটা। নিশ্চয়ই কোথাও আড্ডা দিচ্ছে। করিডরে মাত্র দুটো দরজা বন্ধ, তারমানে এখনও পৌঁছোয়নি সোহানা, কিংবা সে হয়তো ঢাকাতেই নেই। আর রানা তো, জানেই, সলীল এখন স্পেনে। বাঁ দিকে সরে এল রানা, আবার পর্দা সরিয়ে ভেতরে তাকাল—কি আশ্চর্য! রাশেদও তার কামরায় নেই। তাড়াতাড়ি পাশের কামরার সামনে চলে এল রানা। এটা আনিসের রুম। ঝট করে পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল।

এরপর আবার ডান দিকে, সোহানার পাশের কামরার পর্দা সরাল ও। কেউ নেই। টেবিলে সব কিছু পরিপাটি করে গুছানো, কিন্তু সব জনশূন্য। ইতোমধ্যে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে রানা—ওর ঢাকায় ফেরা এবং আজ অফিসে আসার খবর সবাই ওরা জানে, যার যার নিজের কামরায় অনুপস্থিত থাকার মানে হলো, ওকে তারা কোনভাবে বোকা বানাতে চায়। সোজা এগিয়ে নিজের কামরার দরজা খুলল রানা, পকেটে চাবি ভরে আলো জ্বেলে বসল টেবিলের কোণে, ব্রীফকেসটা রাখল চেয়ারের ওপর। সাজানো-গোছানো টেবিল, ফুলদানিতে তাজা ফুল। তারমানে ওর পার্সোনাল সেক্রেটারি শায়লা অন্তত জানে, ও আসছে। কিন্তু কোথায় সে?

সিগারেট ধরাল রানা, অনুভব করল টান টান হয়ে গেছে পেশীগুলো। জানে, ওকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে আশপাশেই কোথাও গভীর ষড়যন্ত্র চলছে; কিন্তু কোথায়, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এই সময়, ওকে প্রায় চমকে দিয়ে, পিক পিক করে উঠল ইন্টারকম। সুইচ অন করল রানা।

'রানা?' ইলোরার ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বলে চলল সে, 'বস্ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন, এই মুহূর্তে চলে এসো!'

চমক, ষড়যন্ত্র, বন্ধু-বান্ধব, এ-সব কিছুই মনে থাকল না, কাঁচা-পাকা ভুরুসহ বাঘের চেহারাটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। ব্রীফকেস নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও, জোরে শ্বাস টেনে ফুসফুস ভরে নিল, হন হন করে হেঁটে বাঁক নিল, সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল সাততলায়। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখল একটা ওয়াকি-টকি-তে নিচুস্বরে কথা বলছে ইলোরা, ডেস্কের পিছনে নিজের চেয়ারটায় পিঠ খাড়া করে বসে আছে সে। রানাকে দেখে ওয়াকি-টকি রেখে দিল দেরাজে, অন করল ইন্টারকম, কথা বলল রাহাত খানের সাথে, 'স্যার, এইমাত্র ঢুকল ও, পাঠিয়ে দেব?'

যান্ত্রিক আওয়াজ বেরিয়ে এল ইন্টারকম থেকে, গম্ভীর ও ভারী, 'হ্যাঁ।'

ইন্টারকম অফ না করেই রানার দিকে তাকাল ইলোরা। 'যাও। বসের সাথে আরও ক'জন আছেন। ওঁদের নিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন তিনি।'

ধাক্কা একটা বেশ বড় রকমেরই খেলো রানা। এতদিন পর অফিসে এসেছে ও, আর ইলোরা কিনা তার সাথে এমন নির্লিপ্ত ব্যবহার করল? রাগ হলেও, মুখে কিছু বলতে পারল না, বস্ শুনে ফেলবেন। ঠিক আছে, হিসাবটা পরে মেটানো যাবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে চেম্বারের দিকে এগোল ও। নক করল দরজায়।

'কাম ইন!' সেই বাজখাঁই কণ্ঠস্বর, অত্যন্ত পরিচিত অথচ আজও রানার পিলে চমকে উঠল। একটা ঢোক গিলে ভিতরে ঢুকে পড়ল ও।

নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসে রয়েছেন বি. সি. আই. চীফ, সামনে খোলা একটা ফাইল, নাকের ডগায় নেমে এসেছে চশমাটা, নিবিষ্ট মনে কি যেন পড়ছেন তিনি। ডেস্কের এ-ধারে বসা তিনজনের একজনকেও চিনতে পারল না রানা। একজন প্রৌঢ় একজন প্রৌঢ়া, তৃতীয়জন যুবক। প্রৌঢ় ভদ্রলোক স্যুট পরে আছেন, ব্যাক ব্রাশ করা কাঁচাপাকা চুল। তিনি একটা পাইপ টানছেন। তাঁর পাশে বসেছেন ভদ্রমহিলা, শাড়ি পরিহিতা। ঠোঁটে লিপস্টিক, হাতকাটা ব্লাউজ, কোলের ওপর একটা হাতব্যাগ। তার পাশের চেয়ারটা খালি, হাতলহীন। খালি চেয়ারের আরেক পাশে বসা যুবকের বয়স খুবই কম, উনিশ কি বিশ হবে। সরল চেহারা, একটু যেন মেয়েলি, তবে সারা মুখে পাঁচ-সাত দিনের না কামানো দাড়ি। তিনজনের কেউই ওরা রানার দিকে তাকাল না, চেহারা আর দৃষ্টিতে গভীর শ্রদ্ধা আর সমীহ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে রাহাত খানের দিকে।

রাহাত খান ফাইল থেকে মুখ না তুলেই জলদগম্ভীর সুরে বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসো!'

খালি চেয়ারটায় ধীরে ধীরে বসল রানা, পায়ের সামনে কার্পেটে নামিয়ে রাখল ব্রীফকেস। পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন ধারণাই পাচ্ছে না ও। কি ঘটতে যাচ্ছে আন্দাজ করতে পারছে না। সময় বয়ে চলল। চেম্বারের ভেতর পিন-পতন স্তব্ধতা। মাঝে-মধ্যে নড়ার মধ্যে একা শুধু প্রৌঢ় ভদ্রলোক নড়ছেন, পাইপ টানার সময়। রাহাত খানের হাতেও একটা চুরুট রয়েছে, কিন্তু অনেক আগেই নিভে গেছে সেটা। গভীর মনোযোগের সাথে ফাইলটা পড়ছেন তিনি, খানিক পর পর পাতা ওল্টাচ্ছেন, মাঝে-মধ্যে হাত তুলে কপালের একটা পাশ টিপে ধরছেন দু'আঙুলে। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে ফাইলের লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু অনেকটা দূর বলে কিছুই দেখতে পেল না। অবশ্য ফাইলের রঙ দেখে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, বি. সি. আই-এর কোন এজেন্টের ফাইল ওটা।

আমার নয় তো!

চেম্বারে ঢুকেছে রানা মাত্র তিন মিনিট হয়েছে, কিন্তু মনে হলো তিন ঘণ্টা ধরে বসে বসে ঘামছে ও। দু'দিকে তাকিয়ে তিনজনকে বারকয়েক দেখে নিল ও। তারা কেউ ওর দিকে ভুলেও একবার তাকায়নি, যেন ওর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়।

'এ আমি তোমার কাছ থেকে আশা করিনি!' হঠাৎ যেন বোমা ফাটল চেম্বারের

ভেতর। সশব্দে ফাইল বন্ধ করলেন রাহাত খান, শিরদাঁড়া খাড়া করে বসলেন, এক এক করে খুললেন নীল কোটের বোতামগুলো, চোখে আগুন নিয়ে তাকিয়ে আছেন সরাসরি রানার বুকের দিকে। কুঁচকে আছে কাঁচা-পাকা ভ্রূ-জোড়া।

কি বলবে, কিছু বলবে কিনা, বুঝতে পারল না রানা। বোকার মত তাকিয়ে থাকল ও।

'এটা কি, দেখতে পাচ্ছ?' তর্জনী ঝাঁকিয়ে ফাইলটার দিকে দেখালেন বৃদ্ধ।

দেখেছে রানা, বন্ধ ফাইলের গায়ে ওর কোড-নেম লেখা রয়েছে। এম. আর. নাইন। 'জ্বী, স্যার!'

'আমি তোমার স্যার নই, রাস্কেল!' গর্জে উঠলেন রাহাত খান। 'তোমাকে স্যাক করা হয়েছে। আজ থেকে তুমি আর বি. সি. আই-এর এজেন্ট নও! ছি-ছি, শেষ পর্যন্ত তুমি কিনা আমার মুখে চুনকালি মাখালে!'

এতক্ষণে ওরা তিনজন, একযোগে, রানার দিকে তাকাল—সবার চোখে বিস্ময়ের সাথে মিশে আছে ঘৃণা আর অবিশ্বাস।

অস্বাভাবিক শান্ত হয়ে গেছে রানা। স্পষ্টকণ্ঠে প্রশ্ন করল ও, 'কি ঘটেছে বলবেন আমাকে?' স্যার-টা বাদ দিল ইচ্ছে করেই।

'মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স গোপনে তোমার সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছে,' গমগম করে উঠল রাহাত খানের ভারী গলা। 'তিন পৃষ্ঠার একটা রিপোর্ট, প্রমাণ ইত্যাদিসহ, তোমার ফাইলে চিরকালের জন্যে থেকে যাবে। ওরা অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পেরেছে, ভুল করে বা অবহেলাবশত কিংবা জেনেশুনে সি. আই. এ. আর কে. জি. বি-কে দেশের টপ সিক্রেট ইনফরমেশন দিয়েছ তুমি—মূল্যবান উপহারের বিনিময়ে, যেমন নিউ ইয়র্কে অ্যাপার্টমেন্ট, সুইস ব্যাংকে পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, লন্ডনে বাড়ি...'

'আপনি বলছেন, ওরা প্রমাণও দাখিল করেছে, কি সে প্রমাণ?' রানা সম্পূর্ণ শান্ত, শুধু টান টান হয়ে আছে পিঠ, চোখে পলক পড়ছে না। ঘাড় ফিরিয়ে প্রথমে যুবক, পরে প্রৌঢ়া আর প্রৌঢ় ভদলোককে আরেকবার দেখে নিল।

'প্রমাণ আছে, তা না হলে ওদের রিপোর্ট আমি বিশ্বাস করব কেন?' টেবিলে চাপড় মেরে বললেন রাহাত খান।

রানার হাতের চাবিটা খসে গেল, পড়ল কার্পেটে, পাশে বসা যুবক সেটা তোলার জন্যে ঝুঁকল। তার মাথা ডেস্কের কিনারা থেকে নিচে নামতেই রানার হাতে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন।

এক মুহূর্তে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল, কোন্‌টা আগে বা পরে ঘটল বলা মুশকিল। জ্যান্ত হয়ে উঠল ইন্টারকম, অন করাই ছিল ওটা। ইলোরার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর আবছাভাবে শুনতে পেল রানা, 'স্যার, ফোর-ফোর-জিরো-জিরো! অসময়ে! রেড অ্যালার্ম!'

যুবকের দাড়ি রানার হাতে চলে এসেছে, অপর হাতে প্রৌঢ়ার চুল ধরে হ্যাঁচকা টান মারল ও।

'ক্যাচাল বেধে গেছে!' বলে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন রাহাত খান।

দাড়ি-গোঁফ হারিয়ে যুবক এখন আর যুবক নয়, তরতাজা যুবতীতে পরিণত হয়েছে। রানা তাকে চেনে না। প্রৌঢ়া মহিলাও লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড় দিলেন, চুলসহ মুখোশটা রয়ে গেল রানার হাতে। চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে দৌড় দিলেন রাহাত খান, তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়ে হোঁচট খেলেন প্রৌঢ়। প্রৌঢ়া মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আসছেন! উনি আসছেন!' রানার মনে হলো গলার অকৃত্রিম আওয়াজটা চিনতে পারছে ও—হারামজাদা সোহেলের। পিছন থেকে খপ্ করে রাহাত খানের কোট চেপে ধরল ও। কিন্তু ছদ্মবেশী রাহাত খান কোটটা ছাড়িয়ে নিয়ে দরজা দিয়ে বুলেটের মত বেরিয়ে গেল। সব ক'জন পড়িমরি করে ছুটল, তাদের ধাক্কায় পড়ে যেতে গিয়ে একটা চেয়ার ধরে নিজেকে সামলে নিল রানা। কয়েক সেকেন্ড পর যখন দরজার পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল ও, দেখল ওয়েটিং রুমের দরজা দিয়ে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে ছুটে পালাচ্ছে ইলোরা, তারস্বরে চিৎকার করছে সে, 'পালাও! পালাও! ধরতে পারলে আস্ত রাখবে না!'

হাসল রানা। এক সেকেন্ড কি যেন ভাবল ও। পরমুহূর্তে ফিরে এল খালি চেম্বারে, কার্পেট থেকে নকল দাড়ি-গোঁফ, চুল আর রাবারের মুখোশটা তুলে পকেটে ভরল, ডেস্ক থেকে তুলে নিল ফাইলটা।

নেড়েচেড়ে দেখল ওটা, ভেতরে আজেবাজে কাগজ রয়েছে। ভাঁজ করে কোটের পকেটে ঢোকানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, শেষ পর্যন্ত গুঁজে রাখল কোমরের কাছে ট্রাউজারের তলায়। চট করে চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল আর কোথাও কিছু অসঙ্গতি আছে কিনা। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল ও, আশা করা যায় বসের ধমক থেকে বেয়াড়া সহকর্মীদের বাঁচানো গেছে। এবার নিজেকে বাঁচানোর পালা। ইলোরার 'ফোর-ফোর-জিরো-জিরো' যে স্বয়ং রাহাত খান আর 'রেড অ্যালার্ম' মানে যে তিনি আসছেন, তাতে আর সন্দেহ কি। কাজেই এখানে আর এক মুহূর্তও নয়। ব্রীফকেস নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে, পর্দা সরিয়ে আগমন ঘটল যমদূতের।

'ও তুমি!' রানাকে পাশ কাটিয়ে ডেস্কের দিকে এগোলেন রাহাত খান। 'ইলোরা বোধহয় তোমাকে পাহারায় রেখে কোথাও গেছে?' রিভলভিং চেয়ারে বসলেন তিনি। 'দাঁড়িয়ে কেন, বসো।'

বসতে গিয়ে একবার ইচ্ছে হলো রানার, ডেস্কের ওপর ঝুঁকে কাঁচা-পাকা ভুরু-জোড়া টেনে দেখে এটাও নকল মাল কিনা। কিন্তু চিন্তাটা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো। রানা চিরকাল যা দেখে অভ্যস্ত, খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে এবার সব কিছু। এ-লোক যে সেই-লোক তাতে কোন সন্দেহ নেই। গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'ভাষাটা আয়ত্তে এসেছে?'

'জ্বি, স্যার।'

'পড়ার জন্যে যে ফাইলটা পাঠিয়েছিলাম?'

কোলের ওপর রেখে ব্রীফকেস খুলে ফাইলটা বের করল রানা, ওপরে টপ সিক্রেট লেখা রয়েছে, ডেস্কের ওপর বসের সামনে আস্তে করে নামিয়ে রাখল।

'ফাইলে যে কুচক্রটির কথা বলা হয়েছে, তার সাথে তোমার এই

অ্যাসাইনমেন্টের কোন সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। তোমাকে ওটা পড়তে দিয়েছিলাম, কারণ দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করে একটা বিকট সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ওরা।' থেমে চুরুট ধরালেন রাহাত খান। 'তুমি হিন্দীও তো ভালই বলতে পারো?'

'পারি, খুব ভাল না, স্যার।' মাথা নাড়ল রানা। ঝেড়ে কাশো না বাপ্, মনে মনে বলল ও। আমার যে দম আটকে মরার অবস্থা! কি অ্যাসাইনমেন্ট? কোথায় যেতে হবে? হিন্দী আর সিংহলীর সাথে কি সম্পর্ক?

'দিল্লী যাচ্ছ তুমি।' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রানার প্রতিক্রিয়া মাপার চেষ্টা করলেন রাহাত খান।

'তাহলে সিংহলী ভাষাটা···?'

'সিংহলী হিসেবে,' বললেন রাহাত খান, দেরাজ খুলে একটা ফোল্ডার বের করলেন, ভাঁজ খুলে কি যেন পড়ে নিলেন। 'সার্কের ছ'টা দেশ থেকে শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, সমাজসেবক ও সাংবাদিক ভারত সরকারের আমন্ত্রণে দিল্লী আর বোম্বে সফর করবে। কিছু ব্যবসায়ীকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে ওরা। বেশিরভাগই তরুণ-তরুণী। যাত্রা শুরু হবে শ্রীলংকার জাফনা থেকে। নিমন্ত্রিতদের শ্রীলংকা থেকে বোম্বে নিয়ে যাওয়া আর বোম্বে থেকে শ্রীলংকায় ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে, তারমানে যে জাহাজটা তোমাদেরকে নিয়ে যাবে সেটা বাংলাদেশী–রাজহংস।'

'কত লোক যাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সাড়ে তিনশো। তোমার জন্যে একটা কেবিন বুক করা হয়েছে। তোমার পাসপোর্ট এই মুহূর্তে কলম্বোর ভারতীয় দূতাবাসে রয়েছে, ভিসা পাবার অপেক্ষায়। "অরবিদ সিংহে" নামে পাসপোর্ট। অরবিদ সিংহে শ্রীলংকার একজন তরুণ ব্যবসায়ী, অখ্যাত।' ধোঁয়া থেকে চোখ বাঁচিয়ে চুরুটে টান দিলেন তিনি।

'দিল্লীতে কি করতে হবে আমাকে?'

'এটাকে ঠিক অ্যাসাইনমেন্ট বলা চলে না।' এমন সুরে কথাটা বললেন রাহাত খান, যেন নিজের ওপরই অসন্তুষ্ট বোধ করছেন, যেন দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছেন মশা মারতে কামান দাগছেন তিনি। 'ছোট্ট একটা কাজ। তুমি জানো, সারা পৃথিবীতে আমাদের কিছু এজেন্ট ছড়িয়ে আছে, যাদের সাথে আমরা কোন যোগাযোগ রাখি না, কিছু জানাবার থাকলে তারাই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তাদের মধ্যে একজন হলো তাপস গাঙ্গুলী। ভারতে পড়তে গিয়েছিল, রিসার্চ স্কলার হিসেবে একটা এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে কাজ পেয়েছে। আজ দশ বছর হলো সে কোন যোগাযোগ করেনি। ক'দিন আগে হঠাৎ একটা মেসেজ পাঠিয়েছে। ঢাকার ছেলে, আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে চিনতাম। অত্যন্ত বিশ্বস্ত। মেসেজটা ইন্টারেস্টিং।'

অপেক্ষা করছে রানা।

'ওদের ল্যাবরেটরিতে কিছু সায়েন্টেফিক প্ল্যান পৌঁচেছে। প্ল্যানগুলো স্টাডি করার জন্যে যে টীমটা গঠন করা হয়েছে, সে-ও তার একজন সদস্য।' এক মুহূর্ত

বিরতি নিয়ে কথা শেষ করলেন রাহাত খান, 'প্ল্যানগুলো বাংলাদেশ থেকে চুরি করা।'

'কিসের প্ল্যান ওগুলো?' মনে মনে আঁতকে উঠল রানা, ঘরে চুরি হয়েছে শুনলে পাহারাদার যেমন ওঠে।

'আমরা তা জানি না। তবে কোন সন্দেহ নেই, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছুই হবে, তা না হলে পি. বি. ই. টোয়েনটি আমাদের সাথে যোগাযোগ করার ঝুঁকি নিত না। স্টাডি টীমের সদস্য বলে কড়া নজর রাখা হয়েছে তার ওপর, কোনরকমে ছোট্ট একটা মেসেজ পাঠাতে পেরেছে সে। কাজেই এখনও আমরা অন্ধকারে।'

'ব্যক্তিগতভাবে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে বলে মনে করেন আপনি?'

উত্তর দেয়ার আগে নিভে যাওয়া চুরুটে আবার আগুন ধরালেন রাহাত খান। 'বলা কঠিন। সম্ভবত না। তুমি জানো, সায়েন্টেফিক রিসার্চের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে চোখে চোখে রাখা হয়। তাপস শুধু জানিয়েছে, প্ল্যানগুলো পাণ্ডুলিপি আকারে বা বলা যায় ওগুলোর সাথে হাতে লেখা নোট যোগ করা হয়েছে।'

'ওগুলোর একটা কপি পেতে হবে আমাদের, তাহলে জিনিসগুলো কি জানতে পারব, তারপর কোত্থেকে আর কিভাবে দেশ থেকে বেরিয়েছে খোঁজ নিতে হবে?'

'হ্যাঁ।' চোখে বিরক্তি নিয়ে তাকালেন রাহাত খান, যেন বলতে চাইছেন, সহজবোধ্য ব্যাপার প্রশ্ন করে জেনে নেয়ার দরকারটা কি?

'তাপস এক কাজ করলেই তো পারে, দিল্লীতে আমাদের দূতাবাসে একটা ফটোকপি পাঠিয়ে দিক।'

এবার রেগে গেলেন রাহাত খান। 'পাঠিয়ে দেয়া কি এতই সহজ? তাপসের ওপর সারাক্ষণ নজর রাখা হচ্ছে, দূতাবাসের প্রতিটি কর্মচারীকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। ওদের কারও সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তার জন্যে সেটা আত্মহত্যার সামিল হবে।'

'সার্ক ট্যুরিস্টদের সাথে যাচ্ছি আমি, ভারতীয়রা কি আমাদের ওপর নজর রাখবে না?'

চেয়ারে হেলান দিলেন রাহাত খান। 'সাড়ে তিনশো লোক, ক'জনের ওপর নজর রাখা সম্ভব? তাছাড়া, রাজনৈতিক পরিস্থিতি যতটুকু বুঝছি, ভারত সরকার ঘুরে ফিরে বেড়ানোর যথেষ্ট স্বাধীনতা দেবে ট্যুরিস্টদের। বাংলাদেশের সাথে অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে মন কষাকষি, নেপালের সাথে বাণিজ্য নিয়ে গোলমাল, মালদ্বীপে সৈন্য পাঠানো, শ্রীলংকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে না চাওয়া, পারমাণবিক বোমা তৈরি নিয়ে পাকিস্তানের সাথে বিতর্ক ছাড়াও অন্যান্য আরও অনেক কারণে সার্ক দেশগুলোর সাথে ওদের সম্পর্ক খুব নাজুক অবস্থায় পৌঁছে গেছে, সরকারীভাবে ট্যুরিস্টদের এই বিরাট একটা বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানাবার উদ্দেশ্যই হলো যথাসম্ভব উত্তেজনা কমিয়ে আনা। এমন কিছু করবে না ওরা, যাতে ট্যুরিস্টরা অস্বস্তিবোধ করে বা মনোক্ষুণ্ন হয়। আমার ধারণা, অন্তত পি. বি. ই. টোয়েনটির সাথে নিরাপদে যোগাযোগ করার সুযোগ অবশ্যই তুমি পাবে। কাজটা তো কিছুই না, ধরে নিতে পারো বেড়াতে যাচ্ছ।'

বেড়ানোর সাথে সম্পর্কিত অ্যাসাইনমেন্টগুলোকেই সবচেয়ে বেশি ভয় পায় রানা। কিন্তু সে-কথা মুখ ফুটে বলার সাহস হলো না ওর। 'কবে যেতে হবে আমাকে?'

'পরশু। ব্যবস্থা করা হয়েছে, বারো তারিখে তোমার সাথে দেখা করবে তাপস, সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে। প্লেনে করে কলম্বো যাবে, ওখানে তোমার পরিচয়: সিংহলী ব্যবসায়ী অরবিদ সিংহে। সব ব্যবস্থা কমপ্লিট। কোন প্রশ্ন?'

সুযোগ দিয়েও সেটা কেড়ে নিলেন রাহাত খান, রানাকে চিন্তা করার অবসর না দিয়ে বললেন, 'এখন তুমি যেতে পারো। সোহেলের সাথে দেখা করো, বাকি সব সে-ই জানাবে তোমাকে। ও, হ্যাঁ, দিল্লী থেকে একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়ো আমাকে। রেডিও বা অস্ত্র, এ-সব তোমার সাথে থাকছে না।'

হাঁফ ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা।

সাততলা থেকে নেমে এল রানা, করিডরেই সবার সাথে দেখা হলো। দলবেঁধে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, দেখেই হৈ-চৈ করে উঠল। হেসে উঠল রানা, হাত দুটো উঁচু করে জোড়া বুড়ো আঙুল নাড়ল। 'কাঁচকলা! আমাকে বোকা বানানো অত সহজ নয়, নিজেরাই ধরা পড়ে গেছিস!'

'বললেই হলো!' মারমুখো হয়ে তেড়ে এল জাহিদ। 'স্যার-স্যার করে কুল পাচ্ছিলি না! নিজের চোখে দেখলাম, দরদর করে ঘামছিলি! তাহলে বল্ শালা, যুবক সেজেছিল কে?'

ছুটন্ত পায়ের শব্দ পেল রানা, পিছন দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারল ওয়েটিং রূমে ফিরে যাচ্ছে ইলোরা, জানে যে-কোন মুহূর্তে তাকে খোঁজ করতে পারেন বস্। সবার ওপর একবার চোখ বুলাল রানা। নতুন রিক্রুট, ছেলে ও মেয়ে, সব মিলিয়ে পাঁচজন। একহারা, অল্প বয়স, লম্বা ও সুন্দরী এক মেয়ের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি, তার দিকে একটা আঙুল তাক করে মৃদু হাসল ও, বলল, 'ওই ছুঁড়িটা।'

'আর প্রৌঢ়া মহিলা?' চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করল সোহেল, ভিড় ঠেলে রানার সামনে চলে এল সে।

পকেট থেকে চুলসহ মুখোশটা বের করল রানা। 'মাইরি বলছি, বি.টি.ভি-র নাটকে আধ-বুড়ি সমাজসেবিকার ভূমিকায় সাংঘাতিক উতরে যাবি তুই। তোর এই প্রতিভা সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। কংগ্রাচুলেশন্স, দোস্ত!' দেখল, ধীরে ধীরে চুপসে গেল সোহেলের চেহারা। নতুন এজেন্টরা বিশেষ করে মেয়েগুলো, খিল খিল করে হেসে উঠল।

কিন্তু জাহিদ পরাজয় স্বীকার করার বান্দা নয়। 'আর বস্? বল্ শালা, বস্ সেজেছিল কে?'

রানার চেহারায় তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল। 'এ তো পানির মত সহজ। ঢুকেই লক্ষ করলাম, রাহাত খান আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছেন না, তাকাচ্ছেন বুকের দিকে। তখনই আমার খটকা লাগে। নিজেই তুই তোর পরিচয় ফাঁস করে দিলি।'

'কিভাবে?' জাহিদ হতবাক।

'চোখের দিকে তাকাচ্ছিলি না, কারণ তোর ভয় ছিল বসের চোখ আমি চিনে ফেলব। স্বীকার করছি, তোরও ছদ্মবেশ প্রায় নিখুঁতই হয়েছিল। কিন্তু যত নিখুঁতই হোক না কেন, রয়েলবেঙ্গল টাইগারের চোখ তুই পাবি কোথায় রে বেল্লিক।'

'লেকচার বাদ দে,' হুঙ্কার ছাড়ল জাহিদ। 'আমাকে চিনতে পারলি কিভাবে তাই বল।'

'লেকচার না দিলে ভবিষ্যতে তোদের এ-ধরনের কুকর্ম আবার কেঁচে যাবে। চেহারা বদলানোটাই বড় কথা নয়,' জ্ঞান দানের সুরে বলল রানা। 'সেই সাথে স্বভাব, মুদ্রাদোষ, শব্দচয়ন ইত্যাদি বিষয়েও সাবধান থাকতে হয়। তুই ধরা পড়েছিস মুদ্রাদোষে।'

রেগেমেগে সোহেলের দিকে তাকাল জাহিদ। 'রাস্কেলটা শুধু কথার প্যাঁচ কষছে!'

'ওই যে, আবার!' হেসে উঠে বলল রানা। 'কয়লার ময়লা যেমন, ধুলেও পরিষ্কার হয় না, তেমনি তোর এই মুদ্রাদোষ–কথায় কথায় "রাস্কেল" বলা।'

হাঁ হয়ে গেল জাহিদ।

এবার দলের সম্মান রক্ষার্থে এগিয়ে এল নতুন মেয়েটা, যাকে রানা ছুঁড়ি বলেছে। এখনও লালচে হয়ে আছে তার চেহারা, তবে রানার সামনে সে বেশ টান টান হয়েই দাঁড়াল। 'আচ্ছা, মাসুদ ভাই, বলুন তো, প্রৌঢ় ভদ্রলোক কে সেজেছিল?'

মুহূর্তে গম্ভীর হলো রানা। 'খবরদার!' ঝাঁঝের সাথে ধমকে উঠল ও। 'মাসুদ ভাই মাসুদ ভাই করবে না! ফের যদি শুনি, আস্ত রাখব না! এ এক মহা জ্বালা–নতুন যারাই আসে, ভাই-ভাই করতে শুরু করে। ক'দিন পর চাচা-চাচা করবে! এমন ভাব দেখাও, আমরা যেন বুড়ো হয়ে গেছি! যে ভাই বলবে, আজকের আড্ডা থেকে বাদ পড়বে সে।'

'সরি, দোস্ত!'

পিন-পতন স্তব্ধতা নেমে এল করিডরে, কারণ কণ্ঠস্বরটা মেয়েলি হলেও, হঠাৎ করে কেউ বুঝতে পারেনি কথাটা কে বলল। বোঝার পরও, অবিশ্বাসে আরও এক সেকেন্ড কারও মুখে কোন কথা যোগাল না। তারপর সবাই একযোগে অদম্য হাসিতে ফেটে পড়ল। রানার সামনে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে সেই মেয়েটা, সাহস করে সুযোগটা সেই নিয়েছে।

'ঠিক আছে,' উদার ভঙ্গিতে একটা হাত নেড়ে মেয়েটাকে বলল রানা, 'তোমার ক্ষমাপ্রার্থনা মঞ্জুর করা হলো।'

'কিন্তু,' মেয়েটা নাছোড়বান্দা। 'আপনি কিন্তু এখনও আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি। প্রৌঢ় সেজেছিল কে?'

আবার সবাই হৈ-চৈ শুরু করল।

জাহিদ বলল, 'এবার শালাকে কোণঠাসা করা গেছে! রাস্কেলটা বলে কিনা…'

সোহেল পরামর্শ দিল, 'রানা, তুই বরং হার মেনে যা।'

সবাই যখন হৈ-চৈ করছে, রানা তখন শায়লার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'একটু সাহায্য করো, প্লীজ। তুমি না আমার প্রাইভেট

সেক্রেটারি! এটুকু তোমার কাছ থেকে আশা করতে পারি না?'

'হবে না! জেনে নেয়ার চেষ্টা করছে!' তড়পে উঠল সোহেল। শায়লার হাত ধরে নিজের দিকে তাকে টেনে নিল সে।

হাত দুটো মাথার ওপর তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল রানা, ফিক্ করে হেসে ফেলে বলল, 'মানলাম, ওই একজনকেই আমি চিনতে পারিনি। সবচেয়ে নিখুঁত ছদ্মবেশ–কে প্রৌঢ় সেজেছিল আমি ধরতে পারিনি।' সবার দিকে তাকাল একবার করে, তারপর সোহেলের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। 'কে রে?'

ধেই ধেই নাচ, কুকুর-বিড়ালের ডাক ইত্যাদি থামার পর সোহেল বলল, 'ছি-ছি, এত সহজ, অথচ ধরতে পারলি না! বলা যায় তাকে নিয়ে তুই ঘর করিস, মানে প্রায় বিয়ে করা বউয়ের মত সে, তাকেই তুই···'

শায়লা দপ্ করে জ্বলে উঠল, 'দেখো সোহেল ভাই, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!'

'শায়লা!' আকাশ থেকে পড়ল রানা। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সগর্বে হাসল ও। 'দেখতে হবে তো, কার কাছ থেকে ট্রেনিং পেয়েছে!'

নতুন একটা মেয়ে পিছন থেকে মন্তব্য করল, 'শায়লা আপা প্রতিবাদ করলে কি হবে, মাসুদ ভাই কিন্তু সোহেল ভাইয়ের ইঙ্গিতটা নীরবে উপভোগ করছেন।'

'কে! কে!' ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে মেয়েটাকে খুঁজল রানা। 'আবার ভাই?' মেয়েটাকে দেখতে পেল ও। 'আজকের আড্ডা থেকে তোমাকে বাদ দেয়া হলো। না, শুধু তোমাকে নয়, তোমার অপরাধে শাস্তি ভোগ করবে নতুনরা সবাই। যে-যার কামরায় চলে যাও, আমরা বড়রা এখন আড্ডা দেব, সেখানে কিছু ল্যাংগুয়েজ ছাড়া হবে, দুগ্ধপোষ্য শিশুদের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই···'

'এবারের মত মাফ করে দেয়া যায় না, দোস্ত?' আবার হাসির হররা ছুটল।

মেয়েটার চুলের বেণী ধরে মৃদু টান দিল রানা। 'মনে থাকে যেন, এই শেষ!'

'চল,' বলল জাহিদ, 'তোর কামরায় গিয়ে বসি সবাই। তার আগে, আয়, নতুন যারা তাদের সাথে তোর পরিচয় করিয়ে দেই।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ওদের সবাইকে আমি চিনি। পাঁচজন, তাই না?' এক এক করে পাঁচজনের দিকে তাকাল ও, একটা করে নাম বলে গেল। 'ওদের সবার ফাইল দেখেছি আমি, ফটোসহ।'

নতুন এজেন্টরা একটু অবাক হলো। এজেন্টদের ব্যক্তিগত ফাইল মানেই টপ-সিক্রেট ব্যাপার, সেগুলো দেখার অধিকারও তাহলে মাসুদ রানার আছে! কিন্তু পুরানো এজেন্টরা কেউ অবাক হলো না, কারণ তারা জানে সিনিয়রদের মধ্যেও বিশেষ একটা স্থান দখল করে রয়েছে রানা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধরতে গেলে ও-ই আবার গড়েছে বি. সি. আই-কে। অফিশিয়ালি কখনও বলা হয়নি, তবে জানা কথা, রাহাত খানের পর তার চেয়ারটায় একদিন রানাই বসবে। যোগ্যতা, মেধা, নিষ্ঠা আর কৃতিত্বের মর্যাদা দিতে জানে ওরা, তাই এই ধারণাটির প্রতি ওদের সবার অকুণ্ঠ সমর্থনও আছে। স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার, রাহাত খানের পর মাসুদ রানা। কাজেই টপ-সিক্রেট ব্যাপারগুলো ওর তো জানারই কথা।

রানার কামরায় হৈ-হৈ করে ঢুকল ওরা সবাই, জমে উঠল আড্ডা। কফি বানিয়ে

সবাইকে খাওয়াল শায়লা। আড্ডার মধ্যমণি সোহেল। রি. সি. আই. অফিসে রাহাত খান যেমন এজেন্টদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন, তেমনি সোহেল অর্জন করেছে সবার বন্ধুত্ব আর ভালবাসা। বিশেষ করে তরুণ এজেন্টরা সোহেল ভাই বলতে অজ্ঞান। ওদের সাথে তার অকৃত্রিম সম্পর্ক দেখে মনেই হয় না যে সে একজন ব্রিগেডিয়ার এবং তার স্থান রাহাত খানের ঠিক নিচেই। চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জুনিয়ার ফিল্ড অফিসারদের সাথে বসে সিগারেট ফুঁকছে, চুটিয়ে আড্ডা মারছে, এটা শুধু বোধহয় বি. সি. আই. অফিসেই সম্ভব।

ছদ্মবেশ নেয়ার প্রসঙ্গ ধরেই সোহেল বলল, 'একবার হলো কি, ইসরায়েলি ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ল, রাহাত খান মারা গেছেন। সাথে সাথে বি. সি. আই-এর ওপর চরম একটা আঘাত হানার জন্যে ব্যাপক একটা পরিকল্পনা তৈরি করে ওরা। আমরা খবরটা পাই, মীটিঙে বসে ঠিক করি বস্ বেঁচে আছেন দেখাবার জন্যে তাঁকে লোকজনের সামনে বের করতে হবে। কিন্তু বস্ তো তখন হাসপাতালে আজরাইলের সাথে লড়ছেন। ঘটনাটা তোর মনে পড়ে, রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। আড্ডার সময়, চিরকালের অভ্যেস, টেবিলের ওপর পা তুলে দেয় ও–কিন্তু আজ পা না তুলে নতুন ছেলেমেয়েদেরকে বসার সুযোগ করে দিয়েছে। সোহেল আর জাহিদ বসেছে টেবিলের সামনের দুটো চেয়ারে, চেয়ার দুটোর হাতল দখল করেছে আনিস আর রাশেদ। বাকি সবাই টেবিলের কোণ আর কিনারা দখল করেছে। শায়লা বসেছে রানার চেয়ারের একটা হাতলে, অপর হাতলের দিকে কাত হয়ে আছে রানা। একের পর এক সিগারেট ফুঁকছে ও। 'ছ'বছর আগের ঘটনা। মোসাডের এক এজেন্ট গুলি করেছিল বসকে। গুরুতর আহত হয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ,' বলল সোহেল। 'তো, আর কোন উপায় না দেখে আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে রাহাত খান সাজিয়ে…'

'কাকে, সেটা বল্!' অধৈর্য জাহিদ চেঁচিয়ে উঠল।

'কাকে আবার!' বলল রানা। 'বসের মত দৈহিক গড়ন আমাদের মধ্যে তো একজনেরই আছে, বিশেষ করে ব্যাক সাইডটা…'

'দেখ রানা, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি,' মারমুখো হলো জাহিদ।

'সবাই দেখো, নিজেই কেমন নিজের পরিচয় তুলে ধরছে,' বলে হো হো করে হেসে উঠল রানা।

ওর হাসি থামতেই প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ অন্য দিকে মোড় নিল। তরুণরা সবাই একসাথে কৌতূহল আর বিস্ময় প্রকাশ করল, চারদিক থেকে ছুটে এল অসংখ্য প্রশ্ন। গুলি করা হয়েছিল বসকে? কোথায় লেগেছিল বুলেট? রাহাত খান মারা গেছেন, শুধু এই গুজবটা শুনেই মোসাডের সাহস রাতারাতি বেড়ে গেল? রাহাত খান তাহলে কি? কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হয় তাঁকে? শত্রুরা তাঁকে এতটা গুরুত্ব কেন দেয়?

'উনি আমাদের মাথার মুকুট,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'আমাদের সমস্ত প্রেরণা আর সাহসের উৎস।'

একটু বিরতি নিল রানা, যেন কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছে। ঘরের ভেতর কোন শব্দ নেই, কেউ নড়ছে না, অপলক তাকিয়ে আছে সবাই ওর দিকে। পুরানো এজেন্টদের চেহারায় শান্ত সমাহিত একটা ভাব, যেন যোগ্য মুখপাত্রের ওপর দলীয় মেনিফেস্টো ঘোষণার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তমনে বসে আছে তারা। আর নতুনরা ঠিক যেন একদল ক্ষুধার্ত সাংবাদিক, গোগ্রাসে গেলার জন্যে উন্মুখ।

রানা বলে গেল, কিন্তু গুণকীর্তন নয়, স্রেফ চরিত্রচিত্রণ। যা বাস্তব সত্য তারই নির্ভেজাল বর্ণনা। 'শুধু মোসাড কেন, কে.জি.বি. আর সি.আই.এ-ও তো সমীহ করে আমাদের চীফকে। তার কারণও আছে। বাংলাদেশ গরীব দেশ, অনেক দিক থেকে পিছিয়ে আছি আমরা, কিন্তু এসপিওনাজ জগতে আমাদের কৃতিত্ব তাক লাগানোর মত। বলতে পারো, এই সাফল্য কিভাবে আমরা অর্জন করলাম? সমস্ত কিছুর পিছনেই তো তাঁর একক অবদান রয়েছে।

'তিনি যে শুধু বি.সি.আই-এর প্রতিষ্ঠাতা তাই নয়, তাঁর অভিজ্ঞতা আর যোগাযোগগুলো স্মরণ করো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের হয়ে লড়েছেন তিনি। সারা বিশ্বে আজ যারা সমরবিশারদ, এক কালে তাঁরা তাঁর বন্ধু ছিলেন, সে বন্ধুত্ব এখনও নষ্ট হয়নি। বহু দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। যাঁরা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, তাঁরা তাঁর মেধা আর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও জানেন। অর্থ বল কম, দক্ষ এজেন্টের অভাব, ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি সীমিত, উপকরণ সামান্য, প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে সবাই শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী, তারপরও বি.সি.আই-এর সাফল্যের তালিকা সি.আই.এ. বা কে.জি.বি-র চেয়ে ছোট নয়। সমস্ত কৃতিত্বই তো তাঁর।'

'কোন সন্দেহ নেই,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রাশেদ। 'কিন্তু তারমানে কি দাঁড়াল? বস্ ছাড়া বি.সি.আই. ভেঙে যাবে? ব্যাপারটা যদি ওয়ান-ম্যান শো হয়, তাহলে তো...'

'সাফল্য বয়ে এনেছি আমরা, আমরা এজেন্টরা,' বলল রানা। 'কিন্তু আমাদেরকে হাতে-কলমে শিখিয়েছেন কে? কে গাইড করেছেন, বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েছেন? বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিজে একজন স্পাই ছিলেন এবং আজও আছেন, সমস্ত কলা-কৌশল তাঁর জানা, তাঁর সঞ্চয় তিনি মুক্তহস্তে দান করেছেন আমাদেরকে। কাজেই ব্যাপারটা ওয়ান-ম্যান শো নয়। তোমরা ভাবছ, বস্ যখন থাকবেন না তখন কি হবে। কেন,' মৃদু হাসল রানা, 'তিনি কি আমাদেরকে তাঁর যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে গড়ে তোলেননি? একদিন না একদিন বসকে আমরা হারাব, কিন্তু বি.সি.আই. সগর্বে মাথা উঁচু করে থাকবে। রক্ত-মাংসের আকৃতিতে তাজা বোমা তিনি রেখে যাবেন, তারাই...'

প্রসঙ্গের শাখা-প্রশাখা গজাল। কে যেন রানার কথার মাঝখানে বলে উঠল, 'বোমাগুলো তাঁর পোষা বিড়ালছানা।'

'বাঘের বাচ্চা!'

'সন্তান সন্তান!' ফস্ করে বলে ফেলল জাহিদ। 'উনি আমাদেরকে নিজের ছেলের মত ভালবাসেন!'

'একবার হয়েছে কি, অ্যাসাইনমেন্ট বুঝে নিতে গেছি, একটা জিনিস মাথায় ঠিকমত ঢুকছে না। চোখ রাঙিয়ে এমন বাঘের মূর্তি ধারণ করলেন কেঁদে তো ফেললামই, প্যান্ট ভিজে যাবার অবস্থা হলো।' সত্যি ঘটনা, বলতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল রাশেদের চেহারা। 'দু'দিন পর শত্রুপক্ষের গুলি খেয়ে সোজা হাসপাতালে আমি, জ্ঞান ফিরল আটচল্লিশ ঘণ্টা পর। চোখ মেলে দেখি কি, সেই বাঘ বসে আছে। আমার তো দফা সারা! ভাবলাম এই বুঝি মারবে! ওমা, বুড়ো আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় দেখছি!' গলা বুজে এল রাশেদের।

'সবার বেলা তাই হয়,' বলল রানা। 'আমরা সবাই মনে করি বস্ বোধহয় আমাকেই সবার চেয়ে বেশি ভালবাসেন। আসলে কাউকেই তিনি কারও চেয়ে কম ভালবাসেন না। খুব যখন ধমক লাগান, মনে মনে খেপে উঠি, কিন্তু জানি একমাত্র তাঁরই অধিকার আছে আমাদেরকে শাসন করার। আমরা যখন বিপজ্জনক কোন অ্যাসাইনমেন্টে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ি, সারারাত নিজের ঘরে পায়চারি করেন উনি, ছটফট করেন একটা খবর পাবার জন্যে…'

নিজেদের মধ্যে অনেক দিন পর রানাকে পেয়ে কাজে মন নেই কারও, তাছাড়া আলোচ্যসূচীতে ওদের প্রাণ-প্রিয় রাহাত খান চলে আসায় কারুরই সময়জ্ঞান থাকল না। অকস্মাৎ ঝড়ের বেগে ইলোরার আগমন না ঘটলে আজকের এই আড্ডা কখন শেষ হত, কেউ তা বলতে পারে না। ঘরে ঢুকেই ঠোঁটে একটা আঙুল তুলল ইলোরা, ফিসফিস করে বলল, 'এই! চুপ-চুপ!'

'কেন, কি ব্যাপার?' তার দেখাদেখি সোহেলও ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

'বস্!' সিঁড়ি বেয়ে সাততলা থেকে ছুটে এসে হাঁপিয়ে গেছে ইলোরা। 'ডেস্কে মাথা রেখে কাঁদছেন বস্! তোমাদের সব কথা শুনতে পাচ্ছেন তো!'

বিদ্যুৎচমকের মত রানার মনে পড়ে গেল, ইলোরার ডাক শুনে বসের সাথে তাঁর চেম্বারে দেখা করতে যাবার সময় ইন্টারকমের সুইচটা অফ করতে ভুলে গিয়েছিল ও। ঝট্ করে তাকাল, দেখল সত্যি তাই–ইন্টারকমের সুইচ অন করা রয়েছে।

ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। সবাই হতচকিত।

'স্যার!' ইন্টারকমে বলল রানা, প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায়, 'ভুল হয়ে গেছে, মাফ করে দেবেন, স্যার!' এক ঝটকায় সুইচটা অফ করে দিল ও।

চাঁদা তুলে লাঞ্চ খেলো ওরা, আড্ডা ভাঙার পর বিকেল চারটের দিকে রানাকে নিয়ে নিজের কামরায় চলে এল সোহেল।

দুই বন্ধু ব্যক্তিগত কিছু আলাপ করল নিভৃতে। শ্রীলংকায় পৌঁছুনোর জন্যে ভুয়া বাংলাদেশী একটা পাসপোর্ট দিল ওকে সোহেল। অরবিদ সিংহের পরিচয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কলম্বোয় ওকে সাহায্য করবে ওদেরই এক এজেন্ট, তার বর্তমান নাম-ঠিকানা মুখস্থ করে নিল রানা।

সব কিছুই ঠিকঠাক মত ঘটল। নির্দিষ্ট দিনে কলম্বোয় পৌঁছুল রানা, সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে জাফনায় চলে এল রাজহংসে চড়ার জন্যে। সাড়ে তিনশো

ট্যুরিস্টকে নিয়ে বোম্বের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল জাহাজ।

আজ সেই বারো তারিখ, তাপস গাঙ্গুলীর সাথে দেখা করার দিন।

ফুটপাথ ধরে অলসভঙ্গিতে হাঁটছে রানা, পাঁচশো গজ পিছনে ফেলে এসেছে অশোকাকে। এদিকের ফুটপাথে যথেষ্ট ভিড়, বেশিরভাগটাই হকাররা দখল করে রেখেছে। মেশিন থেকে বেরিয়ে আসছে তাজা ফলের রস, লোকজন রাস্তায় দাঁড়িয়েই কিনে খাচ্ছে, তাদের মধ্যে রাজহংসের ট্যুরিস্টরাও রয়েছে অনেকে। সামনে হোটেল মিনার্ভা পড়ল, গেট থেকে একদল নর্তকীকে বেরুতে দেখল রানা। সর্বনাশ, মেয়েগুলো কি লম্বা! সবার পরনে ঢোলা ঘাগরা আর ব্লাউজ, বহুরঙা জরির কাজ করা, সারা গায়ে প্রচুর অলঙ্কার। রাস্তা পেরিয়ে রানাকে পাশ কাটাল তারা, কি কারণে কে জানে খিলখিল করে হাসছে। চার চাকার গাড়ি নিয়ে আইসক্রীম বিক্রেতা খদ্দের ধরার জন্যে গলা ফাটাচ্ছে। আর একটু সামনে মাথায় পাগড়ি বাঁধা একদল শিখ আর সশস্ত্র পুলিসকে দেখল রানা, শিখগুলোর কোমরে রশি বাঁধা, হাতে হাতকড়া। বাঁক ঘুরতেই রেড ক্রস রোডে পৌঁছুল রানা, পঞ্চাশ গজ এগিয়ে দেখল রাস্তার ওপারে একটা কাফে, হিন্দী আর ইংরেজিতে লেখা সাইন বোর্ড–দিল্লী কাফে। ট্রাফিক সিগন্যাল লাল হবার অপেক্ষায় ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকল রানা, তারপর রাস্তা পেরোল। ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে ওর সাথে রাস্তা পেরুল এক লোক, সাথে লোহার হালকা চেইনে বাঁধা একটা বানর, পিছনে বাচ্চাদের একটা বাহিনী।

দিল্লী কাফে ফুটপাথের অর্ধেকটা দখল করে রেখেছে, কাফের বাইরে বেতের চেয়ারে অল্প দু'চারজন খদ্দের দেখল রানা। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটে বাজে, এখনও সম্ভবত এসে পৌঁছোয়নি তাপস গাঙ্গুলী। ঢাকা ত্যাগ করার আগে সোহেল ওকে তাপসের একটা ফটোগ্রাফ দেখিয়েছে, কিন্তু ছবিটা দশ বছর আগের, দেখার সাথে সাথে তাকে চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে রানার। ফুটপাথেই, দেয়াল ঘেঁষে একটা বেতের চেয়ারে বসল ও, আশপাশের টেবিলগুলোর দিকে তাকাল। বেশিরভাগই খালি। সবচেয়ে কাছের খদ্দেররা একটা গ্রুপ, সবাই পুরুষ। দূরে, এককোণে, পাশাপাশি বসে আছে এক যুবতীকে নিয়ে এক যুবক, ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

প্রৌঢ় একজন ওয়েটার এগিয়ে এল। কফি চাইল রানা। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। রাস্তার ওপারে একদল ট্যুরিস্ট, তিনটে মেয়েকে নিয়ে দু'জন পুরুষ, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কি যেন কেনাকাটা করছে। মনে হলো রাজহংসের আরোহী, কিন্তু দূরে বলে চেনে কিনা বুঝতে পারল না। আজই ওদের দিল্লীতে শেষ দিন। বোম্বেতে ফেরার জন্যে সন্ধ্যায় ট্রেন ধরতে হবে।

কফি নিয়ে ফিরে এল ওয়েটার, মানিব্যাগ বের করে একটা ডলার দেখাল রানা লোকটাকে, জিজ্ঞেস করল ভাঙানো যাবে কিনা। লোকটা ভাঙতি নিয়ে ফিরল, কফির দাম মিটিয়ে দিয়ে বাকি টাকা পকেটে ভরল ও। তাড়াহুড়ো করে চলে যাবার দরকার হলে বিল দেয়ার সময় পাওয়া যাবে না।

পাঁচটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। মোটাসোটা দুই বাচ্চাকে নিয়ে এক মহিলা একটা টেবিল দখল করল। আরেক টেবিলে বুড়ো এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে বসতে সাহায্য করছেন, প্রায় অচলই বলা যায় বুড়িকে, সম্ভবত বাতে। তাপস গাঙ্গুলীর সাথে চেহারার মিল আছে এমন কাউকে চারপাশে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না রানা। তবে, এখুনি অস্থির হবার কোন কারণ নেই।

পাঁচ মিনিট পর এক লোকের ওপর চোখ পড়ল রানার। বেশ লম্বা, বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি, শুধু জুলফি জোড়া পেকেছে, পরনে হালকা রঙের স্যুট, সাদা শার্ট, রাস্তা পেরোনোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছে ফুটপাথের কিনারায়, সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে কাফের দিকে।

কফির কাপে চুমুক দিল রানা, প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল। চওড়া বুকের ভেতর হৃৎস্পন্দনের গতি বেড়ে গেল ওর। সজাগ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানিয়ে দিল, তাপস গাঙ্গুলী আসছে।

রাস্তা পেরিয়ে সরাসরি কাফেতে ঢুকল লোকটা, কাছাকাছি একটা টেবিলে বসল, রানার দিকে প্রায় পিছন ফিরে। ওয়েটার এল, কফির অর্ডার দিল লোকটা। সিগারেট ধরাল সে, একটা ইংরেজি পত্রিকার ভাঁজ খুলে মেলে ধরল চোখের সামনে।

তার দিকে একবারও সরাসরি না তাকিয়ে আবার সিগারেট ধরাল রানা। লোকটা যদি পি.বি.ই. টোয়েনটি হয়, ওয়েটার তার অর্ডার ডেলিভারি না দেয়া পর্যন্ত কোন ইঙ্গিত দেবে না।

একটু পরই কফি দিয়ে গেল ওয়েটার। রানার মত সে-ও আগেভাগে মিটিয়ে রাখল বিল।

ওয়েটার চলে যাবার পর ওরা দু'জন প্রায় একা হয়ে গেল, পাঁচ গজের মধ্যে আর কোন খদ্দের নেই। এই সময় তিনজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখল রানা, একবার চোখ বুলিয়েই আন্দাজ করল ওরা বোধহয় সাদা পোশাক পরা দিল্লী পুলিস। শক্ত-সমর্থ দীর্ঘ দেহ, মাথায় ছোট করে ছাঁটা চুল, চেহারায় কাটখোট্টা ভাব। তবে রঙিন চাঁদোয়ার তলায় না বসে, সরাসরি কারও দিকে না তাকিয়ে মূল কাফের ভেতর ঢুকে গেল তারা। ভেতর আর বাইরের অংশের মাঝখানে নিচু একটা পাঁচিল রয়েছে, ভেতরে কেউ দাঁড়ালে বাইরে কি ঘটছে দেখতে পাবে সে। পাঁচিলের মাঝখানে একটা দরজা। কাফের পাশে একটা সরু গলি, সেদিকের একটা দরজা দিয়েও ভেতরের অংশে ঢোকা যায়।

লোকগুলো ভেতরে অদৃশ্য হবার সাথে সাথে রানার সামনে ঝুক করে কাশল লোকটা, মুখের সামনে খবরের কাগজ তুলল, সম্ভবত গলার আওয়াজ চাপা দেয়ার জন্যে। নিচু গলায় কথা বলল সে, কোন রকমে শুনতে পেল রানা।

'একসাথে হাঁটার একটু সময় হবে আপনার?' বিশুদ্ধ বাংলায় জিজ্ঞেস করল তাপস গাঙ্গুলী।

সাঙ্কেতিক প্রশ্ন। 'দুঃখিত,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে খালি কাপের ভেতর, '...ব্যস্ত আছি।' ওর ওই কথায় লোকটা বুঝতে পারবে, চাকা থেকে ওকেই পাঠানো

হয়েছে। 'ওদের দেখলেন?'

'হ্যাঁ। খুব সাবধান, ওরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে।'

'আমি চলে যাবার পর কি হবে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওরা যদি আপনাকে···?'

'আমি নিষ্কলঙ্ক, রেকর্ডে কোন স্পট নেই। যাই ঘটুক না কেন, নিজেকে আমি নির্দোষ প্রমাণ করতে পারব। আমার চিন্তা আপনাকে নিয়ে।'

'পিছলে বেরিয়ে যাব, চিন্তা করবেন না।'

'শুনুন। আমার টেবিলে নয়, বাঁ দিকের টেবিলটায় একটা সিগারেটের প্যাকেট রাখছি। ভেতরে মাইক্রোফিল্ম আছে। আমাকে পাশ কাটাবার সময় তুলে নেবেন ওটা, আমি আপনাকে খবরের কাগজ দিয়ে আড়াল করে রাখব।'

'ঠিক আছে।'

'বিল দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আরেকটা কথা। বসকে বলবেন, অনেক দেরিতে হলেও আমি জানতে পেরেছি, আমার ফার্মটা বিজনেস সিন্ডিকেটের একটা প্রতিষ্ঠান। এই ছুরির পিছনে ওরাই রয়েছে···' কথা বলার ফাঁকে পকেট থেকে চারমিনারের একটা প্যাকেট বের করে বাঁ দিকের টেবিলের কিনারায় রাখল তাপস গাঙ্গুলী।

সাথে সাথে দাঁড়াল রানা। 'যদি মনে করেন আপনার বিপদ হবে, আমি তাহলে আজ ট্রেন ধরব না। যদি আপনার সাহায্য দরকার হয়···'

'বললাম না, ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না! যান!'

পা বাড়াল রানা, তাপস গাঙ্গুলীকে পাশ কাটাবার সময় ডান হাত দিয়ে টেবিল থেকে তুলে নিল চারমিনারের প্যাকেট, চট করে পকেটে ভরে ফেলল। 'গুড লাক,' বিড়বিড় করে বলল ও।

কোন উত্তর এল না।

এ পর্যন্ত সব ভাল। কিন্তু টেবিল চেয়ারগুলোকে পাশ কাটিয়ে রানা ফুটপাথের কিনারায় বেরিয়ে আসতেই পিছনে ভারী জুতোর আওয়াজ পেল। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা, পিছন ফিরে তাকাবে না। ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা পেরুতে শুরু করেছে, একটা চেয়ার উল্টে পড়ার শব্দ হলো পিছনে, কর্কশ গলায় কে যেন কাকে কি বলছে। হাঁটার গতি শ্লথ না করেই কাঁধের ওপর দিয়ে চট করে একবার তাকাল রানা। আগের সেই তিনজন দীর্ঘদেহীকে দেখতে পেল ও, তাপস গাঙ্গুলীকে ছেঁকে ধরেছে। হিন্দী ভাষায় কি যেন বলছে তারা। তিনজনের একজন দল থেকে বেরিয়ে ছুটে এল রাস্তার দিকে, সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হিন্দীতে ডাকল লোকটা, 'ঠ্যারো!'

ভাষাটা হিন্দী, কাজেই বুঝতে না পারার ভান করার সুযোগ রয়েছে রানার। রাস্তা পেরিয়ে ফুটপাথে উঠে পড়ল ও, লোকটাও পিছু পিছু আসছে। একটা গাড়ির তলায় চাপা পড়তে যাচ্ছিল সে, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ফুটপাথে। রানার সামনে আর দু'পাশে প্রচুর লোকের ভিড়, হকাররা চেঁচামেচি করছে, মানুষজনকে ধাক্কা দিয়ে হন

হন্ করে এগোল ও। বাঁক ঘুরে পিছনে ফেলে এল রেড ক্রস রোড। খানিক সামনে রাজহংসের একদল ট্যুরিস্ট আইসক্রীম খাচ্ছে, চার চাকার গাড়ি থামিয়ে বেচাকেনায় ব্যস্ত বিরাট বপু বিক্রেতা। ট্যুরিস্টদের কয়েকজনকে চিনতে পারল রানা, বেশিরভাগ ওরা নেপালী। সহাস্যে ওদের দলে ভিড়ে গেল রানা।

'হ্যালো! কেমন? খাওয়া যায়?' এদের অনেকের সাথে জাহাজে টেবিল টেনিস খেলেছে রানা, মেয়েগুলোর সাথে আড্ডা মেরেছে।

লম্বা ছিপছিপে একটা মেয়ে, রানার যেমন পছন্দ তারচেয়ে বয়স কিছুটা কম, উর্ধ্বে আঠারো কি উনিশ হবে, দেখতে ভারি সুন্দরী আর চটপটে, রানার বাহু আঁকড়ে ধরল, ইংরেজিতে বলল, 'ওহ্, মি. সিংহে! আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম। আমার একটা প্রশ্ন ছিল...'

প্রশ্নটা কি ছিল তা আর শোনা হলো না, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে সাদা পোশাক পরা পুলিস লোকটা রাগে লাল চেহারা নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, রীতিমত হাঁপাচ্ছে। 'চলো মেরে সাথ্!' রানার কাঁধে ভারী একটা হাত রেখে হিন্দীতে হুঙ্কার ছাড়ল সে।

'কি বলছে ও?' বিহ্বল দৃষ্টিতে সঙ্গীদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল রানা, ভান করল কিছুই বুঝতে পারছে না।

এক নেপালী যুবক অনুবাদ করল কথাটা। 'উনি বলছেন, ওর সাথে আপনাকে যেতে হবে। কে উনি, মি. সিংহে?'

'যেতে বলছে!' আকাশ থেকে পড়ল রানা। 'কোথায়? কেন? ও কে, তাই তো আমি জানি না!' ঝাপটা দিয়ে লোকটার হাত কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল ও।

এবার পুলিস লোকটা ওর কব্জি চেপে ধরল। 'পুলিস!' প্রমাণ হলো, রানার সন্দেহ মিথ্যে নয়। 'চলো মেরে সাথ্!'

রাগে কেটে পড়ার সময় হয়েছে। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে পকেট থেকে সবুজ একটা কার্ড বের করল রানা। ভারত সরকারের দেয়া ট্র্যাভেল পারমিট ওটা, ট্যুরিস্টদের সবাইকে দেয়া হয়েছে। কার্ডটা লোকটার নাকের সামনে নাড়ল ও। 'আমি স্বাধীন সার্বভৌম শ্রীলংকার একজন সম্মানিত নাগরিক, আমাকে এভাবে অপমান করার অধিকার কারও নেই। ভারত সরকারের আতিথেয়তা সম্পর্কে রিপোর্ট করব আমি...' নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল ও।

'ঘাবড়ানেকা কোই বাত নেহি,' সুর একটু বদলাল বটে, কিন্তু আবার রানার কাঁধে একটা হাত রাখল পুলিস লোকটা। 'থোড়ি সামায় কে লিয়ে পুলিস স্টেশন চলিয়ে, কুছ বাত পুছনা হ্যায়।'

অনুবাদ শোনার পর রানা বলল, 'ঘাবড়ানো উচিত তোমার, কারণ ভারত সরকারকে অপমান করছ তুমি।' আবার হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল ও। 'ভাল চাও তো কেটে পড়ো, তা না হলে তোমার কপালে খারাবি আছে।' ইতোমধ্যে লোকটাকে ঘিরে ফেলেছে নেপালী ট্যুরিস্টের দলটা, রানার পক্ষ নিয়ে সবাই চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে। সবার হাতে এখনও আইসক্রীম রয়েছে, তবে খাওয়ার কথা মনে নেই কারও। দলের মধ্যে প্রৌঢ়া এক মহিলা, রাজহংসের এক আড্ডায়

রানাকে যিনি 'বাপ' বলে সম্বোধন করেছিলেন, ভিড় ঠেলে লোকটার একেবারে সামনে চলে এলেন, তাঁর হাবভাব দেখে মনে হলো হাতের আইসক্রীম যে-কোন মুহূর্তে লোকটার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারবেন। যে-কোন কারণেই হোক, ভারতীয় পুলিসকে দু'চোখে দেখতে পারেন না।

'আমরা ট্যুরিস্ট, আমাদের দূতাবাসে অভিযোগ করব, তোমাদের সাংস্কৃতিক মন্ত্রীকে জানাব…'

সুবিধে করতে না পেরে খেপে গেল পুলিস লোকটা। 'শ্রীলংকান হো অওর আংরেজ হো, মেরে সাথ থানা পড়েগা তুমকো।'

নেপালী যুবক কোমরে হাত দিয়ে সামনে বাড়ল। 'আগে তোমার পরিচয়-পত্র দেখাও। তারপর ব্যাখ্যা করো, কেন তুমি মি. সিংহেকে থানায় নিয়ে যেতে চাইছ।'

খানিক ইতস্তত করে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল লোকটা। সেটা পরীক্ষা করল নেপালী যুবক, উঁকি দিয়ে রানাও চোখ বুলাল। লোকটা পুলিসই, দিল্লী মেট্রোপলিটন পুলিসের একজন সার্জেন্ট।

'এবার বলুন, মি. সিংহের অপরাধ কি? কেন তাঁকে আপনি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে থানায় নিয়ে যেতে চাইছেন?' জানতে চাইল নেপালী যুবক।

'সবাই মিলে ধরো ওকে,' পরামর্শ দিলেন প্রৌঢ়া মহিলা। 'হোটেলে নিয়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে ডেকে বলি নিরীহ ট্যুরিস্টদের ওপর জুলুম করছিল…'

লোকজন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে লোকটা অন্য পথ ধরল। 'এই লোক,' রানার বুকের দিকে একটা আঙুল তাক করে হিন্দীতে বলল সে, 'এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসেছে। সে যদি প্যাকেটটা ফেরত দেয়, তাকে আর পুলিস স্টেশনে যেতে হবে না।'

নেপালী যুবকের দিকে ফিরল রানা। 'কি বলছে ও?'

অনুবাদ শোনার পর অবিশ্বাসে আঁতকে উঠল সবাই, গলা ছেড়ে হেসে উঠল রানা কে যেন বলল, 'ব্যাটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

আঙুলের গাঁট দিয়ে লোকটার বুকে টোকা মারল রানা। 'মিথ্যে অভিযোগ তুলে ঘুষ খাওয়ার মতলব, তাই না? সিগারেট তো সবার প্যাকেটেই থাকতে পারে, তাতে কারও নাম লেখা থাকে না—সেটা যে তোমার বা আমার, প্রমাণ হবে কি করে?'

'আমার প্যাকেট আমি চিনি,' শরীর বাঁকিয়ে রানার হাতটা সরিয়ে দিল পুলিস। 'বের করো, প্রমাণ করব।'

নেপালী যুবক রানার দিকে ফিরল। 'পকেটে প্যাকেট থাকলে ব্যাটাকে দিয়ে দিন, তাতে যদি ঝামেলা থেকে বাঁচা যায় মন্দ কি?'

'কি বলছেন!' রানা বিস্মিত। 'ভারতীয় সিগারেট খাওয়া যায়? দেশ থেকে দেশী সিগারেট এনেছি…' কথা শেষ না করে পকেট থেকে এক প্যাকেট স্টেট এক্সপ্রেস বের করে দেখাল রানা। 'এটা নিশ্চয়ই ওর নয়?'

পুলিস মাথা নাড়ল। 'দুসরা পাকিট নিকালো!'

'আমার পকেটে আর কোন সিগারেট বা প্যাকেট নেই,' ঘোষণা করল রানা। 'ইচ্ছে করলে সে আমাকে সার্চ করে দেখতে পারে।'

নেপালী যুবক অনুবাদ করল। দু'হাত মাথার ওপর তুলে দিল রানা। দক্ষতার সাথে প্রচুর সময় নিয়ে ওকে সার্চ করল পুলিস। ট্যুরিস্টরা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে।

প্রৌঢ়া মহিলা মন্তব্য করলেন, 'যদি কিছু পাওয়া না যায়, সবাই মিলে তোমাকে আমরা এই রাস্তার ওপর নাকে খত দেওয়াব!'

সার্চ শেষ করে পিছিয়ে গেল পুলিস সার্জেন্ট, হতভম্ব।

'দেখলে তো?' চেহারায় বিজয়ীর হাসি নিয়ে বলল রানা, হাঁ করা পুলিসের দিকে তাকিয়ে আছে। 'যদি বলো, কাপড়চোপড় খুলে দিগম্বরও সাজতে পারি, সেক্ষেত্রে মহিলাদের জন্যে পর্দার ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে।'

রাগের সাথে নেপালী যুবক সার্জেন্টকে বলল, 'আপনি সন্তুষ্ট তো? এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, কোথাও আপনার মারাত্মক ভুল হয়েছে? ভারত সরকারের আমন্ত্রণে এখানে আমরা বেড়াতে এসেছি, আর একজন ভারতীয় অফিসার হয়ে আপনি আমাদের সাথে এই বিচ্ছিরি ব্যবহার করলেন! এই যদি ভারতীয় পুলিসের ভব্যতা জ্ঞান হয়, এখানে তাহলে গুণ্ডাপাণ্ডাদের আচরণ কি রকম হবে?'

'মাফি মাংতা হুঁ,' বিড়বিড় করল সার্জেন্ট, বিস্ময়ের ঘোর এখনও তার কাটেনি, 'ম্যায় শরমিন্দা হুঁ...'

'আর কখনও না জেনেশুনে এভাবে কোন ভদ্রলোককে চ্যালেঞ্জ কোরো না,' গম্ভীর সুরে উপদেশ খয়রাত করল রানা।

বিরক্তিসূচক শব্দ করে ভাঙতে শুরু করল ট্যুরিস্টদের ভিড়টা। রানাকে অপমান করে, সবাই একবাক্যে রায় দিল, আসলে অপমান করা হয়েছে সার্ক দেশগুলোর প্রত্যেক ট্যুরিস্টকে। ভারত সরকার আর ভারতীয় পুলিসের সমালোচনায় সবাই মুখর হয়ে উঠলেও, মনে মনে রানা জানে, ঘটনাটার সাথে সরকার বা পুলিস বিভাগের কোন সম্পর্ক নেই—কারণ, এই বিশেষ লোকটা কুখ্যাত এক কুচক্রের পক্ষ নিয়ে কাজ করছে।

রানার হাত ধরে টান দিল কৈশোর থেকে সদ্য যৌবনে উত্তীর্ণা দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটা। 'চলে আসুন, মি. সিংহে। দেখি কিভাবে বাধা দেয় আমাদের!' বাকি সবাইও ফুটপাথে আইসক্রীমের ভেজা চিহ্ন রেখে ঘুরে দাঁড়াল, হাঁটা ধরল হোটেলের দিকে। একই জায়গায় আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল পুলিস সার্জেন্ট, একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে, বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। তারপর হঠাৎ সে-ও ঘুরে দাঁড়াল, হন হন করে এগোল উল্টোদিকে।

'আরও লোক আনতে যাচ্ছে,' মন্তব্য করলেন প্রৌঢ়া মহিলা। রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তুমি চিন্তা কোরো না, বাপ। হোটেলে ফিরে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট কোরো।'

রানাকে টেনে নিয়ে চলল মেয়েটা। রানার বিপদ হলো, তার নামটা স্মরণ করতে পারছে না। আগেও মেয়েটা ওর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু বয়স কম বলে কৌশলে এড়িয়ে গেছে ও। পাখির মত কিচির মিচির করছে সে, তার মা আর বাবাকে অরবিন্দ সিংহের গল্প শুনিয়েছে, তাঁরা ওর সাথে আলাপ করার জন্যে

উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। দাবার অরবিন্দ সিংহে হারিয়ে দিয়েছে তাকে, এটা নাকি তাঁরা বিশ্বাসই করতে চান না, কারণ স্বদেশে চলতি বছরই জাতীয় দাবা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে সে।

হঠাৎ করে নামটা মনে পড়ল রানার। 'ধন্যবাদ, সুবর্ণা। তুমি যথেষ্ট সাহায্য করেছ।'

'ওমা! আমি আবার কি সাহায্য করলাম!' হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়ল সুবর্ণা পোখরেল।

একে একে নেপালী যুবক, প্রৌঢ়া মহিলা এবং অন্যান্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাল রানা। ইতোমধ্যে হোটেলে মিনার্ভার সামনে চলে এসেছে ওরা, দলটা এখান থেকে কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে গেল—অশোকা হোটেলে ফিরবে একা রানা, সুবর্ণা আর প্রৌঢ়া ঢুকবেন মিনার্ভায়, বাকি সবাই কাছাকাছি অন্যান্য হোটেলে। কারও হাতেই বেশি সময় নেই, ডিনার খাওয়ার পর সুটকেস গুছাতে হবে, গাড়ি ধরে পৌঁছুতে হবে রেল স্টেশনে।

'আমার সুটকেস গোছানো শেষ,' রানার কানে ফিস ফিস করল সুবর্ণা পোখরেল। 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার পাঁচতারায় আসতে পারি? দিল্লীতে কি কেনাকাটা করলেন দেখব।'

হাসি চেপে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

প্রৌঢ়া মহিলাকে মিনার্ভার গেটে ছেড়ে দিয়ে অশোকার দিকে পা বাড়াল ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। আপাতত নিরাপদ বোধ করল ও, তবে জানে এত সহজে হাল ছাড়বে না শত্রুরা। তাপস গাঙ্গুলীর কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করল ও। রেকর্ডে কোন দাগ না থাকলেও, বিজনেস সিন্ডিকেটের শয়তানগুলো দেখেছে রানাকে একটা সিগারেটের প্যাকেট দিয়েছে সে। প্যাকেটের ভেতর কি আছে তা যদি জানে তারা, কি বলার থাকবে তাপস গাঙ্গুলীর? কিভাবে নিজেকে রক্ষা করবে সে? বিজনেস সিন্ডিকেটের কাজের ধারা সম্পর্কে টপ সিক্রেট ফাইলটা পড়া আছে রানার, কথা আদায়ের জন্যে টরচার করে বহু লোককে মেরে ফেলেছে তারা।

তারপর রানা ভাবল, এমন হতে পারে যে কুচক্রটিকে নানাভাবে সাহায্য করে নিজের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তাদের নিঃসন্দেহ করে রেখেছে তাপস গাঙ্গুলী। সেক্ষেত্রে অভিযোগটা খণ্ডন করতে বেগ পেতে হবে না তাকে। প্যাকেটের ভেতর কি আছে তা নিশ্চয় কাউকে জানতে দেয়নি সে। বা জানতে দেবেও না।

অশোকার হলরুমে দেশী-বিদেশী প্রচুর লোকজন, তাদের মাঝখান দিয়ে রানার হাত ধরে এলিভেটরের দিকে এগোল সুবর্ণা পোখরেল। কৌতুক বোধ করলেও, মনে মনে খানিকটা উদ্বিগ্নও বটে রানা, জানে একটা সময় আসবে যখন মেয়েটাকে হতাশ না করে উপায় থাকবে না ওর। মেয়েটা সরল, সেন্টিমেন্টাল এবং সম্ভবত আদর্শ প্রেমিকা হবার সমস্ত গুণের অধিকারী, কিন্তু অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করা স্বভাব নয় রানার, আর এই বয়সের একটা মেয়ের সাথে প্রেম করারও কোন ইচ্ছে নেই ওর। নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল ও, জড়িয়ে পড়ার আগেই কাঁধ থেকে নামিয়ে

দিতে হবে ভূতটাকে।

'সত্যি কি তুমি আমার কামরায় যেতে চাও?' এলিভেটরের সামনে পৌঁছে জিজ্ঞেস করল রানা। 'মানে, সেটা কি উচিত হবে?'

'উচিত হবে না মানে?' বড় বড় চোখ মেলে অবাক হয়ে তাকাল সুবর্ণা পোখরেল। 'আপনি আমার বন্ধু না? দাবায় আপনি আমাকে হারিয়ে দিয়েই তো সর্বনাশ করেছেন। কাসপারভকে বাদ দিয়ে আপনাকে বেছে নিয়েছি আমি—আমার হিরো হিসেবে।'

'কিন্তু তোমাকে তো আমি বলেছি, ওটা ছিল ঝড়ে বক।'

তিনতলার ডেস্ক থেকে চাবি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে চারতলায় উঠল ওরা। সুবর্ণা জিজ্ঞেস করল, 'কোনটা আপনার অ্যাপার্টমেন্ট?'

'এই করিডর ধরে পাঁচমাইল সামনে।'

অর্ধেকটা করিডর পেরিয়ে রানার একটা কব্জি চেপে ধরল সুবর্ণা, 'কেমন নির্জন, না? আলোও কম। আমার শীত করছে!'

'বলো, ভয় করছে।'

'মোটেই না!' সাথে সাথে প্রতিবাদ করল সুবর্ণা। 'আপনি সাথে থাকলে...'

'কেন, এমন হতে পারে না, আমিই তোমার জন্যে ভয়ের কারণ হয়ে উঠলাম?' রানা গম্ভীর। 'কাউকে উপদেশ দেয়া আমার স্বভাব নয়, তবু না বলে পারছি না—পা ফেলতে হয় একটু বুঝে-সুঝে। কার সাথে যাচ্ছ, কোথায় যাচ্ছ, এ-সব আগেই ভাবতে হয়।'

ঠোঁট কোলাল সুবর্ণা পোখরেল। 'ইঙ্গিতে কথা বললে খুব রাগ হয় আমার। তাছাড়া, আপনি বলতে চাইছেন, এখনও আমি ছোট। কিন্তু তা আমি নই। কি থেকে কি হয় সব আমি বুঝি, জানি নিজের জন্যে কোনটা ভাল।'

এই সময় পিপ পিপ শব্দ শোনা গেল, সাইকেল নিয়ে বাঁক ঘুরল বাচ্চাটা, রানাকে স্যালুট করে পাশ কাটাল। লাফ দিয়ে দেয়ালের সাথে সেঁটে গেল রানা, একটা হাত কপালে উঠে গেছে।

'বললে বিশ্বাস করবে, ওই বয়সের একটা ছেলে আছে আমার?'

খিলখিল করে হেসে উঠল সুবর্ণা পোখরেল। রানাকে বিস্মিত করে বলল, 'নেই বলেই জোকটা করতে পারছেন, মশাই!' প্রসঙ্গ বদলাল সে, 'ছেলেটা সুন্দর, তাই না?'

'দেখে যা মনে হয় ওর বয়স তারচেয়ে অনেক বেশি,' বলল রানা। 'অত্যন্ত প্রাচীন, জ্ঞানী পুরুষ সে—সত্যিকার আনন্দের গোপন উৎস আবিষ্কার করে ফেলেছে।'

দরজা খুলে আলো জ্বালল রানা, 'এসো!'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল সুবর্ণা পোখরেল। তারপর তর্জনী তুলে সাবধান করার ভঙ্গিতে বলল, 'ভুল বুঝবেন না, মিস্টার—ভয় নয়, আমার লজ্জা করছে।'

চোখ বুজে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এখনও?'

'উঁহু,' বলে দুপদাপ পায়ের আওয়াজ তুলল সুবর্ণা পোখরেল, রানাকে এক রকম

ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। 'ওমা, এ তো দেখছি রাজকীয় ব্যাপার-স্যাপার!'

কামরা নয়, গোটা একটা স্যুইট। বিশাল এন্ট্রান্স হল; পিয়ানো, কালার টিভি আর সোফা সেটসহ সিটিংরুম, এক কোণে রাইটিং টেবিল, আরেক কোণে ছোট্ট বার। বড় একটা কামরায় দুটো বিছানা, দু'জন শোয়। ছোট একটা কামরায় একটা বিছানা, রানার জন্যে। ভারত সরকার মাথাপিছু সবাইকে একটা নির্দিষ্ট টাকার হোটেল ভাড়া দিয়েছে, কেউ কেউ সেই টাকার সাথে পকেটের কিছু যোগ করে নিজেদের পছন্দমত হোটেলে উঠেছে। রানার কামরায় ঢুকে এটা সেটা দেখছে সুবর্ণা পোখরেল, দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল রানা।

'ভাল কথা, তোমার নামের শেষাংশটা আমার ঠিক মনে নেই…'

'পোখরেল।'

'কি জন্যে যেন বিখ্যাত তুমি?'

'ব্যঙ্গ করছেন, না? হারিয়েও তৃপ্তি হয়নি? আপনি সত্যি নিষ্ঠুর!' চোখ নামিয়ে নিল সুবর্ণা।

রানা ভেবেছিল রেগে উঠবে মেয়েটা, কিন্তু তার চোখ ছলছল করে উঠল দেখে অবাক হলো। অবশ্য মেয়েটার কাছাকাছি যাবার সুযোগ খুঁজছিল, সেটা পেয়েই খুশি ও। এগিয়ে এসে সুবর্ণার কাঁধে একটা হাত রাখল, বলল, 'ধ্যাত, আমি তো ঠাট্টা করছিলাম। অমনি মন খারাপ হয়ে গেল!'

হঠাৎ কি হলো, রানাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে থরথর করে কেঁপে উঠল মেয়েটা, রানার গায়ে হেলান দিয়ে নেতিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে মাথা রাখল বুকে। 'অরবিদ,' বিড়বিড় করল সে। 'অরবিদ সিংহে, আপনাকে আমার এত কেন ভাল লাগে!' রানার ঠোঁটের কাছে মুখ তুলল সে, পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হচ্ছে।

কাজের কাজ কিছুই হলো না, নিজেকে প্রায় জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে ছিটকে দূরে সরে এল রানা। 'তুমি ছেলেমানুষ, সুবর্ণা। আমি ঠিকই বলেছিলাম কোথায় পা ফেলছ জানো না।'

সুবর্ণার চেহারায় ভয়, চোখে সন্ত্রস্ত ভাব। 'আপনি আমাকে… আপনি আমা…'

'না, সুবর্ণা, আমি কিছু মনে করিনি। কেন কিছু মনে করব, বুঝতেই তো পারছি তুমি অত্যন্ত সরল। কিন্তু ভেবে দেখো, এখনও তুমি ছেলেমানুষ, আমরা বড়জোর বন্ধু হতে পারি, তার বেশি কিছু না।'

মাথা নিচু করে ঝাড়া দশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটা। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'এখানে আমার আসা উচিত হয়নি।'

রানা কোন মন্তব্য করল না।

স্যুট পরে আছে সুবর্ণা পোখরেল, পকেটে হাত ভরে বলল, 'এটা বোধহয় ফেরত চাইবেন আপনি?' চারমিনারের প্যাকেটটা বের করে দেখাল সে।

হেসে উঠল রানা। ও ভেবেছিল, যেভাবে মেয়েটার পকেটে ওটা ফেলেছে সেভাবেই বের করে নেবে, মেয়েটাকে কিছু জানতে না দিয়ে–কিন্তু সে সুযোগ আর পেল কই। 'কখন বুঝতে পারলে ওটা তোমার কাছে রয়েছে?'

'এলিভেটরে চড়ার পর, পকেটে হাত ভরার সময়। ব্যাপারটা কি? পুলিসটা

তাহলে মিছেমিছি অভিযোগ করেনি!'

'ধন্যবাদ, সুবর্ণা।' তার হাত থেকে প্যাকেটটা তুলে নিল রানা।

চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল মেয়েটা। 'কোন ব্যাখ্যা দেবেন না? নাকি চান, আপনাকে আমি চোর বলেই জানি?'

রানা হাসল না। 'কেউ কিছু দিলেই আমি যে নিই না, তা সে যতই দুর্লভ বা লোভনীয় হোক, সে অভিজ্ঞতা কি ইতিমধ্যে হয়নি তোমার, সুবর্ণা?'

একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, তারপর ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল। 'তিক্ত, তবে হয়েছে।'

'তিক্ত বলে ভাবছ, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত,' বলল রানা। 'কিন্তু যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তারপর তুমি আমাকে চোর বলে ভাবতে পারো?'

আবার সময় নিয়ে ভাবল মেয়েটা। তারপর মাথা নাড়ল। 'তবু, গোটা ব্যাপারটার একটা ব্যাখ্যা না থেকে পারে না।'

'ব্যাখ্যা একটা আছে বৈকি, কিন্তু সেটা জানলে তোমার বিপদ হতে পারে। শুধু জেনো, আমি কোন অন্যায় করছি না। এর সাথে আমার দেশের ন্যায্য স্বার্থ জড়িত। তুমি যদি এ-ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন না করো, এবং কাউকে কিছু না বলো, আমি সত্যি কৃতজ্ঞবোধ করব।'

'কেন আপনি আমাকে ছেলেমানুষ আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখতে চান, কেন আপনাকে আমার রহস্যময় বলে মনে হয়েছে, সব প্রশ্নেরই উত্তর পরিষ্কার হয়ে আসছে—হ্যালো, জেমস বন্ড?' বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বর।

অপ্রস্তুত বোধ করল রানা, অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল।

'এবার আমাকে যেতে হয়,' বলল সুবর্ণা। তাকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল রানা। 'আমি যদি আপনার প্রেমে না-ও পড়ে থাকি,' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা, 'আপনাকে আমি কোনদিন ভুলব না।' বলে আর দাঁড়াল না, হন হন করে করিডর ধরে হাঁটতে শুরু করল। কাঁধ আর ঘাড় আড়ষ্ট হয়ে আছে। তার দীর্ঘ, একহারা শরীরটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, দূরে কোথাও করুণ সুরে বেহালা বাজছে, বিষণ্ন হয়ে উঠল মনটা।

নিজের কামরায় ফিরে এসে দরজায় তালা লাগাল রানা। গা থেকে কোট খুলে, পকেট থেকে বের করল চারমিনারের প্যাকেট, কোটটা ছুঁড়ে দিল বিছানার ওপর। প্যাকেট খুলে ভেতর থেকে দশটা সিগারেট বের করল। একটা সিগারেটের ভেতর তামাক মাত্র অর্ধেক, বাকি অংশে পাওয়া গেল কালো রঙের একটা জিনিস, ষোলো মিলিমিটারের একটা ফিল্ম, রোল করা।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাইটা খুলল রানা, আবার সেটা শক্ত করে বাঁধল। নট-এর ভেতর ফিল্মের রোলটা ভরে নিয়েছে। এর মধ্যে ঝুঁকি আছে, নট শক্ত না হলে রোলটা খসে পড়বে। সাবধানের মার নেই ভেবে নটের নিচে খানিকটা সুতী উল ভরল ও, তারপর পরীক্ষা করল নটটা। আপাতত এতেই কাজ চালাতে হবে, অন্তত জাহাজে না ওঠা পর্যন্ত আরও নিরাপদ কিছু করা সম্ভব নয়। যতই ঝুঁকি থাক, নিজের সাথেই রাখতে হবে মাইক্রোফিল্মটা।

সুটকেস গোছগাছ করে নিল রানা, তালা লাগাল, ভারতীয় পর্যটন সংস্থার দেয়া লেবেল লাগাল গায়ে, কোটটা হাতের ভাঁজে নিয়ে নেমে এল ডাইনিংরুমে। ছ'টার সময় ডিনার, নতুন দিল্লী রেল স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়বে আটটায়।

করিডরের শেষ মাথায় দৈত্যাকার লোকটাকে দেখে একটুও অবাক হলো না রানা, বরং না দেখলেই বিস্মিত হত। একটা জানালার সামনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সে, রানাকে আসতে দেখেও ঘাড় ফেরাল না। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ঘাড়ের কাছে সড়সড় করল চুল, কিন্তু পিছন ফিরে তাকানোর ইচ্ছেটাকে দমন করল রানা। দরকার নেই, জানে লোকটা ভারতীয় এবং ওর ওপর নজর রাখার জন্যেই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেনে উঠতে পারলেই যে রেহাই পাওয়া যাবে তা নয়, জাহাজ পর্যন্ত পিছু নেবে ওরা, এমনকি শ্রীলংকা পর্যন্তও যেতে পারে। জিনিসটা রানার কাছ থেকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবেই ওরা।

# দুই

বাস আর মোটর কারের বিরাট একটা শোভাযাত্রা এসে পৌঁছুল রেল স্টেশনের সামনে। স্টেশনের একটা অংশ ট্যুরিস্টদের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, প্ল্যাটফর্মে নতুন রঙ করা ট্রেনটা শুধু তাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছে। মুখে সিগারেট, একটা হাত ট্রাউজারের পকেটে, কাঁধে ক্যামেরা, আনন্দমুখর মিছিলের সাথে এগিয়ে চলেছে মাসুদ রানাও। অশোকা হোটেলের করিডরে দাঁড়িয়ে থাকা দৈত্যটাকে দ্বিতীয়বার আর দেখেনি বটে, কিন্তু তার বদলে স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হবার মুহূর্তে দু'জন ভারতীয় জুটে গেছে কপালে। নাম করা হিন্দী ও ইংরেজি দুটো দৈনিক পত্রিকার জার্নালিস্ট তারা, পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন জয়া মালহোত্রা। এই মুহূর্তে রানার ঠিক পিছনে রয়েছে দু'জন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার দরকার নেই, রানার জানা আছে। পরিচয়ের মুহূর্তেই বুঝতে পারে, ও যেমন কবি নয় তেমনি লোক দুটোও জার্নালিস্ট নয়। তবে তাদের নিঃশব্দ, নির্বিঘ্ন উপস্থিতি একদিক থেকে স্বস্তিকর—এর মানে হলো, বিজনেস সিন্ডিকেট এখুনি জোর খাটাতে চাইছে না, অন্তত যতক্ষণ ভারতীয় এলাকায় থাকছে ও।

মনে মনে হাসল রানা। বিজনেস সিন্ডিকেট যতই না কেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ আর শক্তিশালী অপরাধচক্র হোক, তাদেরও কিছু অসুবিধে আছে। কুচক্রটির বৈশিষ্ট্যই হলো, প্রশাসন, সামরিক বাহিনী আর পুলিস ফোর্স-এর সদস্যদের মাধ্যমে কাজ উদ্ধার করা, কাজেই বুঝে শুনে ভেবে চিন্তে পা ফেলতে হয় তাদের। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে আগত কোন ট্যুরিস্টের সাথে পুলিসের কোন সদস্য খারাপ ব্যবহার করলে রীতিমত হৈ-চৈ বেধে যাবে, সংশ্লিষ্ট পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তদন্তশেষে শাস্তি হয়ে যাবে, তদন্তের সময় কুচক্রটির অনেক গোপন তৎপরতা ফাঁস হয়ে যাবার ঝুঁকি তো আছেই।

সেজন্যেই রানা ভাবছে, বোম্বে থেকে রাজহংস রওনা হবার আগে পর্যন্ত ওর ভয় পাবার তেমন কোন কারণ নেই। বোম্বে থেকে জাকনায় যাবার পথেও ওকে হয়তো বিরক্ত করা হবে না। তবে জাহাজ থেকে জাকনায় নামার পর কি ঘটবে বলা মুশকিল। স্বভাবতই ইতোমধ্যে বেপরোয়া হয়ে উঠবে শত্রুপক্ষ, শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবার আগেই একটা কিছু করতে চাইবে।

'হ্যালো, সিংহে!'

সিংহলী অধ্যাপক হরি শ্রেষ্ঠর সাথে করমর্দনের জন্যে থামতে হলো রানাকে। জাকনা থেকে আসার পথে জাহাজে একই কেবিনে ছিল ওরা, বোম্বেতে পৌঁছুনোর পর দু'জন দুই আলাদা গ্রুপে চলে যায়, তারপর ক'দিন আর দেখা হয়নি।

'হ্যালো, শ্রীবাস্তব?'

শিব শ্রীবাস্তব, নেপালী স্পোর্টসম্যান, ওদের কেবিনের তৃতীয় সঙ্গী। হরি শ্রেষ্ঠর সাথে এক মিনিট গল্প করল রানা, কাছাকাছি ভারতীয় এক যুবতীকে প্রায় কেঁদে ফেলতে দেখল, সুঠাম স্বাস্থ্য এক পাকিস্তানী যুবকের হাতটা শক্ত করে ধরে আছে সে, বিদায়ের মুহূর্তে দু'জনেরই মন বিষণ্ন। ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন পুলিস থমথমে চেহারা নিয়ে দৃশ্যটা অবলোকন করছে।

রানা আর হরি শ্রেষ্ঠ পরস্পরের টিকেট মিলিয়ে দেখল, দু'জনকে দুটো আলাদা কমপার্টমেন্টে উঠতে হবে। বিদায় নিয়ে সাত নম্বরে উঠল রানা, আট নম্বর কাউচটা দখল করল, সংক্ষিপ্ত কুশলাদি বিনিময় করল ভ্রমণসঙ্গীদের সাথে—একজন পুরুষ, দুটো মেয়ে—তারপর নিজের সুটকেসের খোঁজ করল।

খুঁজে না পেয়ে সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল ও, 'আপনাদের লাগেজ পৌঁচেছে?'

'হ্যাঁ,' একযোগে বলল সবাই। পুরুষ সঙ্গী জানাল, 'এসে দেখি আগেই পৌঁছে গেছে।'

'কিন্তু আমারটা পৌঁছায়নি।'

করিডরে বেরিয়ে এসে অ্যাটেনড্যান্টের সাথে কথা বলল রানা। নীল জ্যাকেট পরা হাসিখুশি এক লোক, বোম্বে থেকে আসার পথেও তাকে দেখেছে ও। 'ওহে, বর্মণ, সব লাগেজ কি পৌঁচেছে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে দিল মুকুল বর্মণ, জনান্তিকে বাংলায় বলল, 'আরে বাপু, ইংরেজি জানলে কি আর এই খোট্টাদের দেশে পড়ে থাকি!'

ইচ্ছা হলেও, মাতৃভাষায় কথা বলতে পারল না রানা। ইঙ্গিতে ডেকে তাকে নিয়ে কমপার্টমেন্টে ফিরে এল, সঙ্গীদের ব্যাগ আর সুটকেস দেখিয়ে নিজের বুকে আঙুল রাখল, তারপর হাত নেড়ে ভঙ্গি করল—নেই। গভীর আগ্রহ নিয়ে রানার মূকাভিনয় দেখল মুকুল বর্মণ, আবার বত্রিশ পাটি দাঁত বের করল সে, রানার ভঙ্গি অনুকরণ করে জানিয়ে দিল, এ-ব্যাপারে তারও কোন ধারণা নেই। অগত্যা প্ল্যাটফর্মে নেমে জয়া মালহোত্রাকে খুঁজে বের করল রানা। ছদ্মবেশী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন তিনি।

'এক্সকিউজ মি, মিসেস মালহোত্রা। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এল, কিন্তু কমপার্টমেন্টে এখনও আমার লাগেজ পৌঁছায়নি। কি হতে পারে?'

'ওহ্‌হো!' হতাশায় মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজলেন জয়া মালহোত্রা। 'যতই সাবধান হও, এ-ধরনের ঘটনা ঘটবেই। তবে চিন্তা করবেন না, মি. সিংহে, নির্ভাবনায় থাকুন। নিশ্চয়ই অন্য কোন কমপার্টমেন্টে আছে ওগুলো, ভুল করেছে পোর্টার। এখানে দাঁড়ান আপনি, দেখি খুঁজে পাই কিনা।'

হরিণীর মত চঞ্চল পায়ে ভিড় ঠেলে চলে গেলেন মহিলা। নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠায়, লোক দু'জনের দিকে তাকিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কি বোম্বে, নাকি একেবারে জাকনা পর্যন্ত যাবেন?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল তারা, একজন মৃদু হাসল। হঠাৎ টাইটার নট সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল রানা, সচেতনতার মাত্রা রীতিমত শারীরিক পীড়নের সমতুল্য হয়ে উঠল। ব্যাপারটা হয়তো কল্পনা, কিন্তু ওর মনে হলো লোক দু'জন সরাসরি ওটার দিকেই তাকিয়ে আছে। 'এক্সকিউজ মি,' বলে ঘুরে দাঁড়াল ও, হেঁটে ফিরে এল নিজের কমপার্টমেন্টে। জয়া মালহোত্রা ফিরে এসে কি বলবেন আন্দাজ করতে পারছে ও। লাগেজ ফিরে পাবে বটে, কিন্তু আজ রাতে অবশ্যই নয়। একবার কিছু হারিয়ে গেলে, খুঁজে বের করতেও তো সময় লাগে।

যথাসময়ে রওনা হয়ে গেল ট্রেন, দিল্লী ছাড়বার আগেই ওর কমপার্টমেন্টে হাজির হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন জয়া মালহোত্রা, জানালেন, ওর লাগেজ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে আবার পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বললেন, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ট্রেন বোম্বে পৌঁছুলে খুঁজে পাওয়া যাবেই।'

সবই সত্যি, তবু নিয়মমাফিক যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করল রানা। আরেকবার আশ্বাস দিয়ে ওর কাছ থেকে বিদায় নিলেন মহিলা। স্পীকার থেকে ভেসে এল লতা মঙ্গেশকারের একটা পুরানো দিনের গান। অপর দুই কাউচে হেলান দিয়ে উল বুনতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুই মহিলা সহযাত্রী। চা আর বিস্কুট নিয়ে এল মুকুল বর্মণ। অনেকক্ষণ পরপর হলেও, রানার একটা হাত টাইয়ের নট ছুঁয়ে উঠে যাচ্ছে কপালে, যেন চুল সরাতে ব্যস্ত।

শাওয়ার ইত্যাদি সারার পর মুকুল বর্মণের পরিবেশিত ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসল রানা। রাতে ভাল ঘুম হয়নি, কারণ ট্রেনের ড্রাইভার দু'মিনিট পরপর একবার করে দীর্ঘক্ষণ হুইসেল বাজিয়েছে—কোন সন্দেহ নেই আন-অফিশিয়াল হলেও, নির্ভেজাল ভারতীয় আতিথেয়তার আনন্দমুখর প্রকাশ ছিল ব্যাপারটা। সকাল আটটায় বোম্বে রেল স্টেশনে পৌঁছুল ওদের তুফান মেল।

ট্রেন থামতেই খালি হাতে নেমে পড়ল আরোহীরা, লাগেজগুলো একত্রিত করে রাজহংসে পৌঁছে দেয়া হবে। প্ল্যাটফর্মে প্রচণ্ড ভিড়। মিছিলে যোগ দেয়ার পর সরকারী ফটোগ্রাফারদের ফাঁকি দেয়ার জন্যে দু'বার পিছন ফিরতে হলো রানাকে। চেহারা আদি ও অকৃত্রিম না হলেও, দেহ-কাঠামোয় কোন ভেজাল নেই, সামনে থেকে তোলা কোন ফটো এখানে রেখে যেতে চায় না ও।

স্টেশনের বাইরে টাটার অনেকগুলো বাস আর অ্যামব্যাসাডর কার কয়েকটা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, সাথে একটা নিউজ-রীল ভ্যান, সেটার ছাদে ফিট করা হয়েছে

মূর্তি ক্যামেরা। ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিনস আর সাদা শার্ট পরা এক মহিলা। সঙ্গীরা কেউ পৌঁছুনোর আগেই গ্রুপের জন্যে নির্দিষ্ট বারো নম্বর কারে উঠে বসল রানা। তারপর একে একে এল তারা। সবার শেষে ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে উদয় হলেন জয়া মালহোত্রা। বলাই বাহুল্য, তাঁর সাথে সাংবাদিক দু'জনও এল।

'সবাই তো পৌঁছে গেছি। তাহলে অপেক্ষা করছি কেন?' রোগা চেহারার একজন পাকিস্তানী বুদ্ধিজীবী জিজ্ঞেস করল, কানের পাশে তার জুলফি জোড়া কমপক্ষে আড়াই ইঞ্চি লম্বা, আর কণ্ঠার আকার টেনিস বলের মত।

'সব কার একসাথে রওনা হবে,' মৃদুকণ্ঠে জানালেন জয়া মালহোত্রা। 'সুশৃঙ্খলভাবে।'

বুদ্ধিজীবী বুদ্ধি খাটিয়ে আবিষ্কার করল, তাঁর কথায় অসঙ্গতি রয়েছে। 'কোন কাজ এক সাথে করা আর শৃঙ্খলা, দুটোর সাথে আসলে কিন্তু কোন সম্পর্ক নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হয়ে গেলে, আপনি বলতে পারেন, তাতে শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করা হবে? আমার তো মনে হয়, আগেভাগে রওনা হয়ে গেলে দুর্ঘটনা ঘটার বা হাঙ্গামা বাধার সম্ভাবনা কম, তাতেই বরং শৃঙ্খলা বজায় থাকার নিশ্চয়তা রয়েছে। আমরা সবাই এই ক্লান্তিকর জার্নি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই, তাই নয় কি?' কথা শেষ করে সে তার গোটা শরীরটাকে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত বাঁকা করে তুলল।

মৃদু হেসে জয়া মালহোত্রা বললেন, 'আমরা ব্যাপারটাকে উৎসব হিসেবে দেখছি, মি. মিরাট খান। কিছু আনুষ্ঠানিকতা থাকতেই হয়। দেখছেন না, আপনাদেরকে বিদায় জানানোর জন্যে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে হাতে ফুলের ডালি নিয়ে?'

'শুধু ওদের নয়, অটোমেটিক অস্ত্রধারী প্রচুর পুলিসও আমি দেখতে পাচ্ছি, মিসেস মালহোত্রা—কোন সন্দেহ নেই, শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে, তাই না? নাকি দিল্লীর মত বোম্বেতেও খালিস্থান মুক্তিযোদ্ধারা তৎপর?'

সকৌতুকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন জয়া মালহোত্রা, কিন্তু তার আর দরকার হলো না, কারণ সামনের কারগুলো এক লাইনে রওনা হয়ে গেল। পিছু নিল ওরাও, ক্যামেরাসহ ভ্যানটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল ড্রাইভার। ছবি তোলা শেষ করে তীরবেগে ছুটে গেল ভ্যানটা, প্রতিটি সামনের বাঁকে সেটাকে অপেক্ষা করতে দেখল ওরা। জয়া মালহোত্রা জানালেন, 'ভারত জুড়ে প্রতিটি সিনেমা হলে আপনাদের এই শোভাযাত্রা দেখানো হবে।'

অবশেষে বন্দরে পৌঁছুল ওরা, জাহাজের পাশে থামানো হলো গাড়ির মিছিল। গভীর রাত পর্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করেছে রানা, নিরাপদে কোথায় লুকিয়ে রাখা যায় মাইক্রোফিল্মের রোলটা। জাহাজে প্যাসেঞ্জার'স শপ আর পারসার অফিসের পাশে একটা হল আছে, সেখান থেকে ফার্স্ট ক্লাস ডাইনিং রুমে নেমে গেছে একটা সিঁড়ি, ওখানে কাঠের চৌকো এক বেদীর ওপর বসানো আছে তামার তৈরি বেগম রোকেয়ার আবক্ষ মূর্তি। মাথাটা ফাঁপা, চোখের ভেতর দিয়ে একটা পেন্সিল ঢোকানো সম্ভব। টিউব আকৃতির মাইক্রোফিল্মটা দুই চোখের যে-কোন একটার ভেতর গলিয়ে দিলে আর কোন চিন্তা নেই। প্রকাশ্য জায়গায় থাকবে অথচ ওখানে

সার্চ করার কথা কেউ ভাববে না।

সবার আগে, তাড়াহুড়ো করে, গাড়ি থেকে নেমে পড়ল রানা। বহু লোক গ্যাংওয়ের দিকে হাঁটছে, ভিড় ঠেলে প্রায় ছুটতে শুরু করল ও, সারাক্ষণ জেটির কিনারায় থাকল। প্রায় বিশ গজের মত সামনে চলে এল ও, এতক্ষণে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার পিছন দিকে। অনেকটা পিছনে, ভিড়ের ভেতর, জয়া মালহোত্রার সাথে সাংবাদিক দু'জনকে দেখতে পেল ও। হাবভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, কাকে যেন খুঁজছে তারা। 'এই যে, আমি এখানে!' কৌতুক বোধ করে মুচকি হাসল ও।

সামান্য একটু ঝুঁকে, যাতে ওকে দেখতে না পায় বা দেখলেও চিনতে না পারে, হন হন করে হেঁটে গ্যাংওয়েতে পৌঁছে গেল রানা। অন্যান্য আরোহীদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে টানা রশির নিচ দিয়ে গলে কয়েক ফুট উঠে এল, পায়ের নিচে অ্যালুমিনিয়ামের মেঝে ভীতিকর শব্দ করছে, গ্যাংওয়ের মাথায় পৌঁছে দেখল ডেকগুলোয় জড়ো হয়ে আরোহীদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে অফিসাররা। সরাসরি কারও চোখে না তাকিয়ে তাদেরকে পাশ কাটাল ও। এক প্রস্থ সিঁড়ি টপকাল, অসম্ভব লম্বা একটা করিডর পেরোবার সময় দুই কি তিনজনের সাথে দেখা হলো। ফার্স্ট ক্লাস লাউঞ্জ হয়ে আরও ক'টা ধাপ বেয়ে নামল, নামার সময় ব্যস্ত হাতে ঢিলে করল টাইয়ের নট।

পানির মত সহজ। হলে কোন প্রাণী নেই। তবে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। এরইমধ্যে গলার আওয়াজ পাচ্ছে ও, সম্ভবত যাদেরকে পাশ কাটিয়ে এসেছে। তামার মাথাটা ভাল করে দেখল একবার, তারপর মাইক্রোফিল্মটা বাঁ চোখের ভেতর গলিয়ে দিল। চট করে আরেকবার দেখে নিল চারদিক।

সারা শরীরে স্বস্তির পরশ নিয়ে করিডরে ফিরে এল রানা, দুই প্রস্থ সিঁড়ি ভেঙে নিজের কেবিনের সামনে চলে এল। দরজায় তালা, চাবি পাবার জন্যে খুঁজে বের করতে হলো একজন স্টুয়ার্ডকে।

দিল্লীর উদ্দেশে রওনা হবার আগে ট্যুরিস্টদের পরামর্শ দেয়া হয়েছিল, তারা যেন একাধিক লাগেজ সাথে না রাখে। তাই দ্বিতীয় সুটকেসটা, একজোড়া জুতোসহ, কেবিনে রেখে গিয়েছিল রানা। সেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে আবিষ্কার করল, সার্চ করা হয়েছে। শত্রুপক্ষের ক্ষিপ্রগতি আর কাজকর্মে ত্রুটিহীনতার পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তারা যা খুঁজছে সেটা সুটকেসে নেই জেনেও সার্চ করার মানেটা কি? একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে, রানার পরিচয় জানার চেষ্টা করেছে তারা। তারমানে ইতোমধ্যে তাদের মনে সন্দেহ জেগেছে, অরবিন্দ সিংহে একটা কাভার।

দ্বিতীয় সুটকেসটায় রেজারসহ কিছু কাপড়চোপড় থাকায় ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা, দাড়ি কামিয়ে নতুন শার্ট আর স্যুট পরল, ভাবল ডাইনিং রুমে একবার টুঁ দিলে পরিস্থিতি সম্পর্কে আঁচ পাওয়া যেতে পারে। কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়েছে, দেখল লাগেজ নিয়ে এগিয়ে আসছে কয়েকজন পোর্টার। নিজের সুটকেস চিনতে পারল ও, চেয়ে নিয়ে ফিরে এল আবার কেবিনে, তালা লাগাল দরজায়।

সুটকেসটা ভাল করে পরীক্ষা করল রানা। কাল রাতে গুছিয়েছে, কাজেই

কিভাবে সাজানো হয়েছিল জিনিসগুলো মনে আছে ওর। অবশ্য মনে না থাকলেও চলত, কারণ সুটকেসের ভেতরটা এলোমেলো করার পর গোছানোর কোন চেষ্টাই করেনি প্রতিপক্ষ। কাজটা যারই হোক, সে চেয়েছে রানা জানুক।

সে-যাই হোক, টুথব্রাশের অভাবটা ঘুচল রানার। দাঁত পরিষ্কার করে সুটকেস থেকে বের করল সব, যেখানে যেটা রাখার দরকার রাখল, তারপর সুটকেস তছনছ করার গুরুতর অভিযোগ নিয়ে হাজির হলো পারসার-এর অফিসে। সেখান থেকে ডাইনিং রুমে চলে এল লাঞ্চ খেতে।

খেতে বসে কুচক্র অর্থাৎ বিজনেস সিন্ডিকেট সম্পর্কে কি জানে স্মরণ করল রানা।

বিজনেস সিন্ডিকেটের বর্তমান হেডকোয়ার্টার পাকিস্তানের ইসলামাবাদে। দু'বছর আগে ছিল নেপালের কাঠমণ্ডুতে। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের ধারণা, দু'বছর পর হেডকোয়ার্টার উঠে যাবে বাংলাদেশের রাজধানীতে। বিজনেস সিন্ডিকেটের গঠনতন্ত্র অনুসারে, প্রতিটি দেশে দু'বছর মেয়াদে হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হবে। সার্ক দেশগুলোর অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, মালদ্বীপ আর ভুটানের প্রায় সাতশো পুঁজিপতি তথা ব্যবসায়ী এই সংগঠনের সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের সংখ্যা দেড়শোর মত। এক হিসেবে জানা গেছে, সদস্যদের সম্মিলিত ধন-সম্পদ বা পুঁজির পরিমাণ বাংলাদেশী টাকায় পঞ্চাশ হাজার কোটির কম নয়। সদস্যরা অনেকেই যার যার দেশে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি, ব্যবসায়ী মহলে তো বটেই, সামাজিকভাবেও বিপুল সুখ্যাতির অধিকারী। এদের মধ্যে শিল্প-মালিকদের সংখ্যা নগণ্য, বেশিরভাগই উঠতি পুঁজিপতি, ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট-এর নাম করে চোরাচালানের জমজমাট ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। সবার পরিচয় জানা সম্ভব নয়, কারণ সংগঠনের ভেতর প্রচলিত অর্থে ব্যবসায়ী নয় এমন বহু লোকজন, যেমন–সরকার প্রধানদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় থেকে শুরু করে সংসদ সদস্য, আমলা, মন্ত্রীসভার সদস্য, প্রভাবশালী রাজনীতিক, এনজিও কর্মকর্তা পর্যন্ত ঢুকে পড়েছে ছদ্মপরিচয়ে।

সাতটা দেশের সাতজন ডিরেক্টরকে নিয়ে পরিচালকমণ্ডলী গঠিত। একাধিক সাব-কমিটি আছে, তাদের রিপোর্ট অনুসারে হেডকোয়ার্টারে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরিচালকমণ্ডলীই নির্ধারণ করে দেয় ত্রৈমাসিক কোটা–কোন দেশে কোন সদস্য কি পরিমাণ সোনা, হেরোইন বা অন্য কোন বেআইনী মালামাল পাচার করবে। অবৈধ যে-কোন ব্যবসা বিজনেস সিন্ডিকেটের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা পাবার উপযুক্ত, সেটা লাভজনক হলেই হলো।

সাতটা দেশে প্রায় দশ হাজার লোককে বেতন দিয়ে পুষছে বিজনেস সিন্ডিকেট। তাদের বেতনভুক কর্মচারীদের মধ্যে রয়েছে সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী, দূতাবাস কর্মী, পুলিস বাহিনীর সদস্য, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী, শহর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মকর্তা ও নির্বাচিত সদস্য, বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতা এবং শ্রমিক ও পরিবহন সংস্থাগুলোর কোন কোন নেতা। এক অর্থে, নিজেদের সংগঠন স্রেফ নামকাওয়াস্তে,

বিজনেস সিন্ডিকেট তাদের অবৈধ তৎপরতা চালায় সংশ্লিষ্ট সব ক'টা দেশের সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে। ফলে বিজনেস সিন্ডিকেটের সদস্য বলে এদেরকে আলাদাভাবে চেনা খুব কঠিন। সংগঠনের এই নিরাপদ অথচ বৈপ্লবিক ধারণাটি নাকি বাংলাদেশেরই কোন এক উঠতি পুঁজিপতির উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে।

বিজনেস সিন্ডিকেটের মূল শ্লোগান হলো–যেভাবে পারো টাকা কামাও। শিশুদের অপহরণ করার পর হত্যা করে রক্ত বেচা হয় স্থানীয় বাজারে, বিদেশে বেচা হয় মাথার খুলি। গ্রামাঞ্চল থেকে হাজার হাজার যুবতী মেয়েকে চাকরি দেয়ার নাম করে পাচার করা হয় মধ্যপ্রাচ্যে, ভোগ্যপণ্য হিসেবে। মোটা টাকার বিনিময়ে বিজনেস সিন্ডিকেটের সদস্যরা ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ ফেলে যাবার সুযোগ করে দেয় বিদেশী পরিবহন জাহাজগুলোকে। মাঝসমুদ্রে খাদ্য বোঝাই জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে চাল, গম, তেল, চিনি ইত্যাদির দাম বাড়িয়ে দেয়। একশো কোটি টাকার মেশিনারি পার্টস ইমপোর্ট করে, কিন্তু কাগজে-পত্রে দেখায় দশ কোটি টাকার আমদানী করা হয়েছে, এভাবে ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবার দেড়-দুশো কোটি টাকার শুল্ক ফাঁকি দেয়। প্রতি মাইল রাস্তা তৈরিতে বিল করা হয় এক কোটি টাকা, কিন্তু খরচ করা হয় দশ লাখেরও কম। গোপনে অ্যান্টিকস, গুইসাপ আর বাঘের চামড়া পাচার করে। বিদেশ থেকে চোরা পথে আনে সোনা আর হেরোইন। এমনকি বিজনেস সিন্ডিকেটের নির্দেশে ও প্রত্যক্ষ সহায়তায় কয়েকটা দেশে পপির চাষ পর্যন্ত শুরু হয়েছে। সামরিক তথ্য বেচাকেনায়ও পিছিয়ে নেই তারা, রাষ্ট্রীয় গোপন সিদ্ধান্ত ফাঁস করে দেয়ার বিনিময়ে সম্ভাব্য সব রকম সুযোগ সুবিধে গ্রহণ করে।

দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করছে বিজনেস সিন্ডিকেট। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারগুলো তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেও আজ পর্যন্ত শত্রুপক্ষকে ভালভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। সনাক্ত করতে পারলেও, তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। বিজনেস সিন্ডিকেটের সদস্যরা নিজেরা কোন কাজ সরাসরি করে না, সমস্ত অন্যায় অবৈধ কাজ তারা সরকারী আমলা, পুলিস আর সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সাহায্যে সমাধা করে। যদি কেউ হাতেনাতে ধরা পড়ে, তার কাছ থেকে কুই-কাওলাদের নাম জানা সম্ভব নয়, কারণ নিজেরাই তারা জানে না। তাছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের এই দেশগুলোয় টাকা ঢাললে সব মাফ হয়ে যায়, দু'দশটা খুন করেও চমৎকার রেহাই পেয়ে গেছে এমন দৃষ্টান্ত সংখ্যায় খুব কম নয়।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সই প্রথম এই কুচক্রটি সম্পর্কে একটা ফাইল তৈরি করেছে। ছয়টা দেশে গোপনে এজেন্ট পাঠিয়ে বিজনেস সিন্ডিকেটের সদস্যদের একটা তালিকাও সংগ্রহ করেছেন বি.সি.আই. চীফ। এই কাজে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ থেকে তাঁর এক এজেন্ট নিখোঁজ হয়ে গেছে, ধারণা করা হচ্ছে সে আর বেঁচে নেই। রাহাত খান জানেন, সদস্যদের পরিচয় উদ্ধার করাই শেষ কথা নয়, সেই সাথে যোগাড় করতে হবে অকাট্য প্রমাণ। প্রমাণ যোগাড় হলে, সমস্ত শক্তি এক করে দুর্জয় হতে হবে বি.সি.আই-কে, তারপর যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। সেজন্যে আয়োজন দরকার, দরকার সময়।

বাংলাদেশ থেকে কি চুরি করা হয়েছে এখনও তা জানে না রানা, তবে চুরিটা যে বিজনেস সিন্ডিকেট করেছে সেটা জানা গেছে। বস্ তাহলে ঠিক সন্দেহই করেছেন, ভাবল ও।

বিকেলে গাড়িতে চড়ে গুহা-মন্দির দেখতে বেরুল ওরা, ফেরার পথে গোটা বোম্বে শহর চক্কর দিয়ে এল। নরিম্যান পয়েন্ট শহরের ব্যস্ততম এলাকা, গুলিস্তানের যানজটের কথা মনে করিয়ে দিল রানাকে—লোকজন আর যানবাহনের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি হলেও এখানে সে-ধরনের কোন সমস্যা নেই। দলবেঁধে ঘুরে বেড়ানোর এক পর্যায়ে নিজেকে বন্দী বলে মনে হলো ওর, দু'তিনজন আরোহীকে দলে টেনে নিয়ে অভিজাত বান্দ্রা এলাকার কাছাকাছি গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ও, অজুহাত দেখাল কিছু কেনাকাটা করা দরকার। এতক্ষণ ওর পিছনের সীটে অলসভঙ্গিতে বসে থাকলেও, হঠাৎ করে সাংবাদিক দু'জনেরও কেনাকাটা করার শখ চাপল। রানার পিছু পিছু এক দোকান থেকে আরেক দোকানে ঘুরে বেড়াল তারা, সব সময় ভদ্রতাসূচক দূরত্ব বজায় রাখলেও নিজেদের উপস্থিতি গোপন করার কোন চেষ্টা করল না।

উদ্বেগ বোধ করার কোন কারণ দেখল না রানা। কেনাকাটা শেষ করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বন্দরে ফিরল ও, কাছাকাছি একটা স্টল থেকে শেষ ভারতীয় মুদ্রা খরচ করে কয়েকটা পত্রিকা কিনল। বসকে পোস্টকার্ড পাঠাবার কথাটা মনে পড়লেও, চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও। প্রয়োজন নেই, কাজেই ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। নিজেদের চেষ্টায় ওর পরিচয় যদি ওরা জানতে পারে তো জানুক, সে কোনরকম সাহায্য করতে যাচ্ছে না।

চারটের সময় জাহাজে ফিরল রানা, সবাই ফিরে আসার এক ঘণ্টা আগে। জাহাজ প্রায় খালিই বলা যায়। ফার্স্ট ক্লাস বার-এ চলে এল ও, দেখল খালি, আলোও জ্বলছে না। তবে হাতে লেখা একটা নোটিশ রয়েছে—জানা গেল, ট্যুরিস্ট ক্লাস বার খোলা পাওয়া যাবে। কিন্তু ওখানে পৌঁছুতে হলে জাহাজের পুরোটা দৈর্ঘ্য ধরে হাঁটতে হবে। কি আর করা, আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। ভারি নিঃসঙ্গ বোধ করছে।

সিগারেট ধরিয়ে বিয়ারের গ্লাসে মাত্র চুমুক দিয়েছে, এই সময় আশীর্বাদের মত উদয় হলো সুনীতা।

ভারতে পৌঁছুনোর পরদিন বোম্বের শিল্পকলা একাডেমীতে ট্যুরিস্টদের সম্মানে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে নৃত্য পরিবেশন করে সুনীতা খান্না। অনুষ্ঠানে ট্যুরিস্টদের অনেকেও অংশগ্রহণ করে। সুনীতা সুন্দরী, বয়স হবে একুশ কি বাইশ। অনুষ্ঠান শেষে যেচে-পড়ে রানাই তার সাথে আলাপ করে। নাচে ভাল হলেও পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নিতে চায় মেয়েটা, বিদেশী ভাষার মধ্যে সিংহলী আর তামিল শিখছে, ভাল ইংরেজি জানে। শিক্ষয়িত্রী হিসেবে তাকে কল্পনা করতে কষ্ট হবারই কথা, কারণ বেশিরভাগ সময় এমন পোশাক পরে থাকে সে যেন এখুনি কোথাও নাচতে যাবে। এই যেমন এখন, শাড়ি পরার ধরন, অলঙ্কারের বাহুল্য আর মেকআপের বহর দেখে মনে করা স্বাভাবিক যে কোথাও

থেকে নেচে এল বা নাচতে যাচ্ছে। কম কথা বলে, মার্জিত চলাফেরা, কিভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে হয় ভালই জানা আছে।

বারের পাশ ঘেঁষে চলে যাচ্ছিল, রানাকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। টেবিল ছেড়ে উঠে এল রানা।

'হ্যালো,' বলল ও। 'চিনতে পারো? আবার দেখা হবে ভাবিনি।' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলেই ফেলল, 'বসবে নাকি?'

রানাকে ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকল সুনীতার দৃষ্টি, বারে আর কোন লোক নেই দেখে আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠল, তবু ইতস্তত করে বলল, 'বসব?'

'যদি আপত্তি না থাকে,' ভুবনভোলানো হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার চেহারা।

পাতলা ঠোঁট মুহূর্তের জন্যে দাঁত দিয়ে সামান্য একটু কামড়ে আবার ছেড়ে দিল সুনিতা। 'ঠিক আছে।' রানার সাথে টেবিলে চলে এল সে। মৃদুকণ্ঠে ব্যাখ্যা করল, নেপালী এক মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে তার, তাকেই খুঁজতে এসেছিল, কিন্তু না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল। মেয়েটার নাম বলল, কিন্তু রানা তাকে চেনে না।

'তোমার জন্যে কি বলব?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'হালকা কিছু, নাকি···?'

প্রায় আঁতকে উঠল সুনীতা। 'না-না! আমি ড্রিঙ্ক করি না! কখনও খাইনি!'

বাংলাদেশী জাহাজ, বার-এর ব্যবস্থা শুধু বিদেশী ট্যুরিস্টদের জন্যে, স্টকে প্রচুর ঠাণ্ডা ও হালকা পানীয় রয়েছে। সুনীতা কোকাকোলা চাইল, কখনও খায়নি।

গ্লাসে ঢেলে সাবধানে চুমুক দিল সে, হাসি হাসি মুখ করে মাথা ঝাঁকাল। 'ভালই তো।' এরপর সে জানতে চাইল, দিল্লী কেমন লাগল রানার। রানা বলছে, মাঝখানে বাধা দিয়ে সুনীতা জানাল, 'মেয়েটার সাথে কেন দেখা করতে এসেছিলাম, জানেন?' শব্দ করে হেসে উঠল সে।

'কেন?'

'আগে কখনও বড় কোন জাহাজে চড়িনি তো, ওর কাছ থেকে কথা আদায় করেছিলাম, ঘুরে ঘুরে সব দেখাবে আমাকে। রাজহংসে নাকি সুইমিং-বাথ-এর ব্যবস্থা আছে···' এবার খিলখিল করে হেসে উঠল সুনীতা। '···আমার খুব ইচ্ছে সাঁতার কাটব!'

মেয়েটার সারল্য আর কৌতূহল স্পর্শ করল রানাকে। কৌতুক করে বলল, 'আগে কখনও করা হয়নি, এর তালিকাটা দেখছি বেশ লম্বা তোমার। কোন সমস্যা নেই, অল্প সময়ের জন্যে হলেও ইচ্ছে করলে আমাকে গাইড হিসেবে পেতে পারো তুমি। জাহাজ দেখতে চাও, বান্দা হাজির। সুইমিং-বাথ? কেন নয়! ওটা কোথায় জানো তুমি? জাহাজের তলায়, ওয়াটার লাইনের নিচে।'

বিস্ময় আর রোমাঞ্চে হাতের গ্লাস এত জোরে চেপে ধরল সুনীতা, রানার মনে হলো ওটা ভেঙে যাবে। বিল মিটিয়ে সুনীতাকে নিয়ে বেরুল ও। দুই প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে বলল, 'আমার কেবিনটা এই ডেকে।'

'চলুন, একবার টুঁ মেরে আসি,' বলল সুনীতা। 'এর মধ্যে যদি আমার বান্ধবী ফিরে আসে, তাহলে আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।'

ইতস্তত করল রানা। 'এখনই তুমি আমার কেবিনে যেতে চাও? তার আগে জাহাজটা ঘুরে দেখলে হত না?'

হেসে উঠল সুনীতা। 'আপনার কেবিন দেখা আর জাহাজ দেখার মধ্যে পার্থক্যটা কি?'

সুনীতার চেহারায় চট করে কি যেন খুঁজল রানা, কিন্তু সরল কৌতুক আর নিষ্পাপ কৌতূহল ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। তার এই কৌতূহলের সুযোগ নেয়ার কোন ইচ্ছাই ওর নেই, তবে মেয়েটার স্বতঃস্ফূর্ত ভাব একটু যেন অপ্রত্যাশিত লাগল ওর। সেজন্যেই, কেবিনে ঢোকার পর, সুনীতা কিছু বলে কিনা দেখার জন্যে দরজা বন্ধ করে দিল ও। কোন প্রতিক্রিয়া হলো না।

বিছানার ওপর থেকে একটা বই তুলে নিল সুনীতা। 'হেমিংওয়ে। কেমন লাগে আপনার?'

'ভাল,' সংক্ষেপে বলল রানা। কেন যেন মনে হলো, এটা ঠিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনার সময় নয়।

'হেমিংওয়েকে আমি ভোগবাদী বললে আপনি প্রতিবাদ করতে পারবেন না,' বলল সুনীতা। 'প্রচুর খাবার, প্রচুর মদ আর মেয়েমানুষ, এ-সবই আপনি পাবেন তাঁর লেখায়। ব্যক্তিগত জীবনেও ভদ্রলোক মেয়েদের সাংঘাতিক ভক্ত ছিলেন।'

হেসে উঠল রানা। 'যদি বলি, তুমি আসলে আমারই নিন্দা করছ?'

'ধ্যেত, আপনি কেন সেরকম হতে যাবেন।'

'ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, সেরকম আমি হতে চাইছি না। এই হলো আমার কেবিন, এখন আমরা কি করব?'

সরাসরি জবাব না দিয়ে সুনীতা খান্না বলল, 'ভেবেছিলাম গল্প করব, কিন্তু এখানে খুব গরম। আচ্ছা, সাঁতার কাটা সম্ভব? মানে, নিয়মের বাইরে কিছু হয়ে যাবে না তো?'

'সুইমিং-বাথে, বলতে চাইছ?'

'হ্যাঁ,' আগ্রহের সাথে বলল সুনীতা। 'কেউ আপত্তি করবে না তো?'

'কেন কেউ আপত্তি করবে, তুমি আমার অতিথি না? যদি চাও, তোমার সাথে আমিও সাঁতরাতে পারি।'

'কি মজা!' প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল সুনীতা। পরমুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল তার চেহারা। 'কিন্তু আমার যে সুইমিং কস্টিউম নেই!'

তাকে রানা জানাল, সুইমিং-বাথের ইন্সট্রাক্টরের কাছ থেকে চেয়ে নেয়া যাবে একটা। তারপর বলল, 'দয়া করে একটু যদি বাইরে অপেক্ষা করো, বেদিং শর্টস পরে নিতে পারতাম।'

হঠাৎ লজ্জা পাওয়া চেহারা নিয়ে এক রকম ছুটেই কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল সুনীতা, দরজার কাছ থেকে বলল, 'বেশি দেরি করবেন না, মশাই!'

খানিক পর বেদিং শর্টস, স্যান্ডেল আর বাথ-রোব পরে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। আরও দুই ডেক নিচে সুইমিং-বাথ। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় সাঁতারে নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানাল সুনীতা। ইদানীং ডাইভিঙের ভক্ত হয়ে উঠেছে সে। প্রথম

দিকে অবশ্য স্রেফ লাফ দিত, নাক চেপে ধরে। 'আরে!' সবিস্ময়ে বলল সে, দাঁড়িয়ে আছে সুইমিং হলের দোরগোড়ায়। 'কেউ কোথাও নেই, সব যে একেবারে খাঁ খাঁ করছে!'

ঠিক তাই। কেউ কোথাও নেই।

'ভালই হয়েছে, ইচ্ছেমত যা খুশি করা যাবে!' ছোট্ট খুকীর মত খুশি হয়ে উঠল সে। তার কৌতূহলের কোন পরিসীমা নেই—কোত্থেকে পানি আসে, বেরোয় কোন পথে, হিটিং অ্যাপারেটাস কিভাবে কাজ করে, এক এক করে সব তাকে দেখাতে হলো। আবদার ধরায়, জিমনাস্টিক ইকুইপমেন্টগুলোর ব্যবহার পদ্ধতিও শেখাতে হলো রানাকে। স্প্রিঙ বোর্ডের কিনারায় দাঁড়িয়ে ওটার নমনীয়তা পরীক্ষা করল সুনীতা। তারপর শাওয়ারগুলো দেখতে চাইল।

সময় বয়ে যাচ্ছে অথচ সুনীতার মধ্যে কোন ব্যস্ততা নেই। এদিকে শীত শীত করছে রানার। অবশেষে ওকে বলতে হলো, 'তুমি যদি কিছু মনে না করো, আমি বরং গায়ে কিছু চড়িয়ে আসি।'

বিড়বিড় করে কি যেন বলল সুনীতা, পরমুহূর্তে অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল, তাকিয়ে আছে রানার পিছনে দরজার দিকে। ঘুরল রানা।

সাংবাদিক দু'জন দাঁড়িয়ে রয়েছে, বড় একটা পিস্তল হাতে রানাকে কাভার দিচ্ছে একজন। দেখে মনে হলো, নাইন এম এম। বোধহয় বেরেটা। অপরজন হাত তুলে ইশারা দিল, একটাও কথা না বলে বা রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সুনীতা খান্না—সাহায্য আনতে নয়, এটা পরিষ্কার। চেহারায় রাজ্যের সরলতা নিয়ে সুন্দরী মেয়েটা ওদেরই এক সঙ্গিনী, চমৎকার অভিনেত্রীও বটে।

'এটা তোমরা কি খেলা খেলছ?' কঠোর সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'চোর-পুলিস,' দু'জনের একজন চোস্ত সিংহলী ভাষায় জবাব দিল।

'তোমরা চোর আর আমি পুলিস?' সাথে সাথে মন্তব্য করল রানা, বলার মত আর কিছু ভেবে পেল না। ঘটনার আকস্মিকতায় এখনও বিস্মিত।

সাবধানে শাওয়ার রুমে ঢুকল ওরা, পিস্তলধারী লোকটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা, তারপর হেলান দিল কপাটের গায়ে। ভাব দেখে মনে হলো, দু'জনই জানত ঠিক এই অবস্থাতেই পাওয়া যাবে রানাকে।

'আমার যতদূর মনে পড়ে, পরিচয়ের সময় বলা হয়েছিল তোমরা সাংবাদিক,' নিজেকে নিয়ন্ত্রণে এনে শান্ত গলায় বলল রানা। 'কলমের বদলে হাতে পিস্তল কেন? শুনেছি তোমাদের হিন্দী ছবিতে এ-ধরনের আজগুবি ব্যাপার ভূরি ভূরি আছে।' হঠাৎ রানার চোখের দৃষ্টি কঠিন হলো। 'পথ ছাড়ো। শীত করছে, কাপড় পরা দরকার. আমাকে কেবিনে ফিরতে হবে।'

'কাপড় যে কেবিনে ছেড়ে এসেছ, আমরা জানি। এইমাত্র সার্চ করে এলাম।'

তারমানে ফাঁদে ভালভাবেই পা দিয়েছে রানা। ব্যাপারটা যুক্তিযুক্ত টোপ ছিল. সুনীতা গোসল করতে চাইলে রানাও তার সাথে পানিতে নামতে চাইবে। কিন্তু মেয়েটা আগে থেকে জানবে কিভাবে যে কেবিনেই কাপড় পাল্টাবে রানা? স্যুট পরে সুইমিং-বাথে ঢুকলে কি ঘটত? উত্তরটা সহজ, সেক্ষেত্রে এরা দু'জন এখানে সার্চ

করত ওকে।

'তাপস গাঙ্গুলী মুখ খুলেছে,' বলল একজন, যার হাত খালি।

'কে?' রানার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল।

'তাপস গাঙ্গুলী।'

'নামটা আগে কখনও শুনিনি।' সত্যি না-ও হতে পারে, ভাবল রানা। সম্ভবত ওকে দুর্বল করার জন্যে বানিয়ে বলছে।

অলসভঙ্গিতে হাসল লোকটা, যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। 'কাজেই দিল্লী কাফের টেবিল থেকে যে জিনিসটা তুলে এনেছ সেটা তুমি আমাদেরকে ফেরত দেবে। শুধু ওটাই চাই আমরা। তারপর তুমি যেতে পারো।'

'তোমাদের ঔদার্য আর মহত্ত্বকে নমস্কার। কিন্তু মুশকিল হলো, কোন কাফে টেবিল বা কোন জিনিস সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। তোমরা কি বলছ বুঝতে পারছি না।'

'তারমানে সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না—বেশ,' হিসহিস করে বলল লোকটা, বস্তাপচা হিন্দী ছায়াছবির ভিলেনের মতই চুটকি বাজিয়ে নির্দেশ দিল, 'তোমার ড্রেসিং গাউন আর শর্টস, দুটোই খোলো।'

জানে তর্ক করা বৃথা, তবু তিক্ত হাসি নিয়ে রানা বলল, 'আমাকে দেখার এত শখ? সুনীতা দেখতে চাইলে না হয় কথা ছিল। একজন আমাকে সার্চ করলেই তো পারো।'

'মালুম হোতা হ্যায়...'

পিস্তলধারীকে থামিয়ে দিয়ে রানার উদ্দেশে গর্জে উঠল অপর লোকটা, 'কথা না শুনলে মেরে তক্তা বানাব। খোলো সব!'

ওর সাথে মাইক্রোফিল্মটা নেই দেখলে লোকগুলো হয়তো অন্য কোথাও খোঁজার জন্যে চলে যাবে। উপায় নেই, সম্পূর্ণ দিগম্বর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা।

'স্যান্ডেল দুটো!'

তাও খুলল রানা। প্রথম লোকটা এখনও পিস্তল হাতে দরজার গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে, দ্বিতীয় লোকটা রানার প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। হতভম্ব দেখাল, তারপর রাগে লাল হলো সে, হিংস্র চোখে তাকাল রানার দিকে, হিসহিস করে বলল, 'কোমর বাঁকা করে সামনে ঝোঁকো।'

রাগে জ্বলে গেল গা, কিন্তু পিস্তলের মুখে ব্যবসায়ীর আচরণ করল ও—ঝুঁকল, ডেক থেকে তুলে নিল কাপড়গুলো, পরতে শুরু করল। শর্টসের ভেতর মাত্র একটা পা গলিয়েছে, হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল ভারতীয় একজনের পায়ে, হাঁটুর নিচে হাড়ের ওপর বুটের আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়ল রানা দেয়ালের গায়ে, অন্ধকার দেখল চোখে। উল্টো করা পিস্তলের বাড়িটা মাথায় লাগল, তারপর আর কিছু মনে থাকল না ওর।

জ্ঞান ফিরল শাওয়ারের নিচে। রানার পাশে, পানির নাগাল থেকে সামান্য দূরে অপেক্ষা করছে দু'জন।

'তোমাকে দয়া করছি আমরা,' পিস্তলধারী বলল। 'বুঝতেই পারছ, ইচ্ছে

করলে এখানেই তোমাকে আমরা মেরে রেখে যেতে পারি। তাই মারব, তবে এখুনি নয়। তুমিও জানো, আপাতত তোমার বড় ধরনের কোন ক্ষতি আমরা করব না। কিন্তু মনে রেখো, জাহাজ থেকে জাফনায় নামার পর তোমার প্রাণের মূল্য এক রূপীও থাকবে না। সাবধান, মাঝখানের সময়টা তোমার ওপর আমাদের নজর থাকবে।'

কথাগুলো বলেই তাড়াহুড়ো করে চলে গেল লোকগুলো। শাওয়ারের নিচ থেকে সরে এসে দাঁড়াল রানা। গা মুছে শর্টস পরল, পায়ে স্যান্ডেল গলাল, কাঁধে বাথ-রোবটা ফেলে বেরিয়ে এল শাওয়ার রূম থেকে। কেবিনে ফেরার পথে কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করল ও। কর্কশ হুমকি দিয়ে গেল লোকগুলো, হালকা ভাবে দেখার উপায় নেই। আপাতত বলতে আগামী চারদিন, ওর বড় কোন ক্ষতি করা হবে না। কথাটা কতটুকু সত্যি হবার সম্ভবনা?

ভারতীয় জলসীমায় রয়েছে বা আরও ক'টা দিন থাকবে রাজহংস, জাহাজটা বাংলাদেশের, আরোহীরা সবাই সরকারী আমন্ত্রণে ভারত সফর করে ফিরছে—এই পরিস্থিতিতে রানা যদি ভারতীয় হত, কি করত ও? জাহাজ জাফনায় না পৌছুনো পর্যন্ত নজর রাখা আর অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার থাকত ওর?

চার চারটে দিন, কাটায় কিভাবে? বিতর্ক ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে বটে, কিন্তু ও-সব রানার ভাল লাগে না। বয়স, মন-মানসিকতা, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি মেলে এমন যুবতী পাওয়া গেলে সময় কাটানো কোন সমস্যা নয়। কিন্তু তেমন মেয়ে চাইলেই পাচ্ছে কোথায় সে? ঠিক করল, চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, খুলে যেতে পারে ভাগ্য। সে-ও অন্য এক ধরনের তল্লাশি চালাবে। ফাঁদ পাতবে মেয়ে ধরার।

# তিন

ওকনো মাটিতে পা ফেলার আগে কিছু ঘটবে না, এটা ধরে নিয়ে ভুল করেছে রানা।

বাম দিকে ভারতকে রেখে আরব সাগর ধরে এগোল রাজহংস। যাত্রা শুরুর পর প্রথম ভোরে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে অল্প সময়ের জন্যে ভিড়ল জাহাজ, গভীর রাতে ভিড়ল কর্ণাটকের কামটায়। আরোহীদের নামার অনুমতি দেয়া হয়নি, তবে দুই রাজ্য থেকেই শিল্পী আর পণ্ডিতদের একটা করে দল উঠল জাহাজে, গায়ে এসে ঠেকল হকারদের কিছু নৌকো। শেষবার কেরালার কোচিনে নোঙর ফেলেছে জাহাজ, রসদ আর জ্বালানি সংগ্রহ করা হয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে কাল দুপুর নাগাদ জাফনায় পৌছে যাবে ওরা।

ফিরতি পথে দিল্লী আর বোম্বে সহ অন্যান্য শহর থেকেও বেশ কিছু ভারতীয় স্টাডি গ্রুপ ওদের সাথে চলেছে, জাফনা পর্যন্ত যাবে। ডাক্তার আর সার্জেনদের গ্রুপটা ফার্স্ট ক্লাস লাউঞ্জ প্রায় দখল করে রেখেছে, ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা ও হাসপাতাল

সম্পর্কে ট্যুরিস্টদের মূল্যবান মতামত সংগ্রহে ব্যস্ত। শিক্ষকদের আলোচ্য বিষয় শিক্ষাদান পদ্ধতি। সব মিলিয়ে প্রায় গোটা বারো গ্রুপ, কোন হল বা লাউঞ্জ কখনোই খালি থাকে না। গুরুগম্ভীর আলোচনা সভার মাঝে প্রায়ই অনুষ্ঠিত হচ্ছে গান, নাচ বা কৌতুকাভিনয়ের আসর। যারা সিরিয়াস টাইপের, অক্লান্তভাবে তর্ক-বিতর্কে অংশগ্রহণ করছে—বার, করিডর, খোলা ডেক, এমনকি সুইমিং-বাথেও দেখা যাবে এদেরকে। পক্ষ, বিপক্ষ আর নিরপেক্ষ; এই তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ট্যুরিস্টরা। একদল, সংখ্যায় তারাই ভারী, ভারতের বড়ভাইসুলভ আচরণে ক্ষুব্ধ, তারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতেও দ্বিধা করছে না। আরেক দল ভারতের প্রতিটি আচরণ সমর্থন করে যাচ্ছে। শেষ অর্থাৎ নিরপেক্ষ দলের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে কম, অপর দুই দলের তীব্র সমালোচনার শিকার হলো তারা। শেষদলে ঠাঁই পেয়ে গর্ববোধ করল রানা। একজন পাকিস্তানী ওকে জিজ্ঞেস করল, 'ভারতীয় নারীদের পজিশন সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' উত্তরে রানা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'আরে, আপনি জানলেন কিভাবে আমি ভারতীয় নারী সম্পর্কে উৎসাহী, পাকিস্তানী নারী সম্পর্কে নই? আপনারা তো ওদেরকে বোরখা আর চার দেয়ালের ভেতর আটকে রাখার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন, তাই না?' মাথায় জিন্না টুপি আর শেরওয়ানি পরা পাকিস্তানী যুবক লাল চেহারা নিয়ে দ্রুত কেটে পড়ল।

ওর জবাবটা শুনতে পেয়ে সহাস্যে এগিয়ে এল একজন ভারতীয় কংগ্রেস কর্মী। 'আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে এ-ব্যাপারে একমত হবেন যে সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান ভারতে নেই। আমরা ধর্ম-নিরপেক্ষ, নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী...'

'আচ্ছা,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'হিসেবটা ঠিক কিনা বলতে পারেন? স্বাধীনতার পর ভারতে পাঁচ, নাকি ছ'হাজার বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে?'

পাকিস্তানীর মত, গান্ধীটুপি পরা ভারতীয় যুবকও পালাতে দিশে পেল না।

সামনে যে রাত আসছে, আরব সাগরে ওটাই শেষ রাত ওদের, ট্যুরিস্টরা সবাই যে যার রুচি আর পছন্দ অনুসারে বিচিত্র পোশাক পরে বিচিত্রানুষ্ঠানে যোগ দেবে, তবে এ-ব্যাপারে কোন রকম বাধ্যবাধকতা নেই।

সমুদ্রভ্রমণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে বলে রানা খুশি। বোম্বে ছাড়ার পর থেকে সময়টা বড় একঘেয়ে কাটছে। টেবিল-টেনিস বা দাবা কত আর খেলা যায়।

সুন্দরীদের অভাব নেই জাহাজে। ফাঁদ পাততে হয়নি, তাদের অনেকে উপযাচক হয়ে ওর সাথে ভাব জমাতেও চেষ্টা করেছে, কিন্তু অবচেতন মন অতিমাত্রায় সতর্ক থাকায় তাদের সাথে ঠিক ব্যবহারটি করতে ব্যর্থ হয়েছে রানা, ফলে লাভ নেই জেনে ফিরে গেছে ওরা। একটু দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছে রানা, ফাঁদে ফেলার জন্যে আবার কোন সুন্দরী মেয়েকে পাঠাতে পারে বিজনেস সিন্ডিকেট, এই ভয়টা গেঁথে গেছে ওর মনে।

একসময় ওর মনে হয়েছে, নিরাপদ মেয়ে বলতে একজনই আছে জাহাজে, সে হলো সুবর্ণা পোখরেল। বোম্বে থেকে রওনা হবার পর, কিংবা দিল্লী থেকে বোম্বে আসার পথে ট্রেনে, মেয়েটার সাথে বহুবার দেখা হয়েছে ওর। কখনও একা, কখনও

সাথে এক যুবক ছিল। ওর ওপর ভীষণ খেপে আছে মেয়েটা। দেখা হলেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে, প্রায় সবেগে। সরল মেয়েটা মনে দুঃখ পেয়েছে বুঝতে পেরে খারাপ লেগেছে রানার। আবার এ-ও লক্ষ করেছে, ও যখন সরাসরি তাকিয়ে নেই, ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে সুবর্ণা, চোখাচোখি হলেই ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। লক্ষণ অত্যন্ত খারাপ, কাজেই তাকেও রানা এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। একেবারেই ছেলেমানুষ মেয়েটা, আরও আঘাত তার সইবে না।

তবে এ-যাত্রায় ওর কপাল যে একেবারেই মন্দ তা-ও নয়। আশ্চর্য এক সপ্রতিভ, প্রাণ চঞ্চলা হরিণীর সন্ধান পেয়েছে ও, প্রথম দর্শনেই যাকে রহস্যময়ী বলে মনে হয়েছে ওর। প্রতি মুহূর্তে আট থেকে দশজন প্রৌঢ় তাকে ঘিরে থাকে। প্রথমে রানা মেয়েটার চুলের প্রশংসা শুনে আকৃষ্ট হয়েছিল–দুই পাকিস্তানী তর্ক করছিল, একজনের ধারণা ওগুলো পরচুলা। বাজিতে হেরে যায় সে, জানা গেল হাঁটুর পিছন পর্যন্ত লম্বা ওগুলো নকল নয়, আসল জিনিস। তখনও রানা মেয়েটার মুখ দেখেনি, প্রৌঢ়দের সাথে ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল সে, ফার্স্ট ক্লাস লাউঞ্জে। সাধারণ বাঙালী মেয়ের চেয়ে তিন ইঞ্চি বেশি লম্বা, ভরাট দেহসৌষ্ঠব, অথচ মেদ নেই। তারপর আয়নায় তার চোখ আর নাক, ভুরু আর চিবুক, দাঁত আর ঠোঁট দেখতে পেল রানা, একদৃষ্টে ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল সে। চোখাচোখি হতেও দৃষ্টি সরাল না, বরং কয়েক সেকেন্ড পর ঘাড় ফেরাল ওর দিকে, সরাসরি তাকাল। মুখের ত্বক পাকা ডালিমের মত রাঙা, এত মসৃণ আর নিভাঁজ যে চোখ ফেরাতে পারল না রানা। নিজের অজান্তেই ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে তার অস্তিত্ব আর উপস্থিতির প্রতি সম্মান জানাল। মিষ্টি করে ক্ষীণ একটু হাসল মেয়েটা, যেন কতকালের পরিচয়। রানার মাথা নোয়ানোর উত্তরে মাখনরঙা লম্বা হাতটা সামান্য একটু দোলাল সে, ছোট্ট করে উচ্চারণ করল, 'হাই!'

প্রথম পরিচয়ের পর আরও পাঁচ-সাতবার দেখা হয়েছে ওদের। কখনও পরস্পরের চোখে চোখ রেখে নিঃশব্দে হেসেছে ওরা। কখনও হাঁটার গতি এক সেকেন্ডের জন্যে শ্লথ করে হাত নেড়েছে। কখনও, 'ভার্ল?' জিজ্ঞেস করে চলে গেছে যে যার পথে। ইতোমধ্যে মেয়েটা সম্পর্কে রানার গবেষণা অনেকদূর এগিয়েছে। অদ্ভুত এক ব্যাপার, দিনে পাঁচ-সাতবার পোশাক পাল্টায় সে, কিন্তু প্রতিটি পোশাক তার কালো। শাড়ি, ট্রাউজার, ম্যাক্সি, সালোয়ার-কামিজ, সবই সে পরে, কিন্তু কালো ছাড়া অন্য কিছু নয়। হরিণীর মতই চঞ্চল, প্রৌঢ়দের দলটাকে নিয়ে গোটা জাহাজ সারাক্ষণ চষে বেড়াচ্ছে, তার পিছনে থাকার জন্যে লোকগুলোকে রীতিমত হাঁপাতে দেখেছে রানা। মেয়েটার চেহারায় ঠিক সারল্য বা বোকা বোকা কোন ভাব নেই, আছে আন্তরিকতার ছোঁয়া। সরাসরি তাকায়, স্পষ্ট করে কথা বলে, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা ঋজু–এ সব দেখে রানার মনে হয়েছে মনে পাপ বা কলুষ না থাকলেই শুধু কোন মেয়ে এত সৌন্দর্য নিয়ে এমন মুক্তবিহঙ্গের মত চলাফেরা করতে পারে।

মুশকিল হলো, তাকে কখনও একা পাবার উপায় নেই। ভাব দেখে মনে হয়, প্রৌঢ় লোকগুলো তার ধারেকাছে কাউকে ঘেঁষতে দিতে চায় না। তাদের মধ্যে

ভূতের মত কালো এক লোক আছে, মুখ আর দাঁত যথাক্রমে হনুমান আর ড্রাকুলার মত। দেখলেই পিত্তি জ্বলে যায় রানার।

ডিনারের পর বিচিত্রানুষ্ঠানে না ফিরে খোলা ডেকে বেরিয়ে এল ও, পরিষ্কার আকাশে তারার মেলা বসেছে, বাতাসে সমুদ্রের লোনা গন্ধ। যে-জন্যে নির্জনতার খোঁজ করা, সেটা নাগালের বাইরেই থেকে গেল, আগের মতই টান টান হয়ে থাকল রানার স্নায়ু। কারণ আর কিছুই নয়, ইন্দ্রিয়গুলো বিপদের আশঙ্কা করছে। জাহাজ বোম্বে ছাড়ার সময় থেকেই তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে ওর ওপর। কথাটা ওকে বলার পর আন্দাজ করে নিয়েছে তা নয়, শত্রুপক্ষের অস্তিত্ব আর দৃষ্টি অনুভব করতে পারছে ও।

তামার মাথা থেকে রাতেই মাইক্রোফিল্মটা বের করা দরকার; তারমানে আজই, কারণ এটাই জাহাজে ওদের শেষ রাত। ট্যুরিস্টদের জাফনায় নামিয়ে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে চলে যাবে রাজহংস। বিচিত্রানুষ্ঠান শেষে সবাই যখন যার যার কেবিনে ঘুমিয়ে পড়বে, জিনিসটা বের করার জন্যে সেটাই আদর্শ সময়। কিন্তু তার আগে ওকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে কারা ওর ওপর নজর রাখছে।

নিজেকে হালকা টোপ হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা ভাবল রানা। ডেকের পুরোটা দৈর্ঘ্য হেঁটে এল ধীর পায়ে, স্টার্নের শেষ মাথা পর্যন্ত। এদিকে এঞ্জিনের আওয়াজ বেশি, লোকজন কম। গায়ে কোট বা চাদর জড়িয়ে ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে দু'একজন। রানাও বসল, সাবধানে তাকাল চারদিকে। ওর ডান দিকে ট্যুরিস্টদের জন্যে বার, প্রায় খালিই বলা যায়। ওর পিছনে আরোহীরা জাহাজের একদিক থেকে আরেক দিকে আসা-যাওয়া করছে। বাম দিকে, রেলিঙের ওপর ঝুঁকে কয়েকটা ছায়ামূর্তি, তারা ও অন্যান্য জাহাজের আলোর খেলা দেখছে পিছনে ফেলে আসা পানিতে। কিন্তু সবাই নয়, অন্তত একজন তাকিয়ে রয়েছে রানার দিকে।

রানা অনুভব করল, লোকটা একা নয়, তার সাথে আরও কেউ আছে। শেষ কয়েক ঘণ্টা ওর ওপর নজর রাখার জন্যে একাধিক চর থাকার কথা, ওর প্রতিটি নড়াচড়া খুঁটিয়ে লক্ষ করতে চাইবে তারা—কখন চেয়ারের হাতল স্পর্শ করে ও, কখন একটা দিয়াশলাই তুলে নেয়, কারও সাথে করমর্দন করে কিনা। তারা জানে, এ-ধরনের কোন মুহূর্তেই রানার কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে মাইক্রোফিল্মটা।

কয়েকজনের মধ্যে একজন তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কে সে বুঝতে পারছে না রানা, ওদিকটা বড় বেশি অন্ধকার।

সাড়ে ন'টার দিকে উঠল রানা, পোর্ট সাইডের পুরোটা দৈর্ঘ্য হেঁটে এল। ফার্স্ট ক্লাস বার-এর পাশ ঘেঁষে এগোচ্ছে, স্বপ্নকন্যার ওপর চোখ পড়ে গেল। সুবেশী প্রৌঢ়দের দলটা এখনও তাকে ঘেরাও করে রেখেছে। তাদের একজনকে বলতে শুনল রানা, 'যখন স্বীকার করেছি অভ্যেস আছে, খেতে আমার কোন আপত্তি নেই—আমার ধারণা পুরুষদের কারুরই কোন আপত্তি নেই, কিন্তু একজনকে বাদ দিয়ে অসম্ভব। যা করব সবাই একসাথে করব, তা না হলে করব না।'

'আপনার একতা বোধ প্রশংসার যোগ্য,' বলল মক্ষীরানী। 'কিন্তু মদ্যপানে

আমি অনভ্যস্ত না হলেও, সবার সাথে খেতে অভ্যস্ত নই। কাজেই আমাকে মাফ করতে হবে।'

লোকটার ওজন হবে কম করেও আড়াই মন, মাথায় চকচকে টাক, সেই টাকের ওপর দিয়ে তাকিয়ে মেয়েটার উদ্দেশে হাসল রানা। 'কি, বিচিত্র কিছু পরেননি যে?'

মুখভঙ্গিতে ক্লান্ত ভাব ফুটিয়ে তুলে মেয়েটা বলল, 'শক্তি ফুরিয়ে গেছে।'

'দু'এক ঢোক হুইস্কি আবার আপনাকে চাঙা করে তুলতে পারে।'

মাথা নাড়তে শুরু করেও কি মনে করে নাড়ল না মেয়েটা। এই প্রথম তার মধ্যে ইতস্তত একটা ভাব দেখল রানা।

'কিংবা তাজা মুক্ত বাতাসেও কাজ হতে পারে,' পরামর্শ দিল ও।

মেঘ কেটে গিয়ে হঠাৎ যেন হেসে উঠল পূর্ণিমার চাঁদ, মুহূর্তের মধ্যে সেটা ধরা পড়ে গেল হনুমান বা ড্রাকুলার চোখে। কটমট করে রানার দিকে তাকাল সে।

তাকে অগ্রাহ্য করে প্রৌঢ়দের তৈরি পাঁচিলের বাইরে, কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসল রানা। 'আমাকে যদি দরকার হয়, আমি আছি।' একটা বিয়ার নিয়ে খেলো ও, সিগারেট ফুঁকল, তারপর কেবিনে ফিরে এল জ্যাকেট পরার জন্যে। আধঘন্টা পর একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, প্রায় মুখোমুখি ধাক্কা খেলো সুবর্ণা পোখরেলের সাথে।

দিল্লীর সেই ঘটনার পর পরস্পরের সাথে কথা বলেনি ওরা, এত কাছাকাছিও আসেনি। চশমা পরা এক অল্পবয়েসী যুবকের সাথে তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে রানা, অনর্গল বাক্য উদ্গীরণ করা ছেলেটার অত্যন্ত প্রিয় একটা স্বভাব।

'ওহ্! আপনি, মি. সিংহে!'

'কেমন আছ তুমি, সুবর্ণা?' সহজ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আ-আমি আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম!' ফিসফিস করে বলল সুবর্ণা পোখরেল। চট করে সিঁড়ির ওপর আর নিচেটা একবার দেখে নিল।

'কেন? কি ব্যাপার বলো তো?'

'আপনাকে আমি একটা কথা বলতে চাই।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলো না।'

'অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটেছে।'

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল রানা। দিল্লীতে ওর কামরা থেকে সুবর্ণাকে বেরুতে দেখেছে কেউ? মাইক্রোফিল্মের সাথে তাকে জড়িত বলে ভাবছে শত্রুপক্ষ?

'আমার কেবিন সার্চ করা হয়েছে।'

যতটুকু অবাক হলো তারচেয়ে বেশি ভান করল রানা। 'কি? কিন্তু কারা? চুরি গেছে কিছু?'

'না, সেটাই তো অদ্ভুত লাগছে।'

'কি করে বুঝলে তোমার কেবিন সার্চ করা হয়েছে?'

'বাহ্! সুটকেসের সমস্ত জিনিস-পত্র ঘেঁটে এলোমেলো করে রেখে গেছে, বুঝব না! বোম্বে ছাড়ার পর সন্ধ্যার দিকে প্রথমবার ধরতে পারি আমি। দুপুরে আমি যখন ডেকে ছিলাম তখনই কেউ...'

'তারমানে একবার নয়?'

'না। দ্বিতীয়বার পরদিন সকালে, সুইমিং-বাথে সাঁতার কাটতে যাবার পর। শ্যাম্পু নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, সেটা নিতে এসে দেখি কেবিনে একজন স্টুয়ার্ড রয়েছে। আগের রাতে যে কাপড়গুলো পরে ছিলাম, সব এলোমেলো হয়ে রয়েছে বিছানার ওপর।'

'তাকে তুমি চেনো?'

'না। আগে কখনও দেখিনি আমি।'

'সে কি সাদা জ্যাকেট পরে ছিল?'

'হ্যাঁ, আর সবার মত।'

'কিছু বলোনি তুমি?'

'আমি কিছু বলার আগে সে-ই বলল, মাফ করবেন, ম্যাডাম। বলে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে। হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম, কিছু করার কথা ভাবিনি। আমাকে যেটা অবাক করেছে, লোকটা সিংহলী ভাষায় কথা বলল। জানল কিভাবে ভাষাটা আমিও জানি?'

'তুমি জানো?'

'একটু একটু—মানে, শিখছি।' চোখ নামাল সুবর্ণা পোখরেল। 'আমার নতুন বন্ধুটিকে দেখেননি? শ্রীলংকার নামকরা ক্রিকেটার, জাতীয় দলে খেলে—ও-ই তো আমাকে শেখাচ্ছে।'

'বাংলাদেশী জাহাজে সিংহলী ভাষা জানা স্টুয়ার্ড, আশ্চর্যই বটে। তবে, এ হতেই পারে, তাই না?' সুবর্ণাকে শান্ত করার চেষ্টা করল রানা। 'লোকটা দেখতে কেমন? চেহারাটা মনে করতে পারো?'

'বিপদে ফেললেন। আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম কিনা, তাছাড়া এক নিমিষে চলে গেল, চেহারা ভুলে গেছি। তবে, খুব একটা লম্বা নয়। শ্যামলাই হবে। চুলগুলো…ভুলও হতে পারে আমার…একটু কি খাড়া খাড়া…!'

'ঘটনাটা কাউকে জানিয়েছ? পারসার বা তোমার মা-বাবাকে?'

'না, এখনও কাউকে বলিনি। বলা উচিত, তাই না?'

'তুমি যা ভাল মনে করো। কিছু যখন চুরি হয়নি…লোকটাকে পরে আর দেখোনি?'

'না।'

'আমার কি ধারণা, শুনবে? আর কিছু না, লোকটাকে স্রেফ কৌতূহল পেয়ে বসেছিল। সে বোধহয় এই প্রথম ভয়েজে বেরিয়েছে, হয়তো বিদেশী মেয়েরা কি পরে জানার খুব শখ…'

অবিশ্বাসে হাঁনাবড়া হয়ে উঠল সুবর্ণা পোখরেলের চোখ দুটো, পরমুহূর্তে লালচে আভা ফুটল তার মুখে। 'ছি! কি জঘন্য লোক রে বাবা!'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই,' একমত হলো রানা। 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। নিশ্চয়ই গুরুজনদের লুকিয়ে বিচিত্রানুষ্ঠান থেকে পালিয়ে এসেছ?'

সুবর্ণাকে পৌঁছে দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস বার-এ ফিরে এল রানা, কিন্তু সেখানে

স্বপ্নকন্যাকে না দেখে চলে এল পারসার অফিসের সামনে লম্বা হলের উল্টোদিকে, ঢুকল রেস্তোরাঁয়। 'কফি, প্লীজ!'

এক কি দু'বার চুমুক দিয়েছে কাপে, এই সময় এক মেয়ে এসে ঢুকল ভেতরে, পরনে স্টুয়ার্ডেস-এর ইউনিফর্ম, তবে কালো ভেলভেটের একটা মুখোশে মুখ আড়াল করা। কোন সন্দেহ নেই, রাজহংসের কোন মহিলা স্টাফের কাছ থেকে ইউনিফর্মটা ধার করা হয়েছে। ভ্রমণের আজকের এই শেষ রাতে অনেকেই অনেক অদ্ভুত পোশাক পরেছে। রানার সামনের চেয়ারটায় বসল সে, কফির অর্ডার দিল।

'চৌকিদাররা ঘুমোয় বলে তো শুনিনি!' বিস্ময় প্রকাশ করল রানা।

'আই বেগ ইওর পার্ডন!' পুরুষালি কণ্ঠস্বর নকল করার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে।

'তারা বোধহয় এখনও আপনাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু আমি আপনাকে ঠিকই চিনে ফেলেছি—মাথা উঁচু করে হাঁটার ভঙ্গি দেখে আর সেন্টের গন্ধ পেয়ে।'

হেসে উঠল স্বপ্নকন্যা। 'হতাশ হলাম! এত খাটাখাটনি সব জলে গেল।'

'একা এসেছেন সেজন্যে ধন্যবাদ।'

'আর আপনি আমাকে একা পাবার প্রত্যাশা করেছেন, সেজন্যে আপনাকেও ধন্যবাদ। আমিও চাইছিলাম...'

'কেন বলুন তো?' আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রানা। 'কেন চাইছিলেন? আগে আপনারটা শুনি, দেখা যাক একই কারণে দু'জনকে আমরা একা পেতে চাইছি কিনা।'

'জানি স্পষ্ট করে বললে আপনি অন্য কোন অর্থ করবেন না, তাই বলছি—আপনাকে আমার এত ভাল লেগে গেছে যে নিরিবিলিতে গল্প করার সুযোগ পেলে সত্যি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

মনের আনন্দ আর বিস্ময় চেপে রেখে মৃদু হাসল রানা। 'নিরিবিলি জায়গা পাওয়া খুব কি সহজ? যদি বা পাওয়া যায়, কেউ না কেউ দেখে ফেলবে।'

'কেন, আপনি যদি আমার কেবিনে যান? কিংবা আমি যদি আপনার কেবিনে?'

'নিন্দা বা কলঙ্কের ভয় নেই আপনার?' মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা। 'সমাজকে ভয় পান না?'

'কে কি বলল, ও-সব আমি গায়ে মাখি না। যার সাথে চারদেয়ালের ভেতর বা নির্জন কোথাও সময়টা কাটাব সে যদি রুচিবান ভদ্রলোক হয়, কিছু হারাবার নেই আমার। আমিও তো সমাজের একটা অংশ, অভূতপূর্ব কিছু একটা করে আমি যদি কোন নির্মল দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারি, সমাজ সেটাকে অনুমোদন দিয়ে রীতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না?' অধীর আগ্রহে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল মেয়েটা। 'অন্তত পারা উচিত নয়?'

'উচিত,' সমর্থন করল রানা। 'বলবেন কি, কি দেখলেন আমার মধ্যে যে এত ভাল লেগে গেল? আমার সম্পর্কে আপনি তো প্রায় কিছুই জানেন না।'

'সত্যি জানি না, এমনকি আপনার নামটা পর্যন্ত না। আর, ভাল লাগল কেন?' একটু হাসল মেয়েটা। 'কোন জিনিস বা কাউকে কেন মানুষের ভাল লাগে? এর কি কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারে? আপনি সুন্দর, সেটা একটা কারণ হতে

পারে। সুন্দর অর্থে আমি আপনার শারীরিক সৌন্দর্যের কথা বলছি না–বলছি আপনার পোজ, হাঁটাচলা, অঙ্গভঙ্গি, কথা বলার আর তাকানোর ধরন, শব্দ নির্বাচন, সমস্ত কিছুর কথা। এ-সবের সাথে ছোটখাট আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন, আপনাকে নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে। কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে আছেন। তাছাড়া, পাঁচ-সাত বছরে এক আধবার হঠাৎ কাউকে দেখলে মনে হয় না, এই লোকের সাথে আমার মিল আছে? অথচ মিলটা খুঁজতে যাওয়া বোকামি। মনে হয়, এই লোক আমাকে বুঝবে। আপনাকে দেখে ঠিক তাই মনে হয়েছে আমার।'

'তারমানে আপনি শ্রোতা হিসেবে পেতে চান আমাকে।'

'বলতে চাই, শুনতেও চাই–আমি আসলে আপনাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাই। হোক না মাত্র একদিনের জন্যে, শুধু একরাতের জন্যে, পরস্পরের মুখোমুখি বসে রাতটা কোথাও আমরা কাটিয়ে দিতে পারি না, শুধু গল্প করে? আর হয়তো জীবনে কখনও আপনার সাথে আমার দেখা হবে না, কিন্তু স্মৃতিটুকু তো থাকবে? মাঝে মধ্যে আপনার কথা মনে পড়ে যাবে আমার, জানব, দুনিয়ায় একজন অন্তত আছে যাকে আমি আমার সব কথা বলতে পেরেছিলাম, যে আমাকে বুঝতে চেষ্টা করেছিল···হয় না, এমন হতে পারে না?' উত্তেজনায় রানার কব্জি চেপে ধরল মেয়েটা।

'তাহলে বলি, ঠিক এই কথাগুলোই আপনাকে আমি বলতে চেয়েছি, কিন্তু সুযোগের অভাবে বলা হয়নি। ভাল কথা, আমি অরবিন্দ সিংহে–সিংহলী ব্যবসায়ী।'

'আমি কাহার।'

'শুধু কাহার?'

'জেসমিন কাহার।'

এক সেকেন্ড পর রানা বলল, 'জেসমিন নামে আমার কোন বন্ধু নেই।'

'এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ!'

হেসে উঠল রানা। 'দুঃখিত।' তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'আপনার কেবিনে,' বলল জেসমিন। 'কিংবা আমারটায়। যেখানে খুশি।'

করিডরে অনেক না হলেও, মাঝে মধ্যেই দু'চারজন লোককে দেখা গেল। এদের মধ্যে কারা ওর ওপর নজর রাখছে?

বাঁক নিয়ে একটা নির্জন করিডরে চলে এল ওরা, একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে জেসমিন বলল, 'এটা আমার।'

হাতব্যাগ থেকে চাবি বের করে তালা খুলল সে। চারদিকে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে জেসমিনের পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল রানা। আশা করা যায়, কেউ ওদেরকে ঢুকতে দেখেনি।

'আরাম করে বসুন–কারণ ধরে যখন আনতে পেরেছি, সহজে আপনাকে আমি ছাড়ছি না।' ভেলভেটের মুখোশ খুলে একটা চেয়ারের দিকে ছুঁড়ে দিল জেসমিন। 'বুকে বালিশ দিয়ে ইচ্ছে করলে বিছানাতেও কাত হতে পারেন, তবে আমার দিকে মুখ করে।' স্টুয়ার্ডেস-এর ইউনিফর্মটা খুলে ফেলল, ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল কালো সালোয়ার কামিজ। 'গুছিয়ে বসার আগে বলুন দেখি, কি খাবেন?'

'কি আর খাব!' কৃত্রিম অভিযোগের সুর রানার কণ্ঠে। 'বলেই তো দিয়েছেন, অনভ্যাস না থাকলেও, সবার সাথে খেতে আপনি অভ্যস্ত নন।'

'কথাটা সত্যি। আপনি ছাড়া, আরও একজন বন্ধু আছে আমার, আজ পর্যন্ত শুধু তার সাথেই দু'এক চুমুক খেয়েছি। আপনার সাথে খাব কিনা···দুঃখিত, ঠিক এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তাই বলে এ-কথা ভাববেন না, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না বা অন্য কিছু। একজন মানুষের যত রকম অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, এমনকি মানুষ খুন পর্যন্ত, তা-ও আমার আছে।'

'কি বললেন!' বিছানায় বসতে গিয়েও বসল না রানা।

'দূরদর্শনের নিয়মিত দর্শকরা ব্যাপারটা জানে। দিল্লীতে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। আত্মরক্ষার জন্যে লোকটাকে খুন না করে আমার কিছু করার ছিল না।'

'রেপ, তাই না?' বিছানার কিনারায় বসল রানা।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল জেসমিন। তারপর বলল, 'জানেন, দেখে হয়তো মনে হয়নি, কিন্তু কথাটা সত্যি–প্রতিটি কাজের মুহূর্তেও চারপাশে শুধু আপনাকে খুঁজেছি আমি।'

'তারমানে আপনি একটা স্পাই।'

হেসে উঠল জেসমিন। 'প্রায় ঠিক ধরেছেন। জাতীয় একটা সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিভা খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। রাজহংসে আমারদেরকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো, সার্ক দেশগুলোর কোন প্রতিভা যদি খুঁজে পাই, বৃত্তি নিয়ে ভারতে দু'বছর কাটানোর প্রস্তাব দেয়া।'

'পেয়েছেন দু'একটা?'

'তিনজনকে বাছাই করেছি আমরা, পেয়েছি অনেক,' বলল জেসমিন। 'শুনে আশ্চর্য হবেন, তিনজনই তারা বাংলাদেশী। নাচ, অভিনয় আর উচ্চাঙ্গ সংগীত–তিনটে প্রতিভা।' ফ্রিজ থেকে কোকাকোলা আর স্ট্র বের করল সে।

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার ইচ্ছেটা দমিয়ে রাখতে হলো রানাকে। ছোট্ট করে বলল, 'আচ্ছা।'

'বলুন তো, ওদের সাথে আমাকে দেখে কি মনে হয়েছে আপনার?' রানার হাতে একটা কোকাকোলা ধরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল জেসমিন, বিছানার দিকে মুখ করে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসল।

'মনে হয়েছে, আপনি স্বামী শিকারে বেরিয়েছেন,' কৌতুক করল রানা। 'স্বাধীনচেতা মেয়েরা নাকি বয়স্ক স্বামী পছন্দ করে।'

খিল খিল করে হেসে উঠল জেসমিন। তারপর বলল, 'এক সময় ওঁরা সবাই আমার স্যার ছিলেন ভার্সিটিতে। এখন ওঁদের সাথে আমিও পড়াই। কাউকে স্যার বলি না, সবাইকে সহকর্মী বলে মনে করি। না, অরবিন্দ, আমি স্বামী খুঁজছি না।'

'কেন, বিয়ে করার ইচ্ছে নেই নাকি?'

একটু চিন্তা করে জবাব দিল জেসমিন, 'কিছু কিছু ব্যাপার থাকে, বন্ধুত্বের খাতিরে উহ্য রাখতে হয়। বিয়ে প্রসঙ্গে কোন কথা যদি না বলতে চাই, আপনি কিছু মনে করবেন না, প্লীজ।'

একটা অপরাধবোধ রানাকেও পীড়ন করছে। 'আমারও কিছু ব্যাপার আছে, যা কাউকে বলা যায় না। সে-ও ওই বন্ধুত্বের খাতিরে। গোপন করার কিছু আছে, কথাটা বলে হালকা হতে চাইছি, বুঝতে পারছেন তো?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল জেসমিন।

'বললেন, আরেকজন বন্ধু আছে। যদি জিজ্ঞেস করি···'

হঠাৎ ঝুঁকে রানার মুখে হাতচাপা দিল জেসমিন। 'তার কথাও থাক।'

জেসমিনের হাতটা ধরে মৃদু চাপ দিল রানা। 'আমি কিছু মনে করছি না।'

'আগে আমি শুরু করি, কেমন? বিশ্বাস করবেন, আমি এতিমখানায় মানুষ হয়েছি···?'

না, নীরস বিবৃতি বা করুণ জীবনকাহিনী নয়। নিজের জীবনের টুকরো টুকরো কিছু ঘটনার বর্ণনা দিল জেসমিন, সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল জ্ঞানতাপসী ও কোমলহৃদয়া এক মানব হিতৈষিণী, কৈশোরেই যার বোধোদয় ঘটে যে প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরতুল্য, তার সেবা করার মধ্যেই জীবনের পরম সার্থকতা নিহিত, সেই সাথে এই উপলব্ধিও হয় যে অবহেলিত বা নির্যাতিত মানুষকে সুখী করতে হলে প্রথমে তার নিজেকে সুখী হতে হবে। অল্পে সন্তুষ্ট হলেও, জীবনের কাছ থেকে পেয়েছে সে অঢেল, সেটাই নাকি তার ঠোঁটে লেগে থাকা সার্বক্ষণিক হাসিটির গোপন রহস্য।

এক সময় রানা মন্তব্য করল, 'জ্ঞান আর মানবসেবা, এই দুটো জিনিসের সাথে সুখ বা হাসি আগে কখনও এক হতে দেখিনি। আপনি একটা ব্যতিক্রম।'

এরপর রানার পালা। ইতোমধ্যে একবার কফি বানিয়েছে জেসমিন, রানাকে সিগারেট ধরাবার অনুমতি দিয়েছে। বিছানাতেই বসেছে রানা, কাত হয়ে আছে বগলের নিচে বালিশ দিয়ে। ওর কথা হলো, জীবনকে প্রচণ্ড ভালবাসে ও। সাধ্য সীমিত হলেও দুনিয়াটাকে বাসযোগ্য দেখার সাধ থাকায়, বাস্তবতা আর কল্পনার সাথে গুরুতর অমিল লক্ষ করে মাঝে মধ্যে ভয়ানক খেপে যায়। স্বীকার করল, ভোগী পুরুষ সে, তবে সামান্য একটা ফুলকে বাঁচানোর জন্যে যুদ্ধ করার দৃষ্টান্তও তার দ্বারা স্থাপিত হয়েছে।

কথাগুলো এমনভাবে বলা হলো, আত্মগরিমার কোন গন্ধ তাতে থাকল না। দেখা গেল দু'জনেই ওরা কয়েকটা বিষয়ে একমত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের আবির্ভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, মানুষ অমৃতের সন্তান, তার কোন পাপ নেই; সুখী হতে চাওয়ার মধ্যে নেই কোন স্বার্থপরতা, নারী দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলে পুরুষশাসিত সমাজ তাতে উপকৃত হবে, অনন্ত সম্ভাবনাময় মানবসভ্যতার কল্যাণে প্রতিটি ব্যক্তিরই অবদান রাখার দায়িত্ব রয়েছে।

জেসমিন দ্বিতীয়বার কফি বানিয়ে আনার পর কাপে চুমুক দিয়ে প্রায় আঁতকে উঠল রানা।

'কি হলো? কফিতে বিষ মিশিয়ে দিইনি তো?'

'সেরকম ইচ্ছে কি জেগেছে মনে?'

'অনেক দামী দামী কথা বললাম, কিন্তু তারপরও অপরাধ প্রবণতা থেকে মুক্ত

হতে পারি কই!' খেদ প্রকাশ পেল জেসমিনের বলার সুরে। 'অত্যন্ত ভাল লেগে যায় এমন কোন জিনিস, জানি পাব না, তবু পেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে জোর করে পাই, ছিনিয়ে নিই; তাও যদি না পারি, তখন সেটাকে ধ্বংস করে দেয়ার একটা তাড়না অনুভব করি। এই প্রবণতাটা প্রচণ্ডভাবে অনুভব করি বলে নিজেকে নিয়ে আমার ভারি ভয়।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। তারপর অন্য প্রসঙ্গে ফিরে গেল রানা, 'আঁতকে উঠলাম; কারণ ভোর হয়ে এসেছে।' আবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল ও। 'এবার তো যেতে হয়।'

কেউ ওরা অনেকক্ষণ আর কোন কথা বলল না, ঠাণ্ডা হয়ে গেল কফি। রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল জেসমিন। বিছানার ওপর সিধে হয়ে বসল রানা, দু'জন একসাথে উঠে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ, যেতে তো তোমাকে দিতেই হবে। আরেকটু থাকা যায় না?' অপলক চোখে তাকাল জেসমিন।

'আমি চাই না কেউ দেখুক তোমার কেবিন থেকে বেরুচ্ছি। এরপর সবার ঘুম ভাঙবে, এখনই সময়।'

রানার একটা হাত ধরল জেসমিন। 'আর কি আমাদের দেখা হতে পারে না?'

'হতে হয়তো পারে, কিন্তু দেখা হওয়াটা কি উচিত হবে?'

'ভাবছ, আমি দুর্বল হয়ে পড়ব?' নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল জেসমিন। 'যদি হইও, নিজেকে আমি সামলে রাখতে জানি, অরবিদ। ভয় নেই, আমি তোমাকে গ্রাস করতে চাইব না। কারণ, তোমাকে তো বলেইছি, আরও একজন বন্ধু আছে আমার—তার কাছ থেকে আমি অঢেল পাই।'

'তুমি না বলেছিলে, স্বামী আর সেই বন্ধুর কথা আলোচনা করতে চাও না?'

'বলেছিলাম। তখন এতটা চেনা হয়নি তোমাকে। এখন বুঝতে পারছি, তোমাকে চিনতে ভুল করিনি আমি। সব কথা তোমাকে বলা যায়, তুমি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়বে সে ভয় না করেই।'

আবার হাতঘড়ি দেখল রানা।

অস্থির হয়ে উঠে জেসমিন বলল, 'আরেকটু থাকো, প্লীজ। আবার কবে দেখা হয়, কিংবা হয় কিনা। অরবিদ, তুমি জানো, তোমার চোখ দুটোয় অসম্ভব মায়া? ওই চোখে কি যেন একটা আশ্চর্য স্বপ্ন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি।' ফিসফিস করে কথা বলছে সে, 'দেখো, আমি কত শক্ত মেয়ে—তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না, কত রকম লোভ জাগছে অপরাধ করার, কিন্তু জানি নিজেকে আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সামলে রাখতে পারব।'

'নিজের সম্পর্কে অতটা জোর দিয়ে কথাটা বলতে পারলে খুশি হতাম,' ক্ষীণ হেসে বলল রানা। 'আমাকে ভুল বুঝো না, জেসমিন—আমি দেবতা নই।'

'এমন অকপটে স্বীকার করায় আমার কাছে আরও লোভনীয় হয়ে উঠছ তুমি,' বিড়বিড় করে বলল জেসমিন, হঠাৎ হাত তুলে রানার চিবুক স্পর্শ করল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল রানার দিকে পিছন ফিরে। 'যাও, বন্ধু। বিদায়। শেষ একটা কথা—আমি বিবাহিতা। আমার স্বামীই আমার সেই বন্ধু। বঞ্চনার কোন অনুভূতি যদি তোমার

ভেতর থেকে থাকে, আশা করি এ-কথা জানার পর আমাকে তুমি ক্ষমা করবে।'

'কোথায় সে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তোমাকে একা ছেড়ে দিয়ে হতভাগাটা গেছে কোথায়?'

হেসে ফেলল জেসমিন, রানার দিকে ফিরল। 'সে আমার ছাত্র, বয়েসে বছর তিনেকের ছোট, পরীক্ষা চলছে বলে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। দু'জনে আমরা অত্যন্ত সুখী, অরবিদ।'

'আমার একটা মেসেজ আছে, পৌঁছে দেবে তাকে?'

সকৌতুকে জানতে চাইল জেসমিন। 'কি মেসেজ?'

'তুমি যাকে ভালবাস, তার কোন ক্ষতি করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, কাজেই আমার তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ সে। আসি,' বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, দীর্ঘ পায়ে দরজার সামনে চলে এল, কবাট খুলে উঁকি দিল করিডরে।

করিডর ফাঁকা দেখে কেবিন থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল রানা, আস্তে করে বন্ধ করে দিল পিছনের দরজা। পা বাড়াতে যাবে, চাপা কান্নার অস্পষ্ট আওয়াজ পেল ও। ইচ্ছে হলো আবার ফিরে যায়, কিছু একটা বলে সান্ত্বনা দেয়, পরমুহূর্তে ভাবল জেসমিনের এটা ব্যক্তিগত কান্না, ওর নাক গলানো উচিত হবে না। সব জিনিসেরই দাম দিতে হয় মানুষকে—ওকে জেসমিনের অতিরিক্ত ভাল লেগে গেছে, এই মুহূর্তে তারই মাসুল দিতে হচ্ছে তাকে। এখানে ওর কিছু করার নেই।

চারটে বেজে দশ মিনিট, করিডর থেকে ডেকে বেরিয়ে এল রানা। আকাশে কোন তারা নেই, সব ঢাকা পড়েছে মেঘে। জাহাজের বেশিরভাগ আলো নিভে গেছে, পথ চিনে সাবধানে এগোতে হলো ওকে। ইস্পাতের বেঢপ আকার আকৃতিতে বাধা পেয়ে সামুদ্রিক বাতাস করুণ বিলাপের সুরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরে স্টার্নের দিকে হাঁটছে রানা। শীত শীত করছে, মনটা বিষণ্ন।

করিডর ধরে নিজের কেবিনে ফিরতে পারত ও, তামার আবক্ষ মূর্তি সহ হলটা ওর পথেই পড়ত, কিন্তু মাথায় একটা প্ল্যান থাকায় খোলা ডেকে বেরিয়ে এসেছে ও। তামার মাথাটা থেকে মাইক্রোফিল্ম উদ্ধার করার আগে অদৃশ্য প্রহরীদের একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

ধীর পায়ে হাঁটছে ও, প্রতিটি ইন্দ্রিয় সজাগ। একটু পরই, বাতাস আর জাহাজের নানা ধরনের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ ছাপিয়ে, অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেল ও—যেন ইস্পাতের সাথে কারও জুতো ঘষা খেলো। ওই একটা শব্দই যথেষ্ট, রানা টের পেয়ে গেল ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে। রাত সাড়ে দশটা থেকে ওর অপেক্ষায় করিডরে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল লোকগুলো, ভাবতে ভালই লাগল ওর।

বার কয়েক ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, ফেউদের বুঝতে দিল গোপন কিছু করার মতলব আছে ওর। সেটা কি হতে পারে, বুঝে নেয়ার দায়িত্ব ছেড়ে দিল তাদের কল্পনাশক্তির ওপর।

ফার্স্ট ক্লাস কেবিনগুলোর সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, আরোহীদের হাঁটা-চলা করার জন্যে। জায়গাটার শেষ মাথায় পৌঁছে অকস্মাৎ ডান দিকে বাঁক নিল রানা,

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল সানডেকে। জোরাল বাতাস বইছে, এঞ্জিনের আওয়াজও এদিকে খুব বেশি। কেউ কোথাও নেই, কাউকে দেখতে পাবে বলে আশাও করেনি ও। প্রথম চিমনিটার ডান দিক দিয়ে এগোল, সামনে শাফল-বোর্ড খেলার দাঁড় আকৃতির একটা সরঞ্জাম দেখল, ডেকের ওপর পড়ে আছে। ইচ্ছে করেই সেটার গায়ে কষে লাথি মারল রানা, সশব্দে ঘষা খেয়ে ছুটল জিনিসটা, ধাক্কা খেলো ইমার্জেন্সী ভেলার গায়ে। পথ ভুলে ওকে যদি হারিয়ে ফেলে থাকে শত্রু, শব্দটা তাদেরকে এদিকে টেনে আনবে।

দ্বিতীয় চিমনির গোড়ায় পৌঁছুল রানা। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বাতিল তার, ভাঙা ভেন্টিলেটর, কাঠের পরিত্যক্ত বাক্স ইত্যাদি। কিছু তার লোহার আঙটার সাথে সংযুক্ত, আঙটাগুলো অগভীর গর্ত থেকে বেরিয়ে আছে। একটা গর্তের ভেতর হাত গলিয়ে দিয়ে ভান করল, কি যেন খুঁজছে।

খানিক পর সিধে হলো রানা, ফিরতি পথ ধরে হাঁটা ধরল। চিমনি ছাড়িয়ে আসার পর সামনে একটা ছোট্ট র‍্যাম্প রয়েছে, সেটা বেয়ে অর্ধেকটা উঠেছে ও, এই সময় কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল পিছন থেকে।

'হ্যান্ডস আপ! খবরদার, এক চুল নড়বে না!'

ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুলে নির্দেশ পালন করল রানা। প্ল্যানটা দারুণ কাজ দিয়েছে। শত্রুপক্ষের ধারণা, 'জিনিস'টা এই মুহূর্তে ওর সাথেই আছে।

'ঘোরো। সাবধানে, ধীরে ধীরে।'

ঘুরল রানা। প্রায় অন্ধকারে প্রথম মনে হলো, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। তারপর ভুল ভাঙল রানার—একজনই সে, তবে অস্বাভাবিক চওড়া। লোকটার মাথায় হ্যাট, ভুরু পর্যন্ত নামানো, ফলে মুখটা দেখা গেল না। ইংরেজি বলছে সে, তবে উচ্চারণে হিব্রু টান স্পষ্ট।

'কই হে, এদিকে চলে এসো!' সঙ্গীকে ডাকল লোকটা।

রানার মনে হলো, অপর লোকটা ওর পিছন দিক থেকে আসছে। সন্দেহ নেই, চিমনির আরেক পাশ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে সে, পিছন দিক থেকে এসে ওর মাথায় বাড়ি মারার ইচ্ছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ, আরও এক কি দেড় সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা, তারপর দ্রুত পাশে সরল এক পা, বাঁ পায়ে ভর দিয়ে ঘুরতে শুরু করল। ওপরে তোলা একটা হাত দেখতে পেল, হাতের নিচে শরীরটা লক্ষ্য করে সবেগে চালাল ডান পা, জুতোর ডগায় পেয়ে গেল লোকটার হাঁটুর হাড়। 'মর গিয়া!' বলে ককিয়ে উঠল সে, কোমরের কাছ থেকে দু'ভাঁজ হয়ে গেল শরীরটা। তার পেতে দেয়া ঘাড়ের পিছনে রানার একটা কনুই হাতুড়ির বাড়ি মারল। দু'নম্বর ঝামেলা আপাতত শেষ।

কিন্তু এক্সপ্রেস ট্রেনের গতি নিয়ে ছুটে এল প্রথম লোকটা। উল্টো করে ধরা পিস্তলের বাঁটটা ওর মাথা লক্ষ্য করে নামিয়ে আনল সে, একপাশে সরে গিয়ে কোন রকমে এড়াতে পারল রানা। সরার সময় লোহার একটা আঙটায় পা বেধে গেল। হোঁচট খেলো ও, ভারসাম্য ফিরে পাবার আগে মূল্যবান একটা সেকেন্ড নষ্ট হলো। তারপর রানা শুধু অনুভব করল, ওর খুলিটা যেন দু'ভাগ হয়ে গেল।

বোধবুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। এক সেকেন্ড পর পেটে একটা লাথি অনুভব করল ও। জ্ঞান হারাল।

বদ্ধ, গরম একটা জায়গায় জ্ঞান ফিরল রানার, সিগারেটের ধোঁয়া আর ভাপসা একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, সদ্যজাত শিশুর মত বিবস্ত্র। শুনতে পেল ওর ওপর দিক থেকে গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। বমির উদ্রেক হলো, মোচড় খেলো পেটের ভেতরটা। খানিক পর, ধীরে ধীরে বসল ও।

চওড়া একটা জায়গা, ক্রুদের বিশ্রামাগার বলে মনে হলো। বাংলায় লেখা কিছু নোটিশ টাঙানো রয়েছে দেয়ালে। দুটো বড় টেবিলের মাঝখানে রয়েছে রানা, টেবিলগুলো মেঝে বা ডেকের সাথে আটকানো। একটা টেবিলের ওপর নিজের কাপড়-চোপড় দেখতে পেল, এলোমেলো করা, বোঝাই যায় নিষ্ফল তল্লাশি চালাবার পর ফেলে রাখা হয়েছে ওখানে। হ্যাট পরা চওড়া লোকটা দ্বিতীয় টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে, তার পাশে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে দীর্ঘদেহী সঙ্গীটি, দু'জনেই তারা হিংস্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। যেন তাদের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরেই কুঁকড়ে গেল রানার শরীর, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ও।

'বল্ হারামজাদা, কোথায় রেখেছিস জিনিসটা?' দীর্ঘদেহী ঘুসি পাকাল, ঠাস করে মারল অপর হাতের তালুতে।

'কি-কি-কো-কোথায় রেখেছি?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'তো-তো-তোমরা শুধু শু-ধু কেন আমা-মা-কে…'

'সান-ডেকে যেটা আনতে গিয়েছিলি। কোথায় সেটা, তাড়াতাড়ি বল্।'

'ফে-লে দিয়েছি।' কাঁপা গলায় বলল রানা, বুদ্ধিটা হঠাৎ গজিয়েছে। 'ছুঁ-ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। তো-তো-তোমরা যখন ঝাঁপিয়ে পড়লে আম-আমা-মার ওপর। তখন ওটা আ-আ-মার হাতেই ছি-ছিল।'

সঙ্গীর দিকে তাকাল দীর্ঘদেহী। 'শালা অমম করছে কেন?'

'অস্বাভাবিক নয়,' কিক করে হেসে চওড়া লোকটা মন্তব্য করল। 'আতঙ্কগ্রস্ত।'

দাঁতে দাঁত চাপল দীর্ঘদেহী। 'কোথায় ফেলেছিস?'

'জা-জানি না। অন্ধকারে কোথায় পড়েছে কি-কি করে ব-বলব!'

'তারমানে ওপরের ডেকেই কোথাও আছে?'

'পা-পারে, থাকতে পা-পারে।'

'জিনিসটা কেমন দেখতে?'

'তোমরা জা-জানো না?' রানা বিস্মিত।

'জানি, জানি। কিন্তু কিসের ভেতরে আছে? কি ধরনের মোড়ক?'

'মোড়ক? ও…বুঝেছি…' তথ্যটা পাবার জন্যে এতই যখন আগ্রহ লোকটার, তাকে বিশ্বাস্য একটা মিথ্যে কথা বলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল রানা। 'ওটা একটা প্রজাপতির ভেতর আছে।'

'কিসের ভেতর?'

'প্রজাপতির ভেতর।'

'প্রজাপতি!'

'ওটা একটা অলঙ্কার,' বলল রানা, এখনও মাঝে মধ্যে ব্যথায় গোঙাচ্ছে ও, তবে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে বলে তোতলানো বন্ধ করেছে। 'মেয়েরা পরে। চুলে পরা যায়, ড্রেসেও লাগানো যায়। বোতাম আছে, ভেতরটা ফাঁপা।'

'আচ্ছা!' সবিস্ময়ে বলল দীর্ঘদেহী। 'তাহলে এভাবে লুকিয়ে রেখেছ!' হঠাৎ তীক্ষ্ণ হলো তার কণ্ঠ ও দৃষ্টি, রানার দিকে ঝুঁকল। 'বোকা বানাবার চেষ্টা করছ না তো? জানো নিশ্চয়, ওটা খুঁজে না পেলে আমরা বুঝব তুমি মিথ্যে কথা বলেছ?'

'মিথ্যে না বলে আমার উপায় কি?' লোকটাকে হতাশ করল রানা। 'সত্যি কথা বললে তোমরা বিশ্বাস করবে? যদি বলি, সান-ডেকে আমি কিছু খুঁজছিলাম না, তোমরা কি খুঁজছ সে-সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই, করবে বিশ্বাস? আমি শুধু বলতে পারি, এই যে বোকার মত আমাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করছ, এর জন্যে ভুগতে হবে তোমাদের।'

ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কি যেন আলাপ করল লোক দু'জন।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে রানার। প্রচুর সময় নিয়ে, ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে দাঁড়াল ও, টলমল করছে পা—সবটাই ভান।

ওকে দাঁড়াতে দেখে মারমুখো হয়ে তেড়ে এল দীর্ঘদেহী, হ্যাট পরা সঙ্গী বাধা দিল তাকে। 'ঠিক আছে। এক মিনিট। প্রথমে যে কথাটা বলেছে, সেটাই সত্যি হতে পারে। টর্চ নিয়ে ওপরের ডেকটা দেখে আসি আমি। ইতিমধ্যে ওকে কাপড় পরিয়ে স্টার্নের দিকে নিয়ে এসো তুমি। ওখানে যত খুশি চিৎকার করুক, কেউ শুনতে পাবে না।'

একটা কাবার্ড খুলে ভেতরটা হাতড়াল সে, হাতে টর্চ নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'তুমি একা থাকায়,' সঙ্গীকে বলল সে, 'ওর মাথায় কুবুদ্ধি গজাতে পারে। কোন রকম সুযোগ দেবে না।' বেরিয়ে গেল সে, বাইরে থেকে ঠেলে দিল দরজা।

'কাপড় পরো,' নির্দেশ দিল লম্বা লোকটা। 'ইচ্ছে করলে হঠাৎ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো, পেটে যদি গুলি খাবার সাধ জাগে।'

কাঁপা কাঁপা হাতে কাপড়গুলো তুলে নিয়ে পরতে শুরু করল রানা। মাথা আর পেট দুটোই এখনও ব্যথা করছে, তবে শরীরের আর সব পেশীতে কোন রকম জড়তা নেই। এক কাপড় পরা শেষ হতে দরজা খুলল লোকটা।

'বেরোও। বেরিয়ে ডান দিকে ঘোরো, তাড়াহুড়ো করবে না। তোমার পেছনে থাকব আমি, নিরাপদ দূরত্বে, আবার এত দূরে নয় যে মাথায় লাগাতে চাইলে ঘাড়ে লাগবে গুলি।'

'তাড়াহুড়ো, হুহ্!' প্রায় অভিমানের সুরে অভিযোগ করল রানা, আরেকবার গোঙাল। 'আমি বলে নড়তেই পারছি না।'

করিডরটা জাহাজের এমন একটা অংশে যেটা শুধু ক্রুরা ব্যবহার করে। ঘষে-মেজে সব কিছু ঝকঝকে করে রাখার প্রয়োজন হয়নি, এখানে সেখানে রঙ চটে গেছে। বেকারি আর প্রিন্টিং-প্রেস ছাড়িয়ে এল ওরা, ভোর রাতে দুটোই খালি। কাছাকাছি থেকে শুধু এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে আসছে। করিডরের শেষ মাথায়

একটা ওয়াটারটাইট দরজা। লোকটার নির্দেশে সেটা খুলতে হলো রানাকে, ভেতরে ঢুকে কয়েক পা এগিয়ে থামতে হলো। ওর পিছনে ভারী ইস্পাতের দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল প্রতিপক্ষ।

জাহাজের পিছন দিকে, নিচু আর অর্ধবৃত্ত আকারের একটা ঘেরা জায়গার ভেতর রয়েছে ওরা। হুক লাগানো চেইন, রশি আর তারের কুণ্ডলী, বিচিত্র আকৃতির মেশিন আর কপিকল, প্রায় ঢেকে ফেলেছে ডেকের ওপরটা। স্টার্ন প্যারাপেটের ওপর রশি আর লোহার চেইন ঢোকানোর জন্যে অসংখ্য গর্ত দেখল রানা, পুলি রয়েছে অনেকগুলো, অ্যাংকর চেইন টানার জন্যে—সেগুলোর ফাঁক-ফোকর দিয়ে জাহাজের পিছনে আলোড়িত পানির গায়ে চাঁদের আলো দেখতে পেল ও, পারদের মত ঝলমল করছে। বিরতিহীন আওয়াজে কান পাতা দায়। 'ওখানে যত খুশি চিৎকার করুক, কেউ শুনতে পাবে না,' কথাটা মনে পড়ে গেল রানার।

এবার একটা সুযোগ খুঁজে নিতে হবে ওকে, শুধু পালানোর জন্যে নয়, সম্ভবত খুন হওয়া এড়াবার জন্যে। এ-ব্যাপারে লোকগুলোর ওপর অবশ্যই নির্দিষ্ট নির্দেশ আছে, সেটা খুন না করার কঠিন নির্দেশ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, অন্তত যতক্ষণ না তারা মাইক্রোফিল্মটা উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু নির্দেশ যাই থাক, সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে লোকগুলোকে আরও অনেক কিছু প্রভাবিত করতে পারে। জাফনার কাছাকাছি ফিরে এসেছে রাজহংস, একজন আরোহী নিখোঁজ হলে কারও চোখে সেটা না-ও ধরা পড়তে পারে। লোকগুলো প্রচণ্ড রেগে আছে ওর ওপর, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেও জিনিসটা উদ্ধার করতে পারেনি তারা। তাছাড়া, রানারও সময় কম, মাইক্রোফিল্মটা তাড়াতাড়ি হাতে আনা দরকার।

রানাকে আরও দু'পা সামনে ঠেলে দিল লোকটা, একটা ইলেকট্রিক উইঞ্চের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হলো ওকে। ধীর পায়ে, ব্যথায় উহ্-আহ্ করতে করতে এগোল রানা, লোকটার পেশী সামান্য হলেও যাতে শিথিল হয়। তারপর উইঞ্চের খাঁচায় হেলান দিল ও, বুকে চিবুক ঠেকে আছে, হাত দুটো দু'পাশে নড়বড় করছে। রানার মাথায় একটাই চিন্তা—আর বেশি সময় নেই, যে-কোন মুহূর্তে অপর লোকটা ফিরে আসবে।

ঠিক করল, যা করার এখুনি। টলমল করছে পা, হঠাৎ মাথাটা উইঞ্চের খাঁচার সাথে ঠুকল। প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল খুলিটা। তারপর চিৎকার করে যা বলল তার সারমর্ম হলো, মারা যাচ্ছে সে, কারণ ওরা তার খুলি ফাটিয়ে দিয়েছে।

'কি?' এক পা সামনে বাড়ল দীর্ঘদেহী। পিস্তলের বাড়িটা সে মারেনি, কাজেই রানার আঘাত কতটা গুরুতর জানা নেই। পরমুহূর্তে হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রানার, নেতিয়ে পড়ল ডেকের ওপর, যেন হঠাৎ করে জ্ঞান হারিয়েছে।

আরও এক পা সামনে বাড়ল লোকটা। এক সেকেন্ড থেমে ঝুঁকল, তারপর আরও এক পা এগোল। রানার দিকে চোখ, পিস্তলটাও ওর দিকে তাক করা। ইতস্তত করছে সে, সন্দেহে জর্জরিত। 'বুঝেছি, অভিনয় করছে!' চিৎকার করল সে। কিন্তু রানা নড়ল না দেখে, আরও খানিক ইতস্তত করে সামনে বাড়ল।

লোকটা যেন সাপের ছোবল খেলো পায়ে। আঙুলগুলো ইস্পাতের মত শক্ত, পা ধরেই হ্যাঁচকা টান দিল রানা। ভারী বস্তার মত সশব্দে আছাড় খেলো লোকটা, পড়ার সময় ফাঁকা আওয়াজ করল পিস্তলটা। পরমুহূর্তে তার ক্যারটিড আরটারিতে হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারল রানা। একটা ঝাঁকি খেয়ে স্থির হয়ে গেল লোকটা।

পিস্তলটা হাতে নিয়ে দাঁড়াল রানা, সিধে হবার সময় উফ্ করে উঠল। উইঞ্চের খাঁচায় হেলান দিয়ে কয়েক সেকেন্ড হাঁপাল, মাথাটাকে সময় দিল পরিষ্কার হবার। পিস্তলের আওয়াজ নিয়ে উদ্বিগ্ন হলো না, প্রপেলারের শব্দের সাথে মিশে চাপা পড়ে গেছে। মাথাটা পরিষ্কার হবার পর ওয়াটারটাইট দরজার আড়ালে এসে লুকাল ও। দরজা বন্ধ, তবে তালা দেয়া নয়। ইচ্ছে করলে এখুনি বেরিয়ে যেতে পারে ও। তবে অপর লোকটা স্বাধীনভাবে জাহাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে যখন, তার সাথে ধাক্কা লেগে যাওয়ার আশঙ্কা কম নয়, কাজেই আগে তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

অপেক্ষার সময়টায় মন খুঁত খুঁত করতে লাগল রানার। লোকটাকে কি খুব জোরে মেরেছে সে? মারা যায়নি তো? তার সঙ্গীর ব্যবস্থা না করে, এখন আর তাকে পরীক্ষা করারও সুযোগ নেই। লোকটার আসার সময় হয়ে গেছে। ইতোমধ্যে ওদেরকে নিয়ে কি করবে ঠিক করে ফেলেছে ও। দুই অজ্ঞান শত্রুর মুখে কাপড় গুঁজে, হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে যাবে এখানে। তারপর ওদের ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। কপাল যদি রানার মন্দ হয়, এখান থেকে ওর সরে যাবার দশ মিনিটের মধ্যে ক্রুরা এসে দেখতে পাবে ওদেরকে, ইতোমধ্যে জ্ঞান ফিরে আসবে ওদের, মুক্ত হয়ে রানাকে পাকড়াও করার জন্যে ছুটবে। জোঁকের মত লেগে থাকবে পিছনে। আর যদি ওদের কপাল মন্দ হয়, জাফনায় পৌঁছে জাহাজ খালি হয়ে যাবার আগে ক্রুরা ওদেরকে দেখতে পাবে না।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ধীরে ধীরে খুলে গেল ভারী দরজা। দোরগোড়া পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল লোকটা। দু'পা এগিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে থমকে দাঁড়াল। 'কি হলো, কোথায় তোমরা?'

'এখানে,' বলল রানা, সেই সাথে লোকটার মাথার পিছনে সজোরে আঘাত করল উল্টো করা পিস্তল দিয়ে।

এক চুল নড়ল না লোকটা। যেমন দাঁড়িয়েছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল। গা ছম ছম করে উঠল রানার। ব্যাপার কি? তারপর লোকটা সটান পড়ে যাচ্ছে দেখে ধড়ে জান ফিরে এল ওর। ডেকে পড়ল সে, ঘ্যাঁচ করে বিশ্রী একটা আওয়াজ শুনে গা গুলিয়ে উঠল রানার।

আলো খুব কম, লোকটার হাত থেকে গড়িয়ে পড়া টর্চটা খুঁজল রানা। সেটা পেয়ে জ্বালল, পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখল সর্বনাশ হয়ে গেছে। বাংলাদেশী জাহাজ, ভারতীয় কোন নাগরিক এখানে খুন হলে শিপিং করপোরেশনকে ঝামেলায় পড়তে হবে। নানা প্রশ্ন তো উঠবেই, ক্ষতিপূরণও দিতে হতে পারে। তারপর রানা ভাবল, কিন্তু লোকটার হাতে ছোরা কেন? ছোরা সাথে থাকা সম্ভব, বিজনেস সিন্ডিকেটের লোক যখন, কিন্তু সেটা বের করে হাতে নেয়ার মানে কি?

তারমানে ওপরের ডেক থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরার সময় ওকে খুন করার সিদ্ধান্ত

নেয় সে। এক হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেলেও, অপর হাত থেকে ছোরাটা পড়তে একটু বেশি সময় নেয়। যেভাবেই হোক, ছোরাটা উল্টে গিয়েছিল, লোকটা সটান আছাড় খেয়েছে ওই খাড়া ছোরার ওপর। পালস্ দেখল রানা, জানে নেই। নিতান্তই দুর্ঘটনা, তবে একেবারে নিখুঁত—সরাসরি হার্টে, হাতলের কিনারা পর্যন্ত ঢুকে গেছে।

লাশটা জাহাজ থেকে পানিতে ফেলে দেয়া কোন সমস্যা নয়, ভাবল রানা। কিন্তু সমস্যাটা অন্য দিক থেকে জটিল হয়ে উঠেছে। জ্ঞান ফেরার পর দীর্ঘদেহী দেখবে জাহাজে সে একা, সঙ্গীটি গায়েব হয়ে গেছে। জাহাজ জাফনায় নোঙর ফেলার আগেই যদি তার জ্ঞান ফেরে, মহা হৈ-চৈ বাধিয়ে দেবে সে, চেষ্টা করবে রানাকে যাতে খুনের অপরাধে গ্রেফতার করা হয়। খানিক চিন্তা করে সম্ভাব্য ঝামেলা এড়াবার একটা বুদ্ধি বের করল রানা। অজ্ঞান লোকটাকে এখান থেকে সরিয়ে এমন কোথাও রাখতে হবে যেখানে সহজে কেউ আসা-যাওয়া করে না। তাকেও জাহাজ থেকে ফেলে দেয়ার কথা মনে উঁকি দিল, কিন্তু বিবেকের তরফ থেকে সায় পাওয়া গেল না। তা করলে অকারণ হত্যা করা হবে। লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেয়া উচিত নয়।

কিন্তু সকল সমস্যার সমাধান হয়ে আছে, রানা জানতে পারল একটু দেরিতে। দীর্ঘদেহীকে পরীক্ষা করতে গিয়ে তাজ্জব ও বোকা বনে গেল ও। দেখল, সে-ও জ্বালা জুড়িয়েছে। থমথমে চেহারা নিয়ে সিধে হলো রানা, নিজেকে তিরস্কারের সুরে বলল, ভবিষ্যতে আরও সতর্ক হওয়া উচিত তোমার।

দুটো লাশ, এক এক করে জাহাজের কিনারা থেকে পিছনের আলোড়িত পানিতে ফেলে দিয়ে এল রানা। ফেলে দিল পিস্তলটাও। ডেক থেকে রক্ত মোছার কাজ শেষ করে টর্চটা আগের জায়গায় রেখে দিল, ওয়াটারটাইট দরজাটা বন্ধ করল, ফিরে এল করিডরে। কারও সাথে দেখা হলো না, পারসার অফিসের পাশের হলে চলে এল ও। উঁচু বেদী থেকে তামার মূর্তিটা, শুধু মাথা, দু'হাতে ধরে তুলল ও, নিঃশব্দ পায়ে ঢুকল কাছাকাছি একটা টয়লেটে। দরজায় তালা লাগিয়ে কাজে হাত দিল রানা। ঢোকানোর সময় কোন সমস্যা হয়নি, বাঁ চোখ দিয়ে সহজেই গলে গিয়েছিল মাইক্রোফিল্মটা। মূর্তিটা নিচের দিকে নিরেট, উল্টো করে ধরে ঝাঁকাতে গিয়ে হাত দুটো ব্যথা হয়ে গেল রানার। মাইক্রোফিল্ম বেরুবে শুধু চোখ থেকে, ওগুলো ছাড়া আর কোন পথ নেই। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করার পরও লাভ হলো না, অগত্যা মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসল রানা, একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠির সাহায্যে খুঁচিয়ে চোখের কিনারায় নিয়ে এল জিনিসটাকে। তারপর আর কোন সমস্যা হলো না।

মূর্তিটা জায়গামত বসিয়ে নিজের কেবিনে ফিরে এল রানা। হরি শ্রেষ্ঠ আর শিব শ্রীবাস্তব, দু'জনেই অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ইতোমধ্যে ভোরের প্রথম আলো একটু একটু করে ঢুকতে শুরু করেছে পোর্টহোল দিয়ে। দ্রুত ও নিঃশব্দে কাপড় পাল্টাল ও, মাইক্রোফিল্মটা একটা মোজার ভেতর ভরে ঢুকিয়ে রাখল পা'জামার পকেটে। ঘুমন্ত সঙ্গীদের দিকে তাকাল আরেক বার। রাজহংসে সিঙ্গেল কেবিনের সংখ্যা কম, কিন্তু পুরুষ প্রার্থী বেশি হওয়ায় তাদেরকে বঞ্চিত করে শুধু মেয়েদেরকে বরাদ্দ করা

হয়েছে ওগুলো। অফিস থেকেও ওকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল, সুযোগ পেলেও সে যেন একটা কেবিনে একা না থাকে। পরামর্শ বা আয়োজন, কোনটাই পছন্দ হয়নি রানার, শুরু থেকেই অস্বস্তিবোধ করছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে নিরাপত্তার দিকটা চিন্তা করে খুশি হলো ও। কেবিনে দু'জন লোক থাকায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারা যাবে। দু'জন নিপাত হলেও, শত্রুপক্ষকে ছোট করে দেখছে না রানা।

একজোড়া সিটামল আর এক গ্লাস পানি খেয়ে নিজের বার্থে উঠল ও, শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

# চার

জাফনায় যথাসময়ে পৌঁছুল রাজহংস। রানা যদি মনোক্ষুণ্ন আর হতাশ হয়ে থাকে, ওকে দোষ দেয়া যায় না। স্বীকার করতে হবে, অভিযানটা তেমন ঝুঁকিবহুল তো নয়ই, এমনকি ঘটনাবহুলও ছিল না। রানা মনোক্ষুণ্ন এই জন্যে যে প্রায় তুচ্ছ একটা কাজে পাঠানো হয়েছে ওকে। আর হতাশ বোধ করছে বিজনেস সিন্ডিকেটের ক্ষমতার বহর উপলব্ধি করে। কথাতেই আছে, যত গর্জে তত বর্ষে না। শত্রুপক্ষ যদি ভয়ঙ্কর না হয়, প্রতিবার তারা যদি নতুন নতুন চমক নিয়ে উদয় না হয়, তাদের সাথে পাঞ্জা কষে মজা কোথায়।

তবে একটা কথা জানে রানা, এই অ্যাসাইনমেন্টের বৈশিষ্ট্য অন্যখানে। দেশের ভেতর থেকে টপ সিক্রেট কোন জিনিস যখন চুরি যায়, ধরে নিতে হয় চোরের সাথে সহযোগিতা করা হয়েছে। তারমানে এক বা একাধিক বেঈমানকে খুঁজে বের করতে হবে। চোরের পরিচয় জানা গেছে, মাইক্রোফিল্মটা স্টাডি করার পর জানা যাবে কি জিনিস চুরি গিয়েছিল, তারপরই শুরু হবে রানার আসল কাজ।

সুটকেস গুছিয়ে রেখে সাড়ে এগারোটাতেই লাঞ্চ সেরে ফেলেছে রানা, স্টারবোর্ডের ডেকে দাঁড়িয়ে দেখল নোঙর ফেলার পর দড়িদড়া দিয়ে বাঁধা হচ্ছে রাজহংসকে, পক্ষকাল আগে এই একই জেটি থেকে রওনা হয়েছিল জাহাজ।

সামনের বড় লাউঞ্জে হাজির হয়েছে পুলিস আর কাস্টমস অফিসাররা, আরোহীরা লাইনে দাঁড়িয়ে নিজেদের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিয়ে নিচ্ছে। রানার প্রস্তুতি ছিল, আরোহীদের প্রথম দলটার সাথে আনুষ্ঠানিকতার ঝামেলা সেরে ফেলতে পারল। ওর দিকে ভাল করে না তাকিয়ে ওর জাল পাসপোর্টে সীল মারল একজন ইন্সপেক্টর, হাতে গুঁজে দিল ডিজএমবারকেশন টিকেট। ডিক্লারেশন ফর্মে সীল মেরে সই করল কাস্টমস অফিসার। আমদানী নিষিদ্ধ বা ডিউটি দিতে হতে পারে এমন কোন জিনিস ওর সাথে নেই। কিন্তু কয়েকজন যুবকের আচরণ লক্ষ করে লজ্জায় অধোবদন হলো রানা। কইতেও পারে না, সইতেও পারে না, এই অবস্থা। এদেরকে দিল্লী আর বোম্বেতেও হ্যাংলামি করতে দেখেছে রানা। সস্তা মেয়েদের পিছু নিয়েছে, মদ খেয়ে রাস্তা-ঘাটে মাতলামি করেছে, হোটেলে জুয়ার আসর বসিয়েছে, আর এখন আমদানী

নিষিদ্ধ গাদা গাদা জিনিস-পত্র সাথে থাকা সত্ত্বেও দাবি করছে, তাদের সাথে কিছু নেই। চেকিং হবে আরেকটু সামনে, জানা কথা তখন ওরা চেকারদের ঘুষ দিয়ে পার পাবার চেষ্টা করবে। রানার খারাপ লাগার কারণ আর কিছুই নয়, যুবকরা সবাই বাংলাদেশী।

একজন পোর্টারকে দিয়ে কেবিন থেকে সুটকেস দুটো আনল রানা। কয়েক মিনিট পর গ্যাংওয়ের নিচে দাঁড়ানো পুলিসকে ডিজএমবারকেশন টিকেট ধরিয়ে দিয়ে নেমে এল জেটিতে। জেটির শেষ মাথায় কাস্টমস শেড, এরইমধ্যে ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে লোকজন। দু'জন পোর্টারকে দেখল রানা, কাস্টমস শেডে না ঢুকে পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল, তাদের পিছনে অলসভঙ্গিতে দু'জন লোক হাঁটছে। পিছন থেকে ঠিক চেনা গেল না, তবে চেনা চেনা লাগল। জাহাজে এরকম কত লোককেই তো দেখেছে, আলাপ না হলেও মুখচেনা। কোন সন্দেহ নেই, বাংলাদেশী।

কাস্টমস শেড থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চলে এল রানা, পোর্টার আগেই ওর জন্যে একটা ট্যাক্সি ঠিক করে রেখেছে। স্যালুট ঠুকে দরজা খুলে ধরল ড্রাইভার, ভেতরে ঢুকতে এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা। রাস্তার উল্টোদিকে চোখ পড়েছে ওর। কালো একটা প্রাইভেট কার, পুরানো মডেলের মাজদা। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন লোক। হার্টবিট বেড়ে গেল রানার। র, ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স! ওরা এখানে কি করছে?

গাড়ির ব্যাক সীটে উঠে বসল রানা। ইতোমধ্যে দেখে নিয়েছে দু'জনের একজনের হাতের তালুতে কি যেন লুকানো রয়েছে, রানা আর লুকানো জিনিসটার দিকে বারবার তাকাল লোকটা। সন্দেহ নেই রানার ফটো ওটা। রানার দেখাদেখি তারাও মাজদায় উঠে বসল।

'স্টেশনের কাছে,' ড্রাইভারকে বলল রানা, 'টয়োটা গ্যারেজে।' গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার। সীটের ওপর নড়েচড়ে বসল রানা, রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ, দেখল পিছু নিয়েছে মাজদা।

চিন্তার বিষয়। তারমানে রাজহংস থেকে দু'জনকে পানিতে ফেলে দিয়ে কোনই লাভ হয়নি। বিজনেস সিন্ডিকেটকে ছোট করে দেখাটাও ভুল হয়েছে। এ-ধরনের কিছু যে ঘটতে পারে, বিজনেস সিন্ডিকেট আগেই তা আন্দাজ করে নিয়েছিল, তাই অরবিদ সিংহের ফটো সহ দু'জন ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্টকে পাঠিয়ে দিয়েছে জাফনায়। ভারতীয় ভিসার জন্যে জমা দেয়া হয়েছিল ওর ভুয়া পাসপোর্ট, ফটো পেতে অসুবিধে হয়নি ওদের। ওরা দু'জন যে র, ভাল করেই জানে রানা। বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টারে ওদের ফাইল দেখেছে ও, ছবি সহ। সেটাই চিন্তার বিষয়—প্রেমদাস চোপড়া আর জগজিৎ পাণ্ডে, দু'জনেই কিলার।

কখন আর কিভাবে লোকগুলো অ্যাকশনে যাবে? ওদের রেকর্ড আর প্রকৃতিই বলে দেয়, ওরা সময় নষ্ট করবে না। জাফনা আর কলম্বোর মাঝখানে রাস্তায় কোথাও একটা ফয়সালা করতে চাইবে। রাজহংসের বেশিরভাগ আরোহী কলম্বোয় যাচ্ছে বিশেষ একটা ট্রেনে চড়ে, ওর-ও কি তাই যাওয়া উচিত, নিরাপত্তার স্বার্থে? ট্রেন ভ্রমণে ঝুঁকি কম, সন্দেহ নেই। কিন্তু ধারণাটা বাতিল করে দিল দুটো কারণে। প্রথম

কারণ, তাতে কিছু অর্জিত হবে না। ওকে ট্রেনে চড়তে দেখলে লোকগুলো তাদের কলম্বো প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করবে, লাইনের অপরপ্রান্তে দ্বিতীয় আরেকটা রিসেপশন কমিটির সাথে দেখা হবে রানার। আরেকটা কারণ, একটা মাজদা গাড়িকে ভয় পাবার দরকার নেই ওর। কলম্বো ত্যাগ করার আগে ওকে একটা পুজো ফোর-জিরো-থ্রী দেয়া হয়েছিল, বাইরে থেকে কিছু বোঝা না গেলেও, ওটার শক্তি বাড়ানো হয়েছে—চল্লিশ সেকেন্ডে স্পীড ওঠে ঘণ্টায় পঁচাত্তর মাইল, গতিবেগ তোলা যায় ঘণ্টায় একশো বিশ মাইল।

সামনে যানবাহনের লম্বা লাইন অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল। 'কি হলো?' দ্রুত জানতে চাইল রানা।

'ব্রিজটা সরু, ওদিক থেকে গাড়ি আসছে,' বলল ড্রাইভার। 'আমার ভাগ্যটাই খারাপ, অপেক্ষা না করে একদিনও ব্রিজটা পেরুতে পারলাম না।'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'কপাল ফাটা হলে এক ঘণ্টার কম নয়। তবে, তার আগে বোমাও ফাটতে পারে।'

'মানে?'

ড্রাইভার লোকটা তামিল, ভাল ইংরেজি জানে। 'মানে জিজ্ঞেস করছেন, স্যার? কেন, শ্রীলংকায় কি ঘটছে জানেন না? ভারতীয় সৈন্য যত দিন না আমাদের দেশ থেকে...'

তাড়াতাড়ি রানা বলল, 'হ্যাঁ, বুঝেছি!' রাজনৈতিক আলোচনা এড়িয়ে যেতে চায় ও।

মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু করার কিছু নেই। ব্রিজের ওদিক থেকে লাইন দিয়ে আসছে যানবাহন, শেষ হতে চায় না। ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের এজেন্টরা মাজদা আর ট্যাক্সির মাঝখানে আরেকটা গাড়িকে ঢুকতে দিয়েছে। ওরা বোধহয় এখনও বোঝেনি যে রানা জানে ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে।

মাত্র পনেরো মিনিট অপেক্ষা করতে হলো, তারপর আবার সচল হলো যানবাহনের দীর্ঘ মিছিল। ব্রিজ থেকে নেমে আসার খানিক পর সামনে ট্রাফিক সিগন্যাল দেখা গেল—যে-কোন মুহূর্তে সবুজ আলো নিভে লালটা জ্বলে উঠবে। স্পীড বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। সিগন্যাল পেরিয়ে এল ওরা, পরমুহূর্তে জ্বলে উঠল লাল আলো। দেখা যাক মাজদা কি করে।

সিগন্যাল অগ্রাহ্য করে ট্যাক্সির পিছনে থাকল লোকগুলো। রানা আশা করল, পুলিসের গাড়ি ধাওয়া করবে ওদেরকে। হতাশ হতে হলো ওকে।

গ্যারেজে পৌঁছুনোর পথে আর কিছু ঘটল না। গ্যারেজের সামনে থামল ট্যাক্সি, সুটকেসগুলো নামাতে রানাকে সাহায্য করল ড্রাইভার। পঞ্চাশ গজ পিছনে মাজদাও দাঁড়িয়েছে।

গ্যারেজের পিছন দিকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই রয়েছে পুজো। সুটকেস দুটো বুটে রাখল রানা। ফুয়েল, পানি আর ব্রেক চেক করল, তারপর উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। সুইচ অন করে স্টার্টারে টান দিল। এঞ্জিন গরম করছে, এই

সময় রাজহংসের কয়েকজন আরোহী এসে পৌঁছুল, তারাও এই একই গ্যারেজে গাড়ি রেখে গিয়েছিল। স্মিত হেসে হাত নাড়ল রানা, গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে এল। ফুয়েল নিতে হবে, উইন্ডস্ক্রীন পরিষ্কার করানো দরকার, চেক করাবে টায়ারগুলো। গ্যারেজ কর্মীদের হাতে গাড়ি তুলে দিয়ে টয়লেটে ঢুকল ও। বেরিয়ে এসে দেখল সব কাজ শেষ হয়েছে। বিল মিটিয়ে দিয়ে রাস্তায় উঠে এল রানা। মাজদা সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সীটের ওপর নড়েচড়ে বসে মনে মনে হাসল ও। ওদের জন্যে একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

জাফনা খুব একটা বড় শহর নয়, কিন্তু বেরুতে দীর্ঘ সময় লাগল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেড আর চেকপোস্ট; সামরিক ইউনিফর্ম, ট্যাংক, সৈন্যবাহী জীপ আর ভ্যান শহরটাকে ক্যান্টনমেন্ট বানিয়ে রেখেছে। শ্রীলংকার সেনাবাহিনীর সাথে তামিল গেরিলাদের যুদ্ধ চলছে, এমন কোন দিন নেই যেদিন শহরের কোথাও না কোথাও খণ্ডযুদ্ধ বাধছে না। গাড়ি থেকে তিনবার নেমে দাঁড়াতে হলো রানাকে, ভারতীয় সৈনিকরা অস্ত্রের সন্ধানে তল্লাশি চালাল। অবশেষে শহরের বাইরে বেরিয়ে এল পুজো, এরপর চওড়া আর সমতল রাস্তাটা ছোট ছোট অনেকগুলো শহর ছুঁয়ে সেই একেবারে কলম্বো পর্যন্ত চলে গেছে। স্পীড বাড়াবার একটা ঝোঁক চাপলেও, নিজেকে দমন করল রানা। তাড়াহুড়োর দরকার কি, অপেক্ষা করায় কোন ক্ষতি নেই। কম হলেও, যানবাহন আছে রাস্তায়, শত্রুরা প্রকাশ্যে কিছু করতে চাইবে বলে মনে হয় না। ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডই ধরে রাখল রানা, একশো গজ পিছনে আঠার মত সেঁটে থাকল মাজদা।

মানকুলাম পর্যন্ত কিছুই ঘটল না, তারপর রাস্তা প্রায় ফাঁকা হয়ে যাবার পরও কিছু ঘটল না। অনুরাধাপুর-এ পৌঁছুবার আগে বহুবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দূরত্ব কমানোর কোন চেষ্টা করল না মাজদার আরোহীরা। রানা ভাবল, তবে কি ওরা শুধু পিছু নিয়ে দেখতে চায় কলম্বোয় পৌঁছে কি করে সে, কার সাথে যোগাযোগ করে বা কোথায় যায়, তাকে নিয়ে অন্য কোন প্ল্যান নেই ওদের? উঁহুঁ, তা হতে পারে না। দু'জন কিলারকে শুধু অনুসরণ করার জন্যে পাঠাবে না বিজনেস সিন্ডিকেট। তাছাড়া, এভাবে পিছনে লেগে থাকা, ওদের জন্যে ঝুঁকির ব্যাপার। ওর কাছে ছোট একটা মাইক্রোফিল্ম রয়েছে, সেটা কোথায় কাকে দেয় বা পাঠায় দেখার জন্যে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিতে হবে ওদেরকে–সেটা সম্ভব নয়, তা করার কোন চেষ্টাও ওরা করছে না।

কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা জানে, ওদের সামনের চার চাকার ভেতর কোথাও আছে জিনিসটা। ফাঁকা রাস্তা, ইচ্ছে করলেই বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে পারে। দিচ্ছে না, কিন্তু তারমানে এই নয় যে দেবে না। অন্য কোন যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হলো না, রানার দৃঢ় বিশ্বাস জিনিসটা কেড়ে নিয়ে ওকে খুন করার জন্যেই পাঠানো হয়েছে ওদেরকে।

অনুরাধাপুর ছাড়িয়ে আসার পর রাস্তার দু'ধারে খাদ আর বনভূমি শুরু হলো। ঘণ্টায় পঁয়ষট্টি মাইল গতিতে ছুটছে পুজো। হঠাৎ রানা দেখল, মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্যে গতি বাড়িয়ে দিয়েছে মাজদা। ওরা কি চাইছে বুঝতে অসুবিধে

হলো না। পুজোকে পাশ কাটিয়ে যাবে, তারপর অকস্মাৎ ব্রেক করে খাদে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করবে পিছনের গাড়িটাকে। পুজো বিধ্বস্ত হোক, অরবিদ সিংহে মারা যাক, কিছু আসে যায় না, খাদে পড়া গাড়ি থেকে নিজেদের জিনিসটা খুঁজে নিতে পারবে ওরা। মাইক্রোফিল্মটা পেলে রানার পালস পরীক্ষা করবে। তখনও যদি মারা গিয়ে না থাকে, গলায় পায়ের চাপ দিয়ে পাঠিয়ে দেবে পরপারে। ওকে আহত অবস্থায় রেখে যাবে, সে আশা নেই। ও যদি ফিল্মটা দেখে থাকে, স্মৃতিতে গেঁথে নিয়ে থাকে ডকুমেন্টটা।

মাজদা পাশ কাটাতে শুরু করল। ভিউ মিররে তাকিয়ে রানা দেখল, দু'জনেই তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। ওদের মুখের ওপর হাসল ও, চাপ দিল অ্যাকসিলেরাটরে, সাথে সাথে সুপারচার্জড এঞ্জিন গর্জে উঠল, সামনের দিকে লাফ দিল গাড়ি। মুহূর্তে পুজোর স্পীড উঠে গেছে আশি মাইলে। পঁচাশি, নব্বুই, তিরানব্বুই– দ্রুত পিছিয়ে পড়ল মাজদা। পরবর্তী বাঁকের সামনে স্পীড উঠল পঁচানব্বুইয়ে। মাজদা তিনশো গজ পিছিয়ে পড়েছে। সামনে এরপর কাছাকাছি অনেকগুলো বাঁক, স্পীড কমাতে হলো। মাজদাকে আবার কাছে আসতে দিল রানা, তারপর পরবর্তী সরল বিস্তৃতিতে পৌঁছে বাড়িয়ে দিল গতি। ডামবুলা পেরিয়ে এল যখন, পিছনে কোথাও দেখা গেল না মাজদাকে। রানা জানে, ওদের নাগালের বাইরে চলে এসেছে পুজো। কলম্বোয় অবশ্য ওরাও পৌঁছুবে, দেরি করে হলেও, কিন্তু অত বড় শহরে ছোট্ট একটা মাইক্রোফিল্ম কোথায় খুঁজবে ওরা?

কলম্বোয় পৌঁছে স্টেশনের কাছাকাছি, সরু একটা গলির অনেকটা ভেতরে গাড়ি থামাল রানা। ড্যাশবোর্ডের তলায় টেপ দিয়ে আটকে রেখেছিল মাইক্রোফিল্মটা, সেটা খুলে পকেটে ভরল। হেডকোয়ার্টার থেকে পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া আছে, কেউ যদি ওকে অনুসরণ করে, কিংবা কোন ভাবে শত্রুপক্ষ যদি ওর গতিবিধির ওপর নজর রাখে, প্রথম সুযোগেই ডকুমেন্টটা হস্তান্তর করতে হবে কলম্বোয় বি.সি.আই-এর স্থায়ী এজেন্টের কাছে। শ্রীলংকায় সে-ই রানার কন্ট্যাক্ট, জিনিসটা তারপর নিরাপদে ঢাকায় পাঠানো তার দায়িত্ব।

এজেন্টের নাম আশরাফ চৌধুরী। বাইশ নম্বর রত্নাগালায় একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে সে। ফাইন আর্টসের ছাত্র আশরাফ, নিয়মিত ক্লাস করে। অরবিদ সিংহের চেহারা এবং পরিচয় নিতে সে-ই সাহায্য করেছে রানাকে। প্রতি মাসের শেষে ঢাকা থেকে মোশাররফ চৌধুরী নামে একলোক মোটা টাকা পাঠায় তাকে। রাহাত খান ছাড়া আর মাত্র অল্প দু'একজন জানে মোশাররফ চৌধুরীর কোন অস্তিত্ব নেই।

এক মাইলটাক হেঁটে এল রানা। বড় রাস্তার ধারেই আশরাফের অ্যাপার্টমেন্ট, নিচ থেকে ওর ফ্ল্যাটের জানালা দেখা যায়। রাস্তা পেরোবার সময় মুখ তুলে তাকাল ও। জানালায় পর্দা ঝুলছে। জানালা যখন বন্ধ নয়, আশরাফ নিশ্চয়ই বাইরে কোথাও বেরোয়নি।

অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ঢোকার আগে চারদিকটা ভাল করে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে নিল রানা, আশপাশে কেউ ঘুরঘুর করছে কিনা। সন্দেহজনক কাউকে দেখল না। ফ্ল্যাটটা

তিনতলায়, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। কারও সাথে দেখা হলো না। ল্যান্ডিঙে পৌঁছে অপেক্ষা করল খানিক। না, ওর পিছু পিছু অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে কেউ ঢোকেনি। মাইক্রোফিল্মটা আশরাফকে দিয়ে বাংলাদেশী পাসপোর্টটা চেয়ে নেবে ও, ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে যাবে কান্ডিতে, ওখানে ব্যক্তিগত একটা কাজ আছে–রাতেই ফিরবে কলম্বোয়, প্লেনের টিকেট পাওয়া গেলে সকালের ফ্লাইট ধরে ফিরে যাবে হেডকোয়ার্টারে।

তিনতলায় উঠে আশরাফের ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়াল রানা, হাত ঘড়িতে তাকিয়ে দেখে সাড়ে পাঁচটা বাজে। আশরাফের জানার কথা, আজ দুপুরে জাফনায় পৌঁচেছে রাজহংস, কাজেই ওর জন্যে অপেক্ষা করার কথা তার। কলিংবেলে আঙুল রেখে চাপ দিল ও–দু'বার, একবার, দু'বার। কে এসেছে বুঝতে পারবে আশরাফ।

সাথে সাথে নয়, আবার খুব বেশি দেরি করেও নয়, খুলতে শুরু করল দরজা। একই সময়ে পিছনে পায়ের শব্দ পেল রানা। ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই দেখল, করিডরের বাঁক ঘুরে মাজদার একজন আরোহী ওর দিকে এগিয়ে আসছে, তার হাতে ধরা পিস্তলের মাজল্ হাঁ করে চেয়ে আছে ওর দিকে।

ঝুঁকি নেয়ার ঝোঁক চাপল রানার, জানে প্রায় আত্মহত্যা করা হবে। করিডর ধরে, লোকটার উল্টোদিকে, ছুটতে শুরু করতে পারে ও। কিন্তু লোকটা যদি গুলি করে, লাগবে। এত কাছ থেকে ব্যর্থ হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

খোলা দরজার দিকে ফিরল রানা। আরেকজন শত্রু, আরেকটা পিস্তল। ঢিল পড়ল ওর পেশীতে, পরাজয় মেনে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ, বোকার মত বীরত্ব দেখাতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করে নেয়ার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই।

'ভেতরে ঢোকো!' খুনী জগজিৎ পাণ্ডে ঠাণ্ডা গলায় বলল রানার পিছন থেকে। ঝানু প্রফেশনাল সে। দু'হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে, রানার পিঠের কাছে সরে আসেনি।

দরজার ভেতর থেকে প্রেমদাস চোপড়া মৃদু হাসল। 'চালে আও, দোস্ত, আন্দার চালে আও। খুশ্ খবরি শুনাওগে না?'

'তোমরা কে?' বিস্মিত হবার ভান করল রানা। 'ও কোথায়?' করিডরে দেরি করতে চাইছে রানা, আশা করছে হঠাৎ কারও চোখে পড়ে যাবে।

শিরদাঁড়ার ওপর পিস্তলের মাজল্ চেপে ধরল জগজিৎ পাণ্ডে। 'ঢোকো!'

'ওকে আমার বিশ্বাস নেই,' রানার কাঁধের ওপর দিয়ে জগজিৎ পাণ্ডের দিকে একবার তাকাল প্রেমদাস, রানাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ধৈর্য কম, তোমার শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে দিলে আমি একটুও আশ্চর্য হব না।'

এরপর দেরি করলে ওর অজ্ঞান দেহটাকে ওরাই ধরাধরি করে ভেতরে ঢোকাবে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল রানা, চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। সিটিংরুমে আশরাফ নেই, বেডরুমও খালি। কিচেনে নিয়ে আসা হলো ওকে। কাঠের একটা শক্ত চেয়ার আগেই এনে রাখা হয়েছে, সেটায় রানাকে বসিয়ে নাইলনের রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হলো। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে রানাকে কাভার দিল জগজিৎ পাণ্ডে, পিস্তলের মাজল্ লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে।

এখনও সন্ধ্যা হয়নি, তবু কিচেনের বালবটা জ্বলছে।

পিস্তলটা এতক্ষণে পকেটে ভরল জগজিৎ পাণ্ডে। সে-ই রানাকে সার্চ করল। মাইক্রোফিল্মটা বের করে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল সে।

'এ-সবের মানে কি?' চেহারায় অসন্তোষ আর রাগ নিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কারা তোমরা?'

জগজিৎ পাণ্ডে প্রেমদাস চোপড়ার দিকে একবার তাকাল। 'তোমাকে না জানানোর কোন কারণ নেই। আমি জগজিৎ পাণ্ডে, আর আমার সঙ্গী প্রেমদাস চোপড়া।' নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল লোকটার ঠোঁটে, গা শিরশির করে উঠল রানার। লোকটা নিজেদের আসল পরিচয় দিল কেন? একটাই উত্তর হতে পারে—ওদের দৃষ্টিতে রানা এরইমধ্যে মারা গেছে।

'পরিচয় জেনে খুশি হলাম,' বলল রানা, অনুভব করল পিঠ বেয়ে ঘামের ধারা নামছে। 'বোধহয় আমার পরিচয়টাও তোমরা জানতে চাও। আমি অরবিদ সিংহে।'

হাসি মুখে মাথা ঝাঁকাল প্রেমদাস চোপড়া, একটা ভুরু কপালে তুলল। জগজিৎ পাণ্ডে ঘড়ঘড় শব্দে হেসে উঠল। দু'জনেই খুব হালকা মেজাজে রয়েছে।

'অরবিদ সিংহে—ঘোড়ার আণ্ডা!' জগজিৎ পাণ্ডে খস খস করে শার্টের ওপর দিয়ে পেট চুলকাল। 'ওটা তোমার নাম নয়। তোমার নাম আবদুস সামাদ। তুমি বাংলাদেশের একজন স্পাই।'

আবদুস সামাদ অবশ্যই পরিচিত একটা নাম। ঢাকা থেকে শ্রীলংকায় আসার সময় নামটা নিয়েছিল রানা। আশরাফ চৌধুরীর কাছ থেকে অন্যান্য ডকুমেন্টের সাথে পাসপোর্টটাও তাহলে ওরা হাতিয়ে নিয়েছে। তার মানে, ধরে নিতে হয়, আশরাফকে ওরা পাকড়াও করেছে, এবং তা আজ নয়, দিন কয়েক আগেই। সেক্ষেত্রে, অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। 'তোমরা দেখছি ভারি কাজের লোক। সবই জেনে ফেলেছ। আশ্চর্য! কিভাবে জানলে?'

প্রেমদাস চোপড়া কথা বলল, সঙ্গীর চেয়ে একটু মোটা আর লম্বা সে। তার মধ্যেও কোন আড়ষ্ট ভাব বা টেনশন নেই, যেন রানাকে নিয়ে কি করবে সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়ে গেছে। 'কিভাবে জানলাম?' হেসে উঠল সে। 'কোন সমস্যাই হয়নি। জাহাজে আমাদের লোক ছিল, তোমার সুটকেস পরীক্ষা করতে গিয়ে ছোট্ট একটা কাগজ পায় তারা—জাফনার একটা গ্যারেজের টিকেট, যেখানে তুমি তোমার গাড়িটা রেখেছিলে। বললাম তোমার গাড়ি, কিন্তু আসলে তা নয়। জাহাজ থেকে আমাদের বন্ধু টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে খবরটা জানায় আমাদেরকে, আমরা গাড়িটা সার্চ করি। সার্চ করে রেজিস্ট্রেশন বুকটা পাই—আশরাফ চৌধুরীর নামে।'

'গাড়িটা যদি আরও ভালভাবে পরীক্ষা করতে তাহলে জানতে পারতে পুজোর পুরানো খোলসের নিচে নতুন, সুপারচার্জড এঞ্জিন ফিট করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাকে ধাওয়া করতে গিয়ে ঠকতে হত না।'

মুচকি হাসল প্রেমদাস। 'ঠকেছি, এ-কথা বলা যায় কি? কে কার হাতে বন্দী, বলো? যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি আমরা।'

সবই সত্যি কথা। নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো রানার। বোকার মত কেন সে

গ্যারেজের টিকেটটা নিজের সুটকেসে রাখতে গেল? পারসারকে রাখতে দেয়নি কেন? আশরাফের ওপরও রাগ হলো ওর। বিদেশে স্থায়ী এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হলে আরও সতর্ক হওয়া দরকার। ছোট্ট একটা ভুল থেকে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। রানাকে তার এমন একটা গাড়ি দেয়া উচিত হয়নি যেটা তার নিজের নামে রেজিস্ট্রি করা।

'বলো দেখি, বঙ্গবীর,' দরাজ গলায় জিজ্ঞেস করল জগজিৎ পাণ্ডে, 'তুমি জানতে জাফনায় আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করব?'

'হ্যাঁ, জানতাম,' মিথ্যে কথা বলল রানা।

'তারমানে জাহাজে আমাদের বন্ধুরা মুখ খুলেছে? শুধু তাদের কাছ থেকেই আমাদের কথা জানতে পারো তুমি। যোগাযোগ করার কথা ছিল, কিন্তু করেনি–তারমানে দু'জনকেই পানিতে ফেলে দিয়েছ?'

হেসে উঠল রানা। 'ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ডেকে লোকজন আসা-যাওয়া করছে দেখে স্টোররুমে বেঁধে রাখতে বাধ্য হলাম। মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছে, চিৎকার করতে পারবে না। ভাগ্য ভাল হলে ইতিমধ্যে তাদেরকে মুক্ত করেছে ক্রুরা।'

'তোমার প্রশংসা করি,' রানার মতই হেসে উঠে বলল প্রেমদাস চোপড়া। 'বিশ্বাসযোগ্য মিথ্যে কথা বলার আর্টটা ভালই রপ্ত করেছ।' সঙ্গীর দিকে তাকাল সে। 'ইন্টারেস্টিং, তাই না?'

'ভারি ইন্টারেস্টিং,' সায় দিল জগজিৎ পাণ্ডে।

রানার দিকে ফিরল প্রেমদাস। 'তাই যদি হয়, যদি জানতে আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করব, তাহলে কোন্ বুদ্ধিতে এখানে এলে তুমি? বিশেষ করে রাস্তায় আমাদেরকে খসিয়ে দেয়ার পর? মনে হয়নি, বিপজ্জনক ঝুঁকি নিয়ে ফেলছ?'

'তোমরা ধরে নিচ্ছ, আশরাফের ভাগ্যে কি ঘটেছে সে-সম্পর্কে খবর দেয়া হয়েছে আমাকে। তোমরা আমাকে অনুসরণ করায় আমি ধরে নিই, আশরাফের ব্যাপারে কিছু জানো না–জানলে আমার পিছু নিতে না, এখানে অপেক্ষা করার কথা।'

'সাবধানতার বিকল্প নেই,' সহাস্যে বলল প্রেমদাস। 'তোমার মনে মিথ্যে একটা নিরাপত্তার ভাব এনে দেয়ার জন্যেই জাফনা থেকে পিছু নিই আমরা। তুমি যদি নিজ গুণে আমাদেরকে না খসাতে, আমরা নিজেরাই খসে যাওয়ার ভান করতাম।'

মনে মনে স্বীকার করল রানা, সম্ভাব্য সমস্ত দিক বিবেচনার মধ্যে রেখে কাজ করেছে ওরা। তাই জিতেছে। 'অতীত বাদ দিয়ে আমরা কি বর্তমান নিয়ে আলাপ করতে পারি না?' জিজ্ঞেস করল ও। 'এখন কি ঘটবে?' আশরাফের ভাগ্যে কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারছে ও।

প্রায় সদয় দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল জগজিৎ পাণ্ডে। 'সেটা নির্ভর করে তোমার ওপর। বি.সি.আই-এর এজেন্ট বড়ই দুর্লভ চিড়িয়া, একটা যখন হাতে পেয়েছি, নিঙড়ে রস বের করার এই সুযোগ আমরা ছাড়ব না। আমাদেরকে বলার মত অনেক কথা হয়তো জমা হয়ে আছে তোমার পেটে।'

'কেন, আশরাফ চৌধুরীর সাথে কথা হয়নি?' ধৈর্য হারানোর সুরে বলল রানা।

নাইলনের রশি মাংস কেটে ভেতরে দেবে যাচ্ছে. ব্যথা করছে কব্জি। 'তোমাদের ভাষায় চিড়িয়া হলেও, নিতান্তই খুদে আমি। আশরাফ আমার বস্, যা জানার তার কাছ থেকেই তো জেনে নিতে পারো।'

ঘড়ঘড় করে হাসল জগজিৎ পাণ্ডে, রানার হাতের রোম খাড়া হয়ে গেল। 'খুদে? আশরাফ তোমার বস্? কভি নেহি! সরাসরি ঢাকা থেকে এসেছ তুমি। আশরাফের কাজ ছিল তোমাকে সাহায্য করা।'

'যা খুশি ভাবতে পারো,' বিরক্তির সাথে বলল রানা। 'তবে আমার কাছ থেকে কিছুই তোমরা জানতে পারবে না।'

'মুখ কিভাবে খোলাতে হয় আমাদের জানা আছে,' নিশ্চয়তা দানের সুরে বলল জগজিৎ। 'আশরাফ তার প্রমাণ পেয়েছে। তুমিও পাবে। বেচারা আশরাফের ওপর অত্যাচারটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল, স্বীকার করছি। অল্প বয়স, আরামে মানুষ, সহ্য করতে পারেনি।'

চেয়ারের ওপর স্থির হয়ে গেল রানা। 'ওকে তোমরা মেরে ফেলেছ?'

'তোমাকেও ফেলব, মুখ না খুললে।'

নীল হয়ে গেল রানা। কিছুই বলল না ও। শুধু সারা শরীরে জ্বলে উঠল প্রতিশোধের অদৃশ্য আগুন। 'বেশ,' কয়েক সেকেন্ড পর শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কি জানতে চাও তোমরা?' যেন সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

'বলো কি জানতে চাই না। বি.সি.আই. সম্পর্কে সম্ভাব্য সব কিছু বলবে তুমি। শুনেছি, তোমরা নাকি আমাদের সম্পর্কে একটা ফাইল তৈরি করেছ। তারমানে, আমাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যেতে চাইছে বি.সি.আই, তাই না?'

প্রেমদাস বলল, 'মান্ধাতা আমলের সেই বুড়োটাই কি এখনও তোমার বস্? সব মিলিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তোমাদের ক'জন এজেন্ট কাজ করছে? তাদের কাভার, ঠিকানা, কন্ট্যাক্ট···'

'তোমরা মানে? র, নাকি বিজনেস সিন্ডিকেট?'

এই প্রথম ধাক্কা খেলো ওরা। প্রেমদাস স্থির পাথর হয়ে গেল। জগজিৎ হাঁ।

প্রথম কথা বলল প্রেমদাস, 'তুমি জানো!'

'কাজেই বুঝতে পারছ, তোমাদের কোন প্রশ্নেরই উত্তর আমি দেব না।'

'কিভাবে জানলে তুমি?' চাপা স্বরে গর্জে উঠল জগজিৎ।

'তোমরাই না বললে, জানো বি.সি.আই. একটা ফাইল তৈরি করেছে? তাছাড়া, র সম্পর্কে বা র-র এজেন্টদের সম্পর্কে বি.সি.আই. জানবে না?'

প্রেমদাস আর জগজিৎ দৃষ্টি বিনিময় করল।

'বেশি জানার তাৎপর্য বোঝো তো?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল জগজিৎ।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জানি তোমাদের আগের সিদ্ধান্তই বহাল থাকছে। তোমাদের সিদ্ধান্ত ছিল, কথা আদায় করার পর আমাকে মেরে ফেলা হবে। সেটা বদলানো হবে না। এই তো?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল জগজিৎও। 'বোদ্ধা প্রতিপক্ষের সাথে কথা বলেও আরাম। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। কোন সন্দেহ নেই তুমি জানু প্রফেশনাল। তবে, একটু

ভুল হচ্ছে তোমার। তোমাকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়েছে, এ-কথা ঠিক। কিন্তু বিকল্প একটা প্রস্তাবও আছে বৈ কি। অবশ্য তুমি দলবদল করতে চাইবে বলে মনে হয় না। দেশপ্রেমিক টাইপদের দেখলেই আমরা চিনতে পারি। যেমন আশরাফকে দেখেও চিনতে পেরেছিলাম।' প্রেমদাসের দিকে তাকাল সে। 'বাংলাদেশীদের একটা প্রশংসা না করে পারা যায় না, অকাতরে প্রাণ দিতে পারে। প্রস্তাবটা হলো···'

'ভুলে যাও।'

'শুনতেও চাও না?' অবাক হলো প্রেমদাস।

'না।'

'তারমানে মুখও খুলবে না,' জনান্তিকে বলল জগজিৎ। 'আমরাও ধারণা করেছিলাম, গোয়ার্তুমি করবে তুমি। ঠিক আছে, আরেকটু অন্ধকার হোক।'

'হলো, তারপর?'

জগজিৎ হাসল। 'তারপর তোমাকে কথা বলাবার ব্যবস্থা করব। তবে এখানে নয়। আমাদের আস্তানায়। সেখানে কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করবে না। অন্তত চেঁচাবার স্বাধীনতা পাবে তুমি। মাঝখানের অল্প সময়টুকু চিন্তাভাবনা করে দেখো। প্রস্তাব ছিল, তুমি যদি বিজনেস সিন্ডিকেটের হয়ে কাজ করো···'

'বৃথা সময় নষ্ট করছ।'

'আমারও তাই ধারণা,' জগজিৎকে বলল প্রেমদাস। 'আস্তানায় পৌঁছে যা করার করা যাবে।' দু'জনেই ওরা কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল, যাবার আগে নিভিয়ে দিয়ে গেল আলোটা। ইতোমধ্যে বাইরে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

কিচেনের খোলা জানালা দিয়ে যানবাহনের বিরতিহীন আওয়াজ ভেসে আসছে। শহরের অত্যন্ত ব্যস্ত এলাকায় অ্যাপার্টমেন্টটা। যথেষ্ট রাত না হলে রাস্তা খানিকটা ফাঁকা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। রানা ধারণা করল, আরও অন্তত তিন-চার ঘণ্টা এই চেয়ারে বসে থাকতে হবে ওকে। এই মুহূর্তে মিছিলের মত ভিড় ফুটপাথে, ওকে নিয়ে বেরুতে সাহস করবে না ওরা।

ক্লাসিকাল একটা সমস্যা—ঘরের দরজা বন্ধ, চেয়ারের সাথে রশি দিয়ে বাঁধা বুক, হাত দুটো বাঁধা পিছমোড়া করে, খুন হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে বন্দী। ঘরের দরজা বন্ধ বা দরজার বাইরে পাহারা রয়েছে, এ-সব তেমন কোন সমস্যা নয়। জানালা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে ও। সমস্যা হলো, নিজেকে মুক্ত করা।

কি, পারবে? চ্যালেঞ্জ করল রানা নিজেকে।

কিন্তু মাত্র তিন মিনিটের চেষ্টাতেই কব্জির চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ল, ঢিলে হওয়া তো দূরের কথা, আরও শক্তভাবে দেবে গেল রশি। ক্ষতগুলো জ্বালা করছে, পানি বেরিয়ে পড়ল চোখে।

হতাশ? হাল ছেড়ে দেবে?

পাশের ঘর থেকে কোন শব্দ আসছে না। লোকগুলো ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেছে? না, তা যাবে না। ওরা হয়তো সিটিংরুমে বসে টিভি বা ভিসিআর-এ ছবি দেখছে। কিংবা হয়তো মাইক্রোফিল্মের রোলটা পরীক্ষা করছে। খুব বেশি সময় নেই, ওর হিসেব ভুলও হতে পারে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা। বাঁচতে চাইলে যা করার

তাড়াতাড়ি করতে হবে।

ঘাড় যতটা সম্ভব বাঁকা করে গোটা কিচেনের ওপর চোখ বুলাল ও। এখানে আগেও একবার এসেছে, কিন্তু এভাবে খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন হয়নি। গ্যাসের চুলোটা মেঝের কাছাকাছি, এক প্রান্তে। দুটো চুলো, তবে একটাও জ্বলছে না।

একদিকের দেয়ালে একটা কাঠের মিটসেফ রয়েছে। মিটসেফের মাথায় বাসন-পেয়ালা, আলু-পেঁয়াজ ভর্তি একটা ঝুড়ি, দুধের টিন, চায়ের প্যাকেট ইত্যাদির সাথে একটা দিয়াশলাই রয়েছে।

রানা ভাবল, একটা ছুরি পেলে হত। কিন্তু পিছমোড়া করে বাঁধা হত, ছুরি পেলেই বা কি লাভ? এরপর দিয়াশলাইটার কথা ভাবল ও। আগুন ধরাতে পারা যায়? মিটসেফের দেরাজে কাগজ-টাগজ কিছু কি পাওয়া যাবে না? নিদেনপক্ষে দু'একটা ঠোঙা?

সামনের দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকতে শুরু করল রানা। চেয়ারটা আগের মতই সেঁটে থাকল পিঠের সাথে, মুখ থুবড়ে মেঝেতে আছাড় খাবার অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে ও। অবশেষে পায়ের আঙুলগুলোয় ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারল, পিঠে চেয়ার নিয়ে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোল রানা, প্রতি মুহূর্তে ভয় হতে লাগল এই বুঝি পড়ে গেল।

এক সময় মিটসেফের সামনে পৌঁছুল ও। কিনারা থেকে ছ'ইঞ্চি দূরে রয়েছে দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা। নাক দিয়ে টেনে সেটাকে কাছে আনল, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে গেল, ডান হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করল, নিয়ে এল মুঠোর ভেতর। দেহ ভঙ্গি না বদলে মিটসেফের দেরাজ খোলার চেষ্টা করল চেয়ারের একটা পায়া নবে বাধিয়ে। ভাগ্যগুণে নবটা বেশ বড়। বার কয়েক চেষ্টা করার পর খানিকটা বেরিয়ে এল দেরাজ। এরপর আবার ওকে ঘুরতে হলো, কারণ চেয়ারের আড়াল থাকায় দেরাজের ভেতর কি আছে দেখতে পাচ্ছে না।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন। শুধু দেরাজ খোলেনি, খোলা দেরাজ থেকে ভাঁজ করা অনেকগুলো খবরের কাগজও মেঝেতে পড়ে গেছে। আবার ঘুরল রানা, চেয়ারের পায়ার সাহায্যে কাগজগুলোকে টেনে আনল সরাসরি ওর হাতের নিচে। কয়েকটা কাগজ এমনভাবে সাজাল যাতে দেরাজের ভেতরও আগুন ঢুকতে পারে।

কপালে ঘাম জমেছে। হাঁপিয়েও গেছে রানা। পরিশ্রমে নয়, উদ্বেগে। যে-কোন মুহূর্তে কিচেনে চলে আসতে পারে খুনী দু'জন।

এবার দিয়াশলাইয়ের বাক্সটা খুলতে হবে। কাজটা সামান্য, কিন্তু সাংঘাতিক ভোগাল রানাকে। দুই হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের এত কাছে যে নাড়াচাড়া করার জায়গা নেই। প্রতি মুহূর্তে হাত থেকে খসে মেঝেতে পড়তে চাইছে বাক্সটা, পেশীতে টান পড়ায় গোটা হাত ব্যথায় টন টন করছে। অনেক কসরৎ করার পর বাম হাতে বাক্স, ডান হাতে একটা কাঠি ধরতে পারল রানা। বাক্সের গায়ে কাঠিটা ঘষা কঠিন হলো না। বারুদের জ্বলে ওঠার আওয়াজ পেল রানা। জ্বলন্ত কাঠিটা কাগজের ওপর ছেড়ে দিল। ধোঁয়ার গন্ধ আর শিখার শব্দ পাবার অপেক্ষায় থাকল। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

কাজেই গোটা ব্যাপারটার পুনরাবৃত্তি শুরু হলো—বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে বাক্সের গোড়ায় ঠেলা দাও, ডান হাতের আঙুল দিয়ে বের করো একটা কাঠি—ধেত্তেরি, পাঁচ-ছ'টা কাঠি আঙুলের ফাঁক গলে খসে পড়ল নিচে—বন্ধ করো বাক্স, বাঁ হাতে নিয়ে এসো ওটাকে, কাঠিটা ডান হাতের দু'আঙুলে ধরে বাক্সের গায়ে ঘষো, জ্বলন্ত কাঠিটা ছেড়ে দাও, মেঝেতে পড়ুক ওটা। কিন্তু এবারও কিছু ঘটল না।

তৃতীয়বার চেষ্টা না করে আরেকটু মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করল রানা। চেয়ার নিয়ে পিছন দিকে মেঝেতে পড়তে পারে ও? যাতে কাগজগুলোকে স্পর্শ করা যায়?

এত দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল রানার। পিছন দিকে আছাড় খাওয়া সম্ভব, কিন্তু তারমানে দাঁড়াতে পারে জ্যান্ত পুড়ে মরার ব্যবস্থা পাকা করা। কাজেই আবার কাঠি বের করারই চেষ্টা করল।

সব সেই আগের মত ঘটল। জ্বলন্ত কাঠিটা দু'আঙুল থেকে ছেড়ে দিল রানা। এবারও কাগজে আগুন ধরল না।

সাতবারের বার সফল হলো রানা। ইতোমধ্যে ঘেমে গোসল হয়ে গেছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত, চেহারা হয়েছে উন্মাদের মত। ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে ঢিল পড়ল পেশীতে। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ঘুরল ও, দেখতে চায় কি ঘটছে।

আগুন ধরেছে, তবে এখনও সেটা ছোট্ট। মেঝের অন্যান্য কাগজের দিকে ছড়াতে শুরু করার সাথে সাথে ওপর দিকেও উঠে যাবে সেটা। সামনের দিকে ঝুঁকে ফুঁ দিল রানা। গোটা একটা খবরের কাগজে আগুন ধরে গেল। তৃপ্তির সাথে লক্ষ করল, লকলকিয়ে দেরাজের দিকে উঠছে একটা শিখা।

আগের জায়গায় ফেরার জন্যে আবার ঘুরতে হলো রানাকে। ঠিক আগের পজিশনে স্থির হবার পর আগুনটার দিকে আবার তাকাল। বাহ্, রীতিমত নাউ দাউ করে জ্বলছে। গোটা দেরাজে আগুন ধরে গেছে, পুড়তে শুরু করেছে মিটসেফের শরীর, এরইমধ্যে কালচে হয়ে গেছে কাঠ।

আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রানা। খুনী দু'জন এসে যেন দেখে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে আগুন। মিটসেফের মাথা থেকে লাফ দিয়ে শিখাগুলো কাঠের মাচা স্পর্শ করল। মাচায় আগুন সিলিং ছুঁলো। এবার চিৎকার করা যায়।

প্রথমে এল জগজিৎ পাণ্ডে, উঁকি দিয়েই বিস্ফারিত চোখ নিয়ে পিছিয়ে গেল সে, আর্তনাদ বেরিয়ে এল গলা থেকে, 'আগ! আগ!' তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঁকি দিল প্রেমদাস চোপড়া।

'হায় ভগবান! আগ লাগা ক্যায়সে!'

প্রেমদাসকে পাশ কাটিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল জগজিৎ, আগুনের দিকে একটা চোখ রেখে কিচেন ট্যাপ-এর প্যাচ ঘোরাল।

'কোই ফায়দা নেহি!' চিৎকার করে বলল প্রেমদাস। 'ট্যাপের পানি দিয়ে নিভবে না! দেখছ না চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে!'

ঘটনাচক্রে, কিচেনে কোন বালতি নেই। জগজিৎও বুঝল, এ আগুন তাদের

দ্বারা নেভানো সম্ভব না। ঝট করে রানার দিকে ঘুরল সে, হিংস্র আক্রোশে ফুঁসছে। 'তুমি লাগিয়েছ, তাই না?' কিন্তু কোন জবাব পেল না। ধোঁয়া গিলে কাশছে রানা।

আটকা পড়া ইঁদুরের মত ঘরময় ছুটোছুটি করল জগজিৎ, তারপর প্রেমদাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শালাকে এখানে ফেলে পালাই চলো।' চোখ রগড়াল সে।

'না,' বলল প্রেমদাস। 'কোনমতেই না। ওকে আমাদের দরকার। ওকে নিয়ে...'

'বুঝতে পারছ না!' উন্মাদের মত মাথা দোলাল জগজিৎ। 'ওকে নিয়ে নিচে নামলেই পালাতে চেষ্টা করবে, চিৎকার করে লোক জড়ো...'

'চেষ্টা করে দেখুক।' খক খক করে কাশতে কাশতে ছুটে রানার কাছে চলে এল প্রেমদাস, ব্যস্ত হাতে ওর বাঁধন খুলছে। আগুনের আঁচ এরইমধ্যে অসহ্য হয়ে উঠছে। 'কি করতে চেয়েছিলে জানি,' রানাকে বলল সে। 'ভেবেছিলে আগুনে পোড়াতে পারবে রশিটা, তাই না?' তার চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। রাগে দাঁত কিড়মিড় করল। 'কিন্তু তোমাকে তো আমরা হাতছাড়া করতে পারি না। প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান থেকে যে ইনফরমেশন পাচ্ছি, তোমাকে পালাতে দিলে তা কি আর পাব আমরা? অথচ আরও ইনফরমেশন আমাদের পেতে হবে...'

বাঁধন মুক্ত হবার পর নিজের পায়ে দাঁড়ালই শুধু রানা, হাঁটতে পারল না। চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যাবার উপক্রম করল, তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল প্রেমদাস। ওরা দু'জন ওর দুটো হাত ধরে বের করে আনল কিচেন থেকে। সিটিংরুমে একবার দাঁড়াল ওরা, প্রেমদাস টেলিফোন করল ফায়ার ব্রিগেডে। সময় পেয়ে হাত আর পা নাড়াচাড়া করে রক্ত প্রবাহ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল রানা। নিকট ভবিষ্যতে কি করণীয় ভাবছে। জগজিৎ পাণ্ডের হাতে পিস্তল, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে সিধে হলো প্রেমদাস। 'চলো!' মারমুখো ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকাল সে। 'তার আগে শুনে রাখো—দু'জনেই আমরা সশস্ত্র। আমার পিস্তলটা ট্রাউজারের পকেটে থাকবে, কিন্তু আঙুল থাকবে ট্রিগারে। যদি দেখি তুমি পালাবার চেষ্টা করছ বা চিৎকার দিতে যাচ্ছ, পকেট থেকেই গুলি করব। আর গুলি করব খুন করার জন্যে।'

তার কথা বিশ্বাস করল রানা। ওকে নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল দু'জন। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ওর দু'পাশে থাকল তারা। ইতোমধ্যে জগজিতের পিস্তলটাও ট্রাউজারের পকেটে গিয়ে ঢুকেছে।

নিচের হলে নেমে এল তিনজন, কারও সাথে দেখা হলো না। হল পেরিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ফুটপাথে, জনতার সচল মিছিলের মাঝখানে। রানার একটা হাত ধরে ওর পিছনে রয়েছে প্রেমদাস, ওদের সামনে রয়েছে জগজিৎ। বিশ গজ দূরে বহু লোকের একটা জটলা দেখা গেল, কিচেন থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। ভিড়টাকে এড়াবার জন্যেই ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে এল জগজিৎ, রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের ফুটপাথে উঠতে চায়। কে জানে, ভাবল রানা, ওদের গাড়িটা হয়তো ওদিকেই কোথাও লুকানো আছে।

কিন্তু রাস্তায় নামলেও, সামনে যানবাহনের বিরতিহীন ছুটোছুটি, অগত্যা নিরাপদ

একটা ফাঁক পাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলো ওদেরকে। রানার কানে কানে ফিস ফিস করল প্রেমদাস, 'সাবধান! বোকার মত কিছু করতে গিয়ে নিজের অকাল মৃত্যু ডেকে এনো না।'

তার কথা শুনতেই পেল না রানা। একজোড়া ভ্যান দেখতে পাচ্ছে ও। ভাবছে আশরাফের কথা। ছেলেটার জন্যে গর্ব অনুভব করল। ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স এজেন্টদের ট্রেনিং সম্পর্কে জানা আছে ওর, জানা আছে বিজনেস সিন্ডিকেটের ইন্টারোগেশনের পদ্ধতি সম্পর্কে। সব সহ্য করেছে আশরাফ, তবু মুখ খোলেনি। দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে সে, লোভনীয় প্রস্তাব পায়ে দলে। তার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ যদি নিতে না পারে, নিজেকে রানা কোন দিন ক্ষমা করতে পারবে?

ভ্যান দুটো থেকে উপচে পড়ছে ভারতীয় সৈন্য। ভ্যানের মাথার কাছে মেশিনগান ফিট করা রয়েছে। মেশিনগানের পিছনে গানার, শ্যেনদৃষ্টিতে চোখ বুলাচ্ছে ফুটপাথে সচল লোকারণ্যের ওপর। কারণটা পরিষ্কার। তামিল গেরিলারা প্রতিদিনই কলম্বো শহরের আনাচেকানাচে অ্যামবুশ পেতে অপেক্ষা করে, ভারতীয় সৈন্য দেখলেই শুরু করে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ। ভ্যান দুটোর গতি দেখেই বোঝা যায়, সদলবলে টহলে বেরিয়েছে সৈন্যরা। অন্যান্য যানবাহন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

রানার পিঠে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল প্রেমদাস। জগজিৎ রাস্তা পেরুতে শুরু করল। তাকে অনুসরণ করল রানা। প্রথম ভ্যানটার সামনে দিয়ে রাস্তাটা পেরিয়ে যাবে ওরা, ডান দিকে সেটা এখনও পনেরো গজ দূরে। রাস্তার মাঝখানে এসে আত্মহননের পথটাই বেছে নিল রানা। জানে, মৃত্যুর ঝুঁকি না নিলে প্রতিশোধ নেয়া যাবে না।

ওর হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছে প্রেমদাস, তার সন্দেহ রানা হঠাৎ করে সামনের দিকে ছুট দিতে পারে। ছুট দিল রানা, কিন্তু পিছন দিকে। তার আগে প্রেমদাসের পাঁজর লক্ষ্য করে কনুই চালাতে ভুল হয়নি ওর।

রাস্তার মাঝখানে অদ্ভুত এক দৃশ্য। সদ্য আছাড় খেয়ে পড়া প্রেমদাসকে লাফ দিয়ে টপকাল রানা, তিন গজ এগিয়ে থামল, চিৎকার জুড়ে দিল, 'টেরোরিস্ট!' লম্বা করা হাত প্রেমদাস আর জগজিতের দিকে তাক করা। জগজিৎ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অদূরেই! 'টেরোরিস্ট! টেরোরিস্ট! টেরোরিস্ট!' চিৎকার করছে রানা, দ্রুত পিছিয়ে আসছে। চট করে একবার সামনের ভ্যানটার দিকে তাকাল! তারপর মুখ ফেরাতেই দেখল, বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে পকেট থেকে পিস্তল বের করছে প্রেমদাস।

কিন্তু তার ভুলটা বুঝতে পেরে চিৎকার করে উঠল জগজিৎ। 'না! প্রেমদাস, না!' সঙ্গীকে বাধা দেয়ার জন্যে ছুটে এল সে।

আর ঠিক তখুনি গুলি হলো। মেশিনগানের প্রথম দফার বর্ষণে প্রায় দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল প্রেমদাস, তার হাতের পিস্তল থেকে বেরিয়ে বুলেটটা উঠে গেল আকাশের দিকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জগজিৎ, ঘাড় ফেরাতে শুরু করল ভ্যানের দিকে, খালি হাত দুটো উঠে যাচ্ছে মাথার ওপর। এই সময় আবার গুলি হলো।

ঝাঁকি খেতে খেতে পিছুতে শুরু করল জগজিৎ পাণ্ডে। হাজার হাজার দর্শক দেখল, লোকটা যেন নৃত্যচর্চা করছে। তার শার্ট আর ট্রাউজারে অসংখ্য ফুটো তৈরি হলো, প্রতিটি ফুটো ভরে উঠল লাল রক্তে। পড়ে গেল সে। সেই সাথে মেশিনগানও থামল। মুহূর্তের জন্যেও পিছু হটা বন্ধ করেনি রানা, ফুটপাথে ওঠার পর উপলব্ধি করল ওর দু'পাশ দিয়ে বুলেটের মত ছুটে যাচ্ছে মানুষজন। নিমেষে তাদের একজন হয়ে যেতে কোন সমস্যাই হলো না ওর।

# পাঁচ

চোখ থেকে হালকা ফ্রেমের চশমাটা খুললেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান, খোলা একটা ডোশিয়ের ওপর রাখলেন সেটা, হেলান দিলেন রিভলভিং চেয়ারে, ঢুলুঢুলু চোখে হিমশীতল দৃষ্টি, রানার দিকে তাকিয়ে আছেন। 'প্রেমদাস আর জগজিৎ প্রসঙ্গ শেষ হলো। ঠিকই আছে। অস্বাভাবিক ঝুঁকি নিয়েছ তুমি, অন্য কোন পরিস্থিতি হলে একে অমানবিক বলতাম–কিন্তু বি.সি.আই-এর একজন এজেন্টকে খুন করে কেউ পার পেয়ে যাবে, এ হতে পারে না। তবে কি জানো, ভারতীয় ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে আমার যে শ্রদ্ধা ছিল তাতে বেশ খানিকটা চিড় ধরল। এজেন্টরা একটা ক্রাইম সিন্ডিকেটের পক্ষ নিয়ে কাজ করছে, প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট করছে, অথচ কর্মকর্তারা নির্বিকার, স্রেফ অবিশ্বাস্য।'

'লাগেজসহ গাড়িটা যেখানে রেখেছিলাম সেখানেই আছে, আমি আর ওটার কাছে ফিরে যাইনি,' বলল রানা।

'ভালই করেছ। তোমার হয়তো জানার কৌতূহল রয়েছে–সেই রাতেই তোমার লাগেজ চুরি যায়, আর গাড়িটা থানায় নিয়ে গেছে পুলিস। একটা খাল থেকে আশরাফের লাশও উদ্ধার করা হয়েছে।' ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটুকরো ভেলভেট বের করলেন রাহাত খান, চশমার কাঁচ পরিষ্কার করছেন। 'সব মিলিয়ে, বলতে হয়, ফলাফল খুব একটা ভাল হয়নি–কি বলো?'

'জ্বী।' মৃদুকণ্ঠে স্বীকার করল রানা। 'ডকুমেন্টের ফটো-কপিটা হাতছাড়া হয়েছে। তবে…'

'আর ভুলটা?' হঠাৎ তলোয়ারের মত খাড়া হলো রাহাত খানের শিরদাঁড়া, চোখে চশমা পরে অগ্নিদৃষ্টি হানলেন রানার দিকে। 'গ্যারেজের স্লিপ কোন আক্কেলে সাথে রাখলে তুমি, বিশেষ করে যখন জানতে ওটা আশরাফের গাড়ি? নো, নেভার–এ-ধরনের ভুল তোমার কাছ থেকে আশা করি না আমি। কি মাসুল দিতে হলো? সামান্য ভুল, কিন্তু কি ক্ষতি হয়ে গেল!'

চেম্বারের ভেতর পিন-পতন স্তব্ধতা নেমে এল। রানা অধোবদন, এক চুল নড়ছে না, অপরাধবোধে জর্জরিত।

'ভবিষ্যতে এ-ধরনের ত্রুটি যেন আর না হয়,' গম গম করে উঠল রাহাত

খানের ভারী কণ্ঠস্বর। 'প্রতিশোধ নিতে পেরেছ, তাই আরেকটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে। আবার যদি স্লিপ করো, গুরুত্বপূর্ণ কাজে তোমাকে আর আমাদের দরকার হবে না। মনে থাকবে?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা। ভুলটা অপরাধের সমতুল্য, জানে ও। ভুল আশরাফও করেছে, নিজের নামে রেজিস্ট্রি করা গাড়ি রানাকে ব্যবহার করতে দেয়া উচিত হয়নি তার। ছোট্ট একটা ভুল, কিন্তু প্রাণ দিয়ে তার মাসুল দিতে হলো তাকে। প্রায় একই ধরনের ভুল করেছে রানাও।

'তবে···কি?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান, রানার শেষ কথাটার সূত্র ধরে।

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বুকটা হালকা করে নিল রানা, কথা বলার সময় বসের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না। 'আমি একটা তথ্য জানি। ডকুমেন্টটা বাংলাদেশের কোন প্রজেক্ট থেকে চুরি করা হয়েছে। প্রজেক্টের নামটা আমি জানি—জিরো-জিরো-ওয়ান।'

চোখ দুটো যেন অকস্মাৎ দপ করে জ্বলে উঠল, পরমুহূর্তে কাঁচা-পাকা ভুরু কুঁচকে ধমকের সুরে বললেন রাহাত খান, 'কি করে বুঝলে সূত্রটা তোমাকে ইচ্ছে করে দেয়া হয়নি?'

'আমার তা মনে হয় না,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'একটা ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, ওরা আমাকে খুন করতে যাচ্ছিল। ওরা ধরে নিয়েছিল ডকুমেন্টটা আমি পরীক্ষা করেছি—সুযোগ পেলে করতামও। তাছাড়া, কিচেনে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, মিথ্যে তথ্য দেয়ার পরিবেশ ছিল না সেটা।'

'আচ্ছা, বেশ,' গম্ভীর সুরে বললেন রাহাত খান, মনে মনে রানার ওপর সন্তুষ্ট, কিন্তু চেহারায় সেটা প্রকাশ পেতে দিলেন না। 'তুমি যখন নিঃসন্দেহ, তথ্যটা মিথ্যে নয় বলেই ধরে নিচ্ছি।' রানার অবনত মস্তকের দিকে চোখ রেখেই ইন্টারকমের সুইচ অন করলেন।

অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দিল ইলোরা।

'সোহেলকে দরকার,' বললেন তিনি। 'প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান-এর ফাইলটা নিয়ে এখুনি আসতে বলো।'

রানার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান কি জিনিস। কিন্তু বসের মেজাজ ঠিকমত ঠাহর করতে না পেরে প্রশ্নটা করল না। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'কলম্বো থেকে প্রেমদাস আর জগজিতের রিপোর্ট না পেয়ে বিজনেস সিন্ডিকেট ধরে নেবে তারা বেঁচে নেই। বাংলাদেশে তাদের স্পাইকে সাবধান করে দেবে ওরা।'

'তুমি ভাবছ লোকটাকে ধরা কঠিন হবে? সেটা নির্ভর করবে তার নার্ভ আর ব্যক্তিত্বের ওপর। ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে শুনলেই হয়তো নার্ভাস হয়ে পড়বে সে।'

চেম্বারের দরজায় টোকা পড়ল।

'কাম ইন!' অনুমতি দিলেন রাহাত খান।

পরনে স্যুট, হাতে একটা ফাইল, স্মার্ট ভঙ্গিতে চেম্বারে ঢুকল সোহেল আহমেদ।

'বসো,' বললেন রাহাত খান। 'প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান সম্পর্কে যা জানো সব বলো রানাকে—প্রজেক্টের জন্ম, ইতিহাস, কি নিয়ে ব্যাপারটা, তাৎপর্য, এবং নিরাপত্তার দিকগুলো।' কথা শেষ করে বাক্স খুলে একটা চুরুট বেছে নিলেন তিনি, আগুন ধরিয়ে হেলান দিলেন চেয়ারে।

হাতলহীন একটা চেয়ারে রানার পাশে বসল সোহেল, ডেস্কের ওপর ফাইলটা রেখে খুলল। 'অ্যাটমিক সাবমেরিন নটিলাসের কথা তো জানিস?' রানার দিকে ফিরে শুরু করল সে, কথার মাঝখানে বারবার খোলা ফাইলে চোখ বুলাল। 'নটিলাস তৈরি করেছিল ইলেকট্রিক বোট কোম্পানী—ওরা জাহাজ ছাড়া আর কিছু তৈরি করে না। আরেকটা প্রতিষ্ঠান, জেনারেল ডায়নামিক করপোরেশন, এয়ারক্রাফট তৈরি করে। ইলেকট্রিক বোট কোম্পানী অ্যাটমিক সাবমেরিন তৈরি করার পর সারা দুনিয়ায় হৈ-চৈ পড়ে যায়, সেই সাথে জেনারেল ডায়নামিক করপোরেশন অ্যাটমিক প্লেন তৈরি করার জন্যে উঠে-পড়ে লাগে। এই কোম্পানী দুটো এমন এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন এঞ্জিন চালাবার জন্যে অ্যাটমিক এনার্জি ব্যবহার করার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু অ্যাটমিক সাবমেরিন তৈরিতে সাফল্য এলেও, অ্যাটমিক এ্যারোপ্লেন তৈরি করা সম্ভব হয়নি। সমস্যার প্রকৃতিটা কি বোঝাবার জন্যে এত কথা বলা।

'এরপর আরও বহু প্রতিষ্ঠান গজিয়েছে, অত্যাধুনিক বহু ধরনের প্লেন দেখেছি আমরা, কিন্তু অ্যাটমিক প্লেন তৈরির স্বপ্ন আজও স্বপ্নই রয়ে গেছে। সমস্যাটা কি? কেন অ্যাটমিক প্লেন তৈরি করা সম্ভব হয়নি?'

'উন্নত বিশ্বে কয়েক হাজার বিজ্ঞানী কয়েক যুগ ধরে গবেষণা চালিয়েও কোন সমাধান দিতে পারেনি। সমস্যাটা হলো—ওজন। র‍্যাডিয়েশন থেকে ক্রু আর মেশিন বাঁচাবার জন্যে সীসা বা পানির একটা শীল্ড দরকার। কিন্তু প্রতি পাউন্ড শীল্ড মানে প্লেনের জন্যে অতিরিক্ত এক পাউন্ড বোঝা। ইদানীং গোটা ব্যাপারটার ন্যূনতম ওজন দাঁড়ায়, এয়ারক্রাফট আর অ্যাটমিক এঞ্জিনসহ, প্রায় তিনশো টন। বুঝতেই পারছিস, অসম্ভব একটা ব্যাপার।'

'গোড়াতেই একটু খটকা লাগছে আমার,' বলল রানা। 'আমরা যেখানে প্লেনই তৈরি করতে পারি না, সেখানে অ্যাটমিক প্লেন তৈরির সাথে বাংলাদেশের কি সম্পর্ক? নাকি কোন সম্পর্ক নেই?'

'আছে,' চট করে একবার রাহাত খানের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল সোহেল। 'সে ব্যাখ্যাই তো দেয়া হচ্ছে তোকে, তুই শা—, মানে, শান্ত হয়ে একটু ধৈর্য ধর। তার আগে জানা দরকার, আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে, কিন্তু পৃথিবীর কোথাও এখনও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি, এ-ধরনের অন্তত বারোটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা চলছে বাংলাদেশে। এগুলোর যে-কোন একটা আবিষ্কার করা সম্ভব হলে গোটা বিশ্ব উপকৃত হবে, আর বাংলাদেশ পাবে সম্মান ও অর্থ। আমরা পিছিয়ে আছি, কিন্তু তারমানে তো এই নয় যে চিরকাল পিছিয়ে থাকতে হবে, অন্তত চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি, বিশেষ করে আমাদের বিজ্ঞানীরা যখন উন্নত বিশ্বের মানদণ্ডেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালভাবে উতরে যেতে পারছেন। বারোটা বিষয়ের মধ্যে এটাও

একটা–অ্যাটমিক প্লেন তৈরির ফর্মুলা আবিষ্কার।'

রানা কিছু বলার আগে রাহাত খান প্রশ্ন করলেন, সোহেলের দিকে গভীর ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি, 'আমি কি ধরে নেব, ওজনের প্রশ্নটাই অ্যাটমিক প্লেন তৈরির ক্ষেত্রে একমাত্র বাধা?'

'জ্বী, স্যার, আমার তাই বিশ্বাস।'

'বাংলাদেশে এ-ধরনের গবেষণা চলছে অথচ···!' মৃদু হলেও, রানার গলায় খেদ প্রকাশ পেল।

ওকে বাধা দিয়ে সোহেল বলল, 'দুঃখ করার কিছু নেই তোর। কারণ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অল্প দু'চারজন ব্যক্তি ছাড়া কি কি বিষয়ে কোথায় গবেষণা চলছে কেউ তা জানে না। বি.সি.আই. কেন জানে, সেটা তুই-ও বুঝিস। মাঝখানে কথা না বলে পটভূমিটা ব্যাখ্যা করতে দে আমাকে।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'বছর দুই আগে বাংলাদেশ এয়ারফোর্স এই অ্যাটমিক প্লেন তৈরির ফর্মুলা আবিষ্কারের জন্যে একটা ল্যাবরেটরি গড়ে তোলে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, এয়ারফোর্সের যে-কোন বিজ্ঞানী, তার যদি সিকিউরিটি ক্লিয়ার্যান্স থাকে, এই ল্যাবরেটরি ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু মাস কয়েক পর সিদ্ধান্ত হয়, তিনজন বাংলাদেশী বিজ্ঞানীকে গবেষণা চালানোর জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এয়ারফোর্সের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সবাই তাঁরা দেশে ফিরে আসেন, রাজি হন গবেষণা চালাতে। এখানে বলে রাখা দরকার, তিনজনই তাঁরা এই একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন দেশে কাজ করছিলেন।

'বাধাটা কি, তা তো শুনলিই–ওজন। সেই বাধা বাংলাদেশী বিজ্ঞানীদের দ্বারা টপকানো সম্ভব হয়েছে,' বলে চলল সোহেল, আরেকবার চোখ বুলাল ফাইলে। 'এ-বছরের এপ্রিলে তৈরি একটা মেমোর‍্যানডাম রয়েছে এখানে, বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে আমাদের বিজ্ঞানীরা কিভাবে একটা শীল্ড তৈরিতে সফল হলো···' পাতা ওল্টাবার জন্যে থামল সে। 'এক মিনিট। এখানে বলা হয়েছে, জিনিসটা কি দিয়ে তৈরি, তৈরির পদ্ধতি। সবটুকু জানতে চাস?'

'কি দরকার!' রাহাত খান মন্তব্য করলেন, 'প্রথমবার যখন শুনি, মনে হয়েছিল গ্রীক। দ্বিতীয়বার হিব্রু।'

'মোটকথা,' বলল সোহেল, 'ওরা এমন একটা হালকা শীল্ড তৈরি করতে পেরেছে, যার ফলে ভবিষ্যতে অ্যাটমিক প্লেন তৈরি করতে চাইলে সর্বসাকুল্যে ওজন নেমে আসবে আশি টনে। আশি টন–বলা হয়েছে, এটা গ্রহণযোগ্য একটা ওজন।'

'এই শীল্ড সম্পর্কে কার কি রকম আগ্রহ বলে তোমার ধারণা, সোহেল?' জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান। 'আমি আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন, ফ্রান্স, এমনকি ভারত ও পাকিস্তানেরও কথা বলছি।'

'মার্কিন প্রেস আমাদের গবেষণা সম্পর্কে প্রথম আঁচ করতে পারে,' বলল সোহেল। 'তারপরই গবেষণা কত দূর এগিয়েছে জানার জন্যে তৎপর হয়ে ওঠে

সি.আই.এ.। ওদের দেখাদেখি কে.জি.বি-ও চর পাঠায়। তারপর একে একে আসতে থাকে আর সবাই। ভারত আর পাকিস্তান কূটনীতিক পর্যায়ে খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করে। ভারত প্লেন তৈরি করে, তাই না? তারাও অ্যাটম ভাঙতে পারে। পাকিস্তান প্লেন হয়তো তৈরি করে না, কিন্তু করতে কতক্ষণ? তারাও অ্যাটম ভাঙতে পারে বলে জোর গুজব রয়েছে বাজারে। ফর্মুলাটা পেয়ে, ওরা যদি অ্যাটমিক প্লেন তৈরি করে, ফলাফলটা সহজেই অনুমেয়। ভারত বা পাকিস্তানের এয়ারফোর্স, এক কথায়, রাতারাতি অজেয় হয়ে উঠবে। সেই সাথে রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স আর ব্রিটেনের এয়ারফোর্স, বলা যায়, তাৎপর্য হারিয়ে ফেলবে। কিংবা, যদি আমেরিকা পেয়ে যায় ফর্মুলাটা…'

'কে পেলে কি ঘটতে পারে, সেটা বরং রানাকে কল্পনা করে নিতে দাও,' সোহেলকে পরামর্শ দিলেন রাহাত খান। 'ওকে জিজ্ঞেস করো, ওর কোন প্রশ্ন আছে কিনা।'

'প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান তাহলে ওই একটা বিষয়েই গবেষণা চালাচ্ছে?'

'না-না,' মাথা নাড়ল সোহেল। 'ওটা মূল সমস্যা, কিন্তু একমাত্র বলা যায় না। সমস্যা আরও অনেক আছে, এক এক করে সেগুলোরও সমাধান করা হচ্ছে।' ফাইলের গায়ে টোকা দিল সে। 'কি রকম ঢাউস দেখছিস না? প্রতিটি বিষয়ে বিশদ তথ্য দেয়া আছে…'

মুখ তুলে রাহাত খানের দিকে তাকাল রানা। 'স্যার, আমি বোধহয় কাজ শুরু করে দিতে পারি।'

'আমারও তাই ধারণা। দেরি করা উচিত হবে না।' সোহেলের দিকে তাকালেন রাহাত খান। 'সোহেল, ভারত থেকে ফিরে রানা যা বলছে, তা থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে–প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ানে যারা কাজ করছে তাদের মধ্যে একজন বেঈমান আছে। বিজনেস সিন্ডিকেট প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান থেকে কিছু একটা চুরি করে নিয়ে গেছে। সেটা কি হতে পারে, রানা জানতে পারেনি। ধরে নিতে হয়, ফর্মুলাটাই।'

সোহেলের দিকে ফিরল রানা। 'শীল্ড তৈরিতে যারা কাজ করছে, তাদের সম্পর্কে তোর ফাইলে কিছু আছে?'

ফাইল ঘেঁটে সবুজ একটা কাগজ বের করল সোহেল। 'এই নে। হেডিংটা দেখ–রিসার্চ প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান। তিনজন বিজ্ঞানী কাজ করছে, সবার সম্পর্কে যা কিছু জানার সব এতে লেখা আছে।'

'আচ্ছা, মাত্র তিনজন লোক…?'

সোহেল বলল, 'এই তিনজন হলো মাস্টার মাইন্ডস। হেড অভ প্রজেক্ট–রিয়াজুল হাসান, বয়স পঁয়তাল্লিশ। সুব্রত বড়ুয়া, বত্রিশ। আর, শারমিন চৌধুরী, আটাশ। রিয়াজুল হাসান অ্যারোনটিক্যাল এঞ্জিনিয়ার, বাকি দু'জন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট।'

'বেশ,' বলল রানা। 'কোথায় গেলে পাব ওদের?'

'চট্টগ্রামে,' মৃদু হেসে বলল সোহেল। 'এয়ারফোর্সের ল্যাবটা ওখানেই। ওটা এয়ারফোর্সের হলেও, ওরা কেউ এয়ারফোর্সের লোক নয়–বলতে পারিস, আমন্ত্রিত

গবেষক। এয়ারফোর্সের বহু টেকনিশিয়ান ওদেরকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু সরাসরি গবেষণা বা ল্যাবের সাথে ওরা তিনজনই শুধু জড়িত।'

'তুমি তাহলে, রানা,' রাহাত খান বললেন, 'আজকালকের মধ্যেই চট্টগ্রামে চলে যাও। সোহেল, ওদের তিনজন সম্পর্কে তৈরি করা ডোশিয়ে থাকলে একটা করে কপি দাও ওকে।'

'জ্বী, স্যার। আরেকটা কথা···ভাবছিলাম, এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্সকে ব্যাপারটা জানাব কিনা। ওরা হয়তো রানাকে সাহায্য করতে পারত।'

'উহুঁ,' সাথে সাথে আপত্তি তুলল রানা। 'ওদের আমি চিনি। যদি জানতে পারে ওদের একটা আউট-কিটে বেঈমান আছে, গোটা এলাকা সীল করে দেবে—ধারে কাছে আমি ঘেঁষতেই পারব না। উঁহুঁ, ওদেরকে না জানানোই ভাল।'

মুচকি একটু হেসে রাহাত খান সমর্থন করলেন রানাকে। 'ও ঠিকই বলেছে। বেঈমান একজন আছে, এটা আমরা যখন আবিষ্কার করেছি, তাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব ও কৃতিত্ব আমরাই নেব, আর কাউকে নাক গলাতে দেই কেন?'

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কনফিডেনশিয়াল
ডিভিশন ফাইভ
রিয়াজুল হাসান
জন্ম তারিখ: আটাশে ডিসেম্বর, ১৯৪৩, ইংরেজি।
জন্মস্থান: খুলনা।
দৈহিক বর্ণনা: উচ্চতা—পাঁচ ফুট নয়ইঞ্চি। চোখ—কালো। চুল—কালো। বিশেষ চিহ্ন—বাঁ হাতের দ্বিতীয় আঙুল কাটা।
সাধারণ বিবরণ: নামকরা ডাক্তারের বড় ছেলে। খুলনায় দু'জন বিবাহিতা বোন আছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি, হার্ভার্ড আর ম্যাসাচুসেটস-এর ইনস্টিটিউট অভ টেকনোলজিতে অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। জেনারেল ডায়নামিক করপোরেশনে তিন বছর চাকরি করেছে। নিজের কাজের প্রতি নিবেদিত সুদক্ষ টেকনিশিয়ান। রাজনীতিতে সক্রিয় নয়। উনিশশো ছেষট্টি সালে সুফিয়া খাতুনকে বিয়ে করে, সাত বছর পর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, কোন সন্তান নেই। চারিত্রিক কোন দুর্বলতার কথা জানা যায়নি। ড্রাগস, মদ বা আফিম, কিছুই খায় না। ধূমপান করে, খুব বেশি নয়। আর্থিক অবস্থা ভাল। গাড়ি আছে, টয়োটা। পৈত্রিক সম্পত্তি ও বাড়ি আছে খুলনায়। মাসিক আয়, সব মিলিয়ে ত্রিশ হাজার টাকার মত।
বর্তমান ঠিকানা: টাইগার পাস, ২৭ নং কদমতলী, চট্টগ্রাম।

রানার মনে হলো, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী রিয়াজুল হাসান একটু বোধহয় বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপন করে। বাংলাদেশ বিমানের প্রথম শ্রেণীর টিকেটে ভ্রমণ করছে ও, চট্টগ্রামের উদ্দেশে মাঝপথে রয়েছে। দ্বিতীয় ডোশিয়েটা তুলে নিল ও।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কনফিডেনশিয়াল

ডিভিশন ফাইভ
সুব্রত বড়ুয়া
জন্ম তারিখ: তেসরা এপ্রিল, ১৯৫৬, ইংরেজি।
জন্মস্থান: ঢাকা।
দৈহিক বর্ণনা: পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি। চোখ–কালো। চুল–একটু লালচে। বিশেষ চিহ্ন–ডান কপালে সামান্য কাটা দাগ। চশমা পরে। সাধারণ বিবরণ: বাবা এঞ্জিনিয়ার। এক বোন কলেজে পড়ে। ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করার পর আমেরিকায় পড়তে যায়। ফিলাডেলফিয়ার স্কুল অভ অ্যারোনটিকস থেকে ডিগ্রী নিয়ে নিউক্লিয়ার প্রপালশন সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। একাধিক মার্কিন বিমান তৈরি কারখানায় চাকরি করে। পরে রাশিয়া সরকারের আমন্ত্রণে মস্কোয় একটা গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করে। তার রাজনীতি সচেতনতা সম্পর্কে জানা গেছে, সর্বহারা পার্টির সাথে বেশ কিছুদিন যোগাযোগ ছিল, পরে কাজের ব্যস্ততায় ও দেশে অনুপস্থিত থাকার দরুন যোগাযোগ একরকম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোন ধর্মের প্রতিই দুর্বলতা নেই। অবিবাহিত, মেয়েদের সঙ্গ ভারি পছন্দ করে। জুয়া খেলে না, সামান্য মদ খায়, সিগারেট খায় প্রচুর। বেশ সচ্ছল। পুরানো একটা গাড়ি আছে–ফোক্সওয়াগেন। মাসিক আয় বিশ হাজার টাকার নিচে নয়। সব খরচ হয়ে যায়। বর্তমান ঠিকানা: ৯/৮ নং স্ট্যান্ড রোড, চট্টগ্রাম।

ডোশিয়েটা নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরাল রানা, তারপর শেষ কাগজটা তুলে নিল।

বাংলদেশে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স কনফিডেনশিয়াল
ডিভিশন ফাইভ
শারমিন চৌধুরী
জন্ম তারিখ: পয়লা জানুয়ারি, ১৯৬০, ইংরেজি।
জন্মস্থান: দিনাজপুর।
দৈহিক বর্ণনা: পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। চোখ–কালো। চুল–কালো। বিশেষ চিহ্ন–নেই। সাধারণ বিবরণ: বাবা উকিল ছিলেন, '৭৮ সালে মারা গেছেন। মা এখনও বেঁচে আছেন, কর্মচারীদের সাহায্যে দিনাজপুরে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি চালান। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিল। ঢাকায় পড়াশোনা শেষ করার পর ভারত ও রাশিয়ায় নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ওপর পি.এইচ.ডি. করেছে। ফ্রান্সের একটা বিমান তৈরির কারখানায় দু'বছর গবেষণা চালিয়েছে। তার আগে জেনারেল ডায়নামিক করপোরেশনেও চাকরি করেছে এক বছর। রাজনীতি সম্পর্কে কোন উৎসাহ নেই। '৮০ সালে বিয়ে, '৮২ সালে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় স্বামীর সাথে। সন্তান নেই। ছেলে-বন্ধু অনেক, তবে কারও সাথেই এখনও তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই। মদ সিগারেট খায় না, অন্য কোন নেশাও নেই। পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত ভাল। গাড়ি আছে, ডাটসান, নিজেই ড্রাইভ করে। ব্যক্তিগত মাসিক আয় পনেরো হাজার টাকা। খরচ করে আরও বেশি।

বর্তমান ঠিকানা: কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, পাঁচতলা ৪৭/বি, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

পড়া শেষ করে সীটে হেলান দিল রানা, চোখ বুজল। খুব বেশি কিছু জানা গেল না। সর্বহারা পার্টির সাথে সুব্রত বড়ুয়ার সম্পর্ক, চট্টগ্রামে তার আর শারমিন চৌধুরীর কাছাকাছি এলাকায় বাস করা, এবং শারমিন চৌধুরী আর রিয়াজুল হাসানের প্রায় একই সময়ে জেনারেল ডায়নামিক করপোরেশনে চাকরি করা, এগুলোর বিশেষ তাৎপর্য থাকতে পারে, আবার না-ও থাকতে পারে।

তাহলে চট্টগ্রামে পৌঁছে প্রথম করণীয় কি? বিজনেস সিন্ডিকেট যে তার ইনফরমারকে সতর্ক করে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে যদি বুদ্ধিমান হয়, ভুল-ভ্রান্তি যা কিছু করেছে সব মুছে ফেলে ওর অপেক্ষায় তৈরি হয়ে থাকবে। রানার মনে হলো, সূক্ষ্ম কোন কৌশল এক্ষেত্রে তেমন কাজ দেবে না। বরং খোলাখুলি আলোচনা করাই ভাল, আচরণে আক্রমণাত্মক একটা ভাব নিয়ে–সব মিলিয়ে যেন মনে হয়, চীনামাটির দোকানে একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড় ঢুকে পড়েছে।

রণকৌশল স্থির করার পর বাকি সব পানির মত সহজ হয়ে গেল। সরাসরি রিয়াজুল হাসানের সাথে তার বাড়িতে দেখা করবে ও, সমস্যা আর তদন্তের বিষয়টা তাকে জানাবে, তারপর তার মতামত চাইবে। রিয়াজুল হাসান বেঈমান হোক বা না হোক, তার বক্তব্য থেকে দরকারী অনেক তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

## ছয়

টাইগার পাস, কদমতলী রোড। শহরের এই অংশ দিয়ে রেললাইন চলে গেছে, রাস্তা থেকে লাইনটা বেশ উঁচু, দু'পাশের বাড়িগুলোর দোতলার সাথে একই লেভেলে। শুক্রবার, ছুটির দিন, রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। সাতাশ নম্বর কদমতলী খুঁজে বের করতে অসুবিধে হলো না। খানিকটা দূরে গাড়ি পার্ক করে নিচে নামল রানা। বাড়ির চেহারা পছন্দ হওয়ার মত নয়, অনেকদিনের পুরানো। বাড়ির সামনে রাস্তা, তারপর উঁচু রেললাইন। রিয়াজুল হাসানের মত একজন বিজ্ঞানী এখানে থাকে কেন? বিশেষ করে আরও ভাল কোন এলাকায়, নিরিবিলি পরিবেশে বাড়ি ভাড়া করার সামর্থ্য যখন রয়েছে? রেলগাড়ির শব্দ শুনতে পছন্দ করে নাকি? ট্রেন আসাযাওয়া করার সময় বাড়িটা যে কাঁপে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্রেফ অভ্যেসবশত একতলা বাড়িটার সামনে দিয়ে একবার হেঁটে গেল রানা। সামনে একটা বস্তি শুরু হতে যাচ্ছে দেখে ফিরে এল ও। ফিরছে, শব্দ শুনে বুঝল একটা ট্রেন আসছে। জুতোর তলায় কংক্রিটের রাস্তা কাঁপতে শুরু করল। আশ্চর্য, একজন বিজ্ঞানী এখানে বাস করে: একটা লন্ড্রি পেরিয়ে এসে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, হাতে থলে নিয়ে বাজারে যাচ্ছে কয়েকজন লোক। রাস্তার এক ধারে গোল্লাছুট খেলছে চার-পাঁচটা ছেলে। মাথায় ঝাঁকা ভর্তি ডাব নিয়ে এগিয়ে

আসছে একজন ফেরিওয়ালা। একটা বাড়ি থেকে এক মহিলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'লাটসাহেবরা এক একজন এক এক সময় নাস্তা করবে, আমি আর পারি না, বাপু! বিয়ে করে ঘরে বউ আন্, আমি আর এই বয়সে বাঁদী-দাসীর মত খাটতে পারব না!'

উপায় ছিল না, ও যে আসছে সেটা জানাতে হয়েছে রিয়াজুল হাসানকে। প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ানের সিকিউরিটি রুলস, অফিশিয়াল অনুমোদন ছাড়া কারও কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না টেকনিশিয়ানরা। রিয়াজুল হাসানকে তাই জানানো হয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একজন প্রতিনিধি, মেজর শফিকুর রহমান, সকাল দশটার দিকে তার সাথে দেখা করতে আসবে। উদ্দেশ্য এটা-সেটা নিয়ে আলাপ করা।

সদর দরজার সামনে দাঁড়াল রানা, চাপ দিল কলিংবেলের বোতামে।

কয়েক সেকেন্ড পর একটা পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল, 'কে?'

'শফিকুর রহমান।'

সাথে সাথে খুলে গেল দরজা। একহারা গড়নের, প্রাণ চঞ্চল এক লোক ঝট করে বাড়িয়ে দিল একটা হাত, বলল, 'ঢুকে পড়ুন, আমি রিয়াজুল হাসান।' সামনের কামরাটা অন্ধকার মত, কোন ফার্নিচার নেই। বিজ্ঞানীর পিছু পিছু পাশের কামরায় চলে এল রানা। এটাই ড্রইংরুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সোফা, কালার টিভি, ডেক সেট, মেঝেতে কার্পেট, সবই আছে। ঢুকেই লক্ষ করল রানা, দুটো মাত্র জানালা, দুটো থেকেই রেললাইন দেখা যায়।

'বসুন, মেজর রহমান। চা খাবেন তো?'

'না, ধন্যবাদ,' সিঙ্গেল একটা সোফায় বসে বলল রানা।

'তাহলে কফি?'

'প্লীজ, না!'

'তাহলে একটা সিগারেট,' বলে নিচু টেবিল থেকে স্টেট এক্সপ্রেসের প্যাকেটটা তুলে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল রিয়াজুল হাসান, তার এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ খুঁটিয়ে লক্ষ করছে রানাকে।

প্রথমদর্শনে বিরূপ কোন অনুভূতি জাগল না, রিয়াজুল হাসানকে বরং ভালই লাগল রানার। মুখটা বড়সড় বা থমথমে কোন ব্যাপার নয়, দৃষ্টি কাড়ার মত বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। সরু লম্বাটে খুলি। ঝরতে শুরু করা চুলের নিচে চওড়া কপাল, লম্বা নাক, নাকের নিচে মুখের অংশটা প্রাণবন্ত, কোণগুলোয় অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটে আছে। তবে গোটা চেহারায় নির্লিপ্ত একটা ভাব রানার দৃষ্টি এড়াল না, যেমন সাধারণত বুদ্ধিজীবীদের চেহারায় দেখা যায়। চেহারাই বলে দেয়, যে-কোন সমস্যাই সামনে আসুক, সে তার ক্ষুরধার বুদ্ধির সাহায্যে সেটার প্রকৃতি অনুধাবনে সমর্থ, তার জানা আছে চিন্তাধারাকে কোন্ পথে পরিচালিত করলে সমাধান আয়ত্তে আসবে।

হাঁটাচলায় ক্ষিপ্র একটা ভঙ্গি লক্ষ করল রানা। সামান্য নার্ভাস বলেও মনে হলো। কাঠের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল সে, নিজেকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে। ঠোঁট থেকে আগের চেয়ে একটু বিস্তৃত হয়েছে হাসিটা।

'বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি।'

'ছুটির দিন, এত সকালে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনি হয়তো বাইরে কোথাও যেতেন…'

'না-না, বাইরে যাব কি, কত কাজ পড়ে রয়েছে,' দক্ষ টেনিস খেলোয়াড়ের মত নেটের ওপর দিয়ে রানার দিকে বলটা পাঠিয়ে দিল রিয়াজুল হাসান, পরবর্তী আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঠিক তখুনি আবার ট্রেন আসার শব্দ হলো। ঝন ঝন করে উঠল জানালার শার্সি, টেবিলের ওপর নাচতে শুরু করল ছাইদানি। ট্রেন চলে যাবার পর হেসে উঠে রানা বলল, 'কি বলব, স্নায়ুবিদারক? আপনি সহ্য করেন কিভাবে?'

'কি, আওয়াজটা? না, কেন! আমি তো টেরই পাই না!'

'ভূমিকম্প, কামানের গর্জন, এ-সবের মধ্যেও আপনি কাজ করতে পারেন?'

'পারছি তো,' হালকা সুরে বলল রিয়াজুল হাসান, একটু যেন গর্বের সুরেই। 'যে-কোন পরিবেশে কাজ করতে পারি আমি।'

'ভাগ্যবান।'

'ঠিক তা নয়। গুরুত্ব দিলে কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে এমন হাজার হাজার জিনিস আছে। নিজের কাজে এত ব্যস্ত থাকি, আমার কাছে আর কিছুর কোন গুরুত্ব নেই।'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ কাটল। রানা ঠিক করল, প্রসঙ্গটা সরাসরি পাড়বে। রিয়াজুল হাসানের ওপর চোখ রেখে নিরপেক্ষ সুরে বলল, 'আমার আসার কারণটা বলা দরকার। ব্যাপারটা জিরো-জিরো-ওয়ান প্রজেক্টকে নিয়ে। আমাদের বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে ওখান থেকে ইনফরমেশন পাচার হচ্ছে।'

আকস্মিক উদ্বেগ বা অপরাধবোধ, চেহারায় কোনটাই ফুটল না, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল রিয়াজুল হাসান, কুঁচকে উঠল ভুরু। 'তাই? কি ইনফরমেশন?'

'অ্যাটমিক এয়ারক্রাফট সম্পর্কে—নতুন লাইট-ওয়েট যে শীল্ডটা আপনারা তৈরি করছেন, র‍্যাডিয়েশন ঠেকানোর জন্যে।'

ঝট করে কপালে উঠে গেল রিয়াজুল হাসানের ভুরু জোড়া, কয়েক সেকেন্ড চিন্তিত দেখাল তাকে, তারপর শান্তভাবে বলল, 'সব কথা বলুন আমাকে।'

'বলার তেমন কিছু নেই। আমরা শুধু জানি, একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট ফর্মুলাটার বিশদ বিবরণ পেয়ে গেছে।'

'ক্রাইম সিন্ডিকেট? বিশদ বিবরণ?'

'সিন্ডিকেটের হেডকোয়ার্টার পাকিস্তানে,' বলল রানা। 'তবে ভারত বাংলাদেশসহ সব ক'টা সার্ক দেশেই তৎপর তারা। জিরো-জিরো-ওয়ানের ফর্মুলাটা পাচার হয়েছে ভারতে।'

রানার মুখে কি যেন খুঁজল রিয়াজুল হাসান। কয়েক সেকেন্ড কিছু বলল না। গভীর চিন্তামগ্ন দেখাল তাকে। অবশেষে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ঠিক জানেন? অ্যাবসলিউটলি পজিটিভ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কাছে প্রমাণ আছে?'

'আছে।'

মাথা নাড়ল রিয়াজুল হাসান, কিন্তু কারণটা বোঝা গেল না, যেন রানার সাথে একমত হতে পারছে না। সব মিলিয়ে তার প্রতিক্রিয়ার তাৎপর্য উপলব্ধি করা কঠিন মনে হলো রানার কাছে। চেয়ারে হেলান দিল সে, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সিলিঙের দিকে, চেহারায় ফুটে উঠল হতভম্ব একটা ভাব। 'ওহ্ গড! দ্যাট'স টেরিবল!' কিন্তু সবটাই তার অভিনয় হতে পারে, অন্তত সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। অবশ্য তার পরবর্তী কথাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, নির্দোষ একজন লোকের কাছ থেকে আশা করা যায়। 'আমার কাছে এসে আপনি ভাল করেছেন,' বলল সে। 'বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারছি না। দেখুন, আমরা মাত্র তিনজন কাজ করছি প্রজেক্টটায়। তাছাড়া, অত্যন্ত কড়া গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। এ-ধরনের একটা ব্যাপার কিভাবে ঘটতে পারে···'

'কিন্তু ঘটেছে। প্রথমে এটা ভালভাবে গেঁথে নিন মগজে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে না। কিন্তু কিভাবে? আমার দুই সহকর্মী এবং নিজের ব্যাপারে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি, তাহলে···' মুখটা অস্বাভাবিক হাঁ হয়ে গেল রিয়াজুল হাসানের, তাড়াতাড়ি ফাঁকটা বন্ধ করার চেষ্টা করল সে, রীতিমত নার্ভাস। '···না, হ্যাঁ—তারমানে, আমরা তিনজনও সন্দেহের বাইরে নই!'

রানা কিছু বলল না।

'তাহলে তো ব্যাপারটা জটিল হয়ে যাচ্ছে,' বলল রিয়াজুল হাসান। 'আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই, অন্তত আমি তো চাই-ই, কিন্তু আপনি যদি আমাদেরকে সন্দেহ করেন, বলছি না সেটা অন্যায়, কিন্তু তাহলে আমরা কিভাবে আপনাকে সাহায্য করব?'

এবারও কিছু বলল না রানা।

রেগে গেল রিয়াজুল হাসান। 'আপনি কি ভাবছেন সেটা আমাকে জানতে হবে না? বেশ তো, কি জানতে এসেছেন জিজ্ঞেস করুন। উত্তর দেয়ার সুযোগ পেলে কৃতজ্ঞ বোধ করব। আমি প্রজেক্ট চীফ, আমাকে দিয়েই শুরু করতে চান, গো অ্যাহেড!'

লোকটার প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক বলে মনে হলো রানার। 'আপনাকে আমি উদ্বেগ থেকে এখুনি মুক্ত করতে পারি, হাসান সাহেব। না, আপনাকে আমরা সন্দেহ করি না। করলে আপনার কাছে আসতাম না। আমি এসেছি আপনার সাহায্য চাইতে।'

'রাইট। গুড। কৃতজ্ঞ বোধ করছি। বলুন, কি সাহায্য চান।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আসুন তাহলে, প্রথমে আমরা চুরি যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলি। আপনারা তিনজন ছাড়া টেকনিশিয়ানদের আর কেউ কি ঢুকতে পারে ল্যাবে?'

'না, ভুলেও আর কারও ঢোকার উপায় নেই।'

'ঠিক জানেন?'

'ঠিক জানি। সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট অত্যন্ত কড়া। দরজার চাবি মাত্র একটা,

সেটা একা শুধু আমার কাছে থাকে। কোন কারণেই কাউকে সেটা আমি দিই না। ল্যাবের ভেতর ঝাড়ুদার, মেথর, টেকনিশিয়ান, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, এমনকি প্রজেক্ট ডিরেক্টরেরও ঢোকার অনুমতি নেই।'

'তাহলে ঝাড়া-মোছার কাজটা কে করে?'

'আমরাই করি—অবশ্য আমাদের হাতে ঝাড়ু দেখলে সেটা কেড়ে নেয় শারমিন,' হেসে ফেলে বলল রিয়াজুল হাসান।

'আচ্ছা।'

'আমার মনে হয়,' পরামর্শ দিল রিয়াজুল হাসান, 'আপনি বরং একবার ল্যাবে আসুন, নিজের চোখে দেখুন সব। আমি নিশ্চিতভাবে জানি চুরি হবার কোন উপায় নেই, তবে এ-ও বুঝি যে আরও নানা প্রশ্ন আছে—ডুপ্লিকেট চাবি, চোরা পথ, ইত্যাদি। বিশ্বাস করুন, সিকিউরিটি সিস্টেমে আপনি যদি কোন ত্রুটি বের করতে পারেন, আমি খুশিই হব।'

'কারণ তাহলে আপনার সহকর্মীরা সন্দেহমুক্ত হতে পারেন?'

'বাহ! প্রজেক্টের হেড হিসেবে আমি আমার সহকর্মীদের সন্দেহের ঊর্ধ্বে দেখতে চাইব না?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। যাবার ইচ্ছে আমারও ছিল, তাহলে কাল সকালে আসি?'

'আসুন।'

'আপনার সহকর্মীদের সম্পর্কে দু'একটা কথা। সুব্রত বড়ুয়া—তিনি কি মনে করেন, রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর প্রথম জীবনের বিশ্বাস ভুল ছিল?'

ঠোঁট কামড়ে মুহূর্তের জন্যে চিন্তা করল রিয়াজুল হাসান, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'খুব সতর্কতার সাথে মন্তব্য করা দরকার, তাই না? সত্যি কথা বলতে কি, রাজনীতি সম্পর্কে কোন কথাই তাকে আমি কখনও বলতে শুনিনি। কাজের প্রতি সাংঘাতিক নিবেদিত সে। তাকে আমি পছন্দ করি, কারণ, অত্যন্ত খোলামেলা স্বভাবের লোক সে, উদার। ফর গডস সেক, সুব্রত যদি বেঈমান হয় তাহলে নিজেকেও আমি বিশ্বাস করতে পারি না! কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করেন, রাজনীতি সম্পর্কে তার ধারণা পাল্টেছে কিনা, পাল্টালে কেন পাল্টেছে—দুঃখিত, এ-ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।'

'ফেয়ার এনাফ।' সোফা ছাড়ল রানা, বাড়িয়ে দিল হাতটা। 'আপনাকে আর বিরক্ত করব না, হাসান সাহেব। কাল সকালে দেখা হবে। পরস্পর সম্পর্কে একটা ধারণা হয়েছে আমাদের, আমি আশা করব তদন্তে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

'সব্বব্য সব রকম,' আশ্বাস দিয়ে বলল রিয়াজুল হাসান, দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল রানাকে।

'আরেকটা কথা,' বলল রানা, দরজার নবে হাত। 'ল্যাবরেটরিটা আমাকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে দিন, কেমন? আমি যাব বলে গোছগাছ করার দরকার নেই, কোন দরজা বন্ধ করার দরকার নেই সাধারণ অবস্থায় যেটা খোলাই রাখা হয়...'

মৃদু হেসে রিয়াজুল হাসান মাথা ঝাঁকাল। 'বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে। গুড

বাই।'

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে গাড়ির দিকে হাঁটছে রানা, সাক্ষাৎকারটা কেমন হলো চিন্তা করছে। কয়েকটা প্রশ্ন করল নিজেকে। ফ্ল্যাটটায় কি অস্বাভাবিক কিছু দেখেছে ও? না। রিয়াজুল হাসানকে সন্দেহ করার মত কিছু ঘটেছে? না। তার কথা, সুর, শব্দচয়ন, মুখভঙ্গি, দৃষ্টি, এ-সব কি ওর মনে কোন খটকা সৃষ্টি করেছে? গভীরভাবে চিন্তা করল রানা, সিদ্ধান্তে পৌঁছুল—না। কিন্তু তারপরই মজার একটা প্রশ্ন উদয় হলো মনে। রিয়াজুল হাসানের জায়গায় যদি সে হত, আর সে যদি অপরাধী হত, রিয়াজুল হাসান যে আচরণ করেছে সে-ও কি ঠিক সেই একই আচরণ করত না? উত্তরটা পেতে দেরি হলো না—হ্যাঁ।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রানা। খানিকদূর এগিয়ে বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়ল সরু একটা গলিতে। পাশের সীটের সামনে, ড্যাশবোর্ডের তলায় ছোট্ট একটা ট্র্যান্সমিটার রয়েছে, হাত বাড়িয়ে সেটার সুইচ অন করল। 'ওয়ান-ওয়ান-সেভেন কলিং টার্কি…ওয়ান-ওয়ান-সেভেন কলিং টার্কি…'

যান্ত্রিক শব্দকোলাহল শোনা গেল, তারপর একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'টার্কি শুনতে পাচ্চে। খুব মজা লাগচে, স্যার। বলে দিন কি করতে হবে।'

'এইমাত্র রিয়াজুল হাসানের সাথে কথা হলো। তার বাড়ির সামনে পাহারা বসাতে হবে। যদি বাইরে বেরোয়, পিছু নিতে হবে। যা যা দরকার, ভ্যানে সব নিয়েছ তো? কেউ যদি নিচের গেট দিয়ে বাড়িটায় ঢোকে, তার ফটো তুলতে হবে। টেলিফোনে আড়িপাতার ব্যবস্থা করেছ?'

'সব কুচ ঠিক হ্যায়, স্যার। ট্রেনিং লিয়েচি এমনি নাকি! আমাকে হব্বা ভাবার কোন কারণ নেই। টেলিফোন লাইনে কারিগরি ফলাতে পাঠিয়েচি মাসুমকে। আর কিছু, স্যার?'

'কাল সকাল ন'টায় রিপোর্ট কোরো আমাকে। আউট।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করল রানা, স্টার্ট দিল গাড়ি, গলি থেকে বেরিয়ে এসে হোটেলের পথ ধরল। ফাঁদ পাতা হয়েছে, এখন দেখা যাক কে তাতে পা দেয়।

শফিকুর রহমান ওরফে মাসুদ রানা হোটেল সেভেন স্টারে দিলীপ সরকার নামে উঠেছে—পেশা, লবণ ব্যবসা। হোটেলটা আগ্রাবাদ কমার্শিয়াল এরিয়ায়। সকাল ঠিক ন'টার সময় ওর সাথে দেখা করতে এল টার্কি ওরফে গিলটি মিয়া।

চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়স গিলটি মিয়ার। খর্বকায়, ফড়িঙের মত ছটফটে। ভাঙাচোরা, তোবড়ানো মুখে তার চোখ জোড়া এত বেশি সরল যে বেমানান লাগে। ওস্তাদ লোক ছিল, রানার কাছে প্রতিজ্ঞা করে চুরির মহৎ পেশা ত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু দুর্বল মুহূর্তে স্বীকার করে যে এখনও তার হাত নিশপিশ করে। রানার প্রতি তার ভক্তির কোন সীমা-পরিসীমা নেই। গিলটি মিয়ার প্রতি রানার দরদ কতটুকু তা-ও মাপজোক করা সম্ভব নয়। অবশ্য এখন আর গিলটি মিয়া আগের মত নেই, রানা তাকে নিজের সাথে রেখে যতটা সম্ভব শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছে। বেশ ক'বার রানার সাথে বিদেশে গেছে সে। পাঁচ-সাতটা ভাষার সংমিশ্রণে নিজেই অদ্ভুত এক

জগাখিচুড়ি ভাষা তৈরি করে নিয়েছে, মজার কথা হলো তার সেই ভাষা বিদেশীরা বেশ বুঝতেও পারে।

'এসে গেচি, স্যার, বান্দা হাজির, রিপোর্ট লিয়ে আসতে বলেছিলেন না!' চারদিক তাকাল গিলটি মিয়া। 'বাহ্, কামরাগুলো দেকচি ভারী সুন্দর!'

হাতের দৈনিক পত্রিকাটা, পূর্বকোণ, বিছানার ওপর রেখে মুখ তুলল রানা। 'রাতে কিছু ঘটেছে?'

ঢোলা ট্রাউজারটা এক হাতে কোমরের কাছে ধরে আছে গিলটি মিয়া, অপর হাতটা পকেটে ভরে কয়েকটা কাগজ বের করল। ছেড়ে দিতেই কোমর থেকে খানিকটা নেমে গেল ট্রাউজার, খালি হাতটা দিয়ে মাথা চুলকাল সে। তারপর মেশিনগানের মত চালু হলো তার মুখ, 'বেলা সাড়ে বারোটার দিকে, বুঝলেন স্যার, মানে কালকের কতা বলচি, রিয়াজ সাহেব বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে এলেন একটা হোটেলে, হোটেল সাকিনায়। ওকানে বসে একা একা লাঞ্চ খেলেন। কি কি খেয়েচেন, বলব?'

'না।'

'একানে সব লেকা আচে, স্যার।'

'বেশ তো। ফাইলে রেখে দিয়ো।'

'দেড়টার সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে, বাড়ি ফিরলেন একটা বিয়াল্লিশ মিনিটে। পৌনে তিনটে পর্যন্ত সব চুপচাপ। তারপর এক মেয়েমানুষ তাকে ফোন করল। কি কি কতা হলো বলচি।'

কাগজ-পত্র নেড়েচেড়ে খুক করে কেশে তৈরি হলো গিলটি মিয়া।

রিয়াজ: "হ্যাঁ।"

মেয়েমানুষ: "কেমন আচো তুমি, হাসান ভাই? সময়টা কেমন কাটচে তোমার আজ?"

রিয়াজ: "কোনো রকম। বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি ফোন করতে যাচ্ছিলাম। এক কাপ চা হলে মন্দ হত না, কি বলো?"

মেয়েমানুষ: "কি, আমার একানে?"

রিয়াজ: "হ্যাঁ।"

মেয়েমানুষ: "বেশ। খুশি হলাম। ককোন আসচো তাহলে?"

রিয়াজ: "সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে। ঠিক আচে?"

মেয়েমানুষ: "হ্যাঁ, ঠিক আচে। আমি তাহলে অপেক্কা করচি। ওহ্ হো, ভাল কতা, হাসান ভাই···না, মানে, থাক—তারচেয়ে বরঞ্চ দেকা হলেই বলব, কেমন?"

রিয়াজ: "হ্যাঁ, সেই ভাল—আমি হলেও তাই করতাম, দেকা না হওয়া পোজ্জন্ত অপেক্কা করতাম।"

মেয়েমানুষ: "তাহলে তাই কতা হলো। তুমি আসচো। তকনই কতা হবে।"

রিয়াজ: "খোদা হাফেজ।"

কাগজগুলো গুছিয়ে পকেটে ভরল গিলটি মিয়া, ট্রাউজারটা কোমর থেকে নেমে যাচ্ছে দেখে খপ করে ধরে ফেলল। 'আর কিছু জানা যায়নি, স্যার। মেয়েমানুষটা

নাম বলেনি। আমরা অপেক্ষা করছিনু, পাঁচটা বাজতে দশ মিলিট বাকি থাকতে রিয়াজ সাহেব বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে, গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে রওনা দিলেন। পিছু নিলাম আমরা। জুবিলী রোডে এলেন তিনি, থামলেন পাঁচতলা মেসের সামনে। সাতচল্লিশের বি, সেঁদিয়ে গেলেন ভেতরে।'

মেস নয়, ভাবল রানা, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল।

'মেয়েলোকটা কে, তকোনো আমরা জানি না,' বলে চলল গিলটি মিয়া। 'তারপর বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল। মেয়েলোকটাকে লিয়ে, থুড়ি-মেয়েলোক নয়, ছুঁড়ি···তাকে লিয়ে বেরিয়ে এলেন রিয়াজ সাহেব। তকোন সাড়ে ছ'টার মতন বাজে। রাস্তায় হাওয়া খেলেন দু'জন। মেসের সামনে ফিরে এসে রিয়াজ সাহেব গাড়ি লিয়ে একাই চলে গেলেন, ছুঁড়িটা মেসে না ফিরে উল্টোদিকে হাঁটতে লাগল। আমি আর আমার এক সাকরেদ, দু'জন পিছু নিলুম। রিয়াজ সাহেবের পিছু পিছু তার বাড়ি অবদি এলুম, রাতে আর তিনি বেরুননি, কোতাও ফোনও করেননি।'

'খেতে বেরুননি, ঠিক জানো?'

'না, স্যার। মনে হয় উপোস গেচেন।'

'আর মেয়েটা?'

'ছুঁড়িটাকে ফলো করে আমার এক সাকরেদ, বলেচিই তো। হেঁটে একা গ্যারেজে গেল, গাড়িটা বোধায় মেরামত করতে দিসলো, একটা লাল ডাটসান। গাড়ি লিয়ে সোজা চলে যায় ইস্ট্যান্ড রোডে।' কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করল গিলটি মিয়া। '৯/৮নং ইস্ট্যান্ড রোড, স্যার।'

'ইন্টারেস্টিং,' জনান্তিকে বলল রানা, মনে পড়ল ঠিকানাটা সুব্রত বড়ুয়ার। 'বলে যাও।'

'আদঘণ্টা পর ছুঁড়িটা এক ছোকরাকে লিয়ে বেরিয়ে এল। মাখখন চেহারা ছোকরার। এবার গাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরুলেন তেনারা। একটা চাইনীজ হোটেলে ঢুকে খাওয়াদাওয়া সারল। বাড়িতে ফিরলেন তেনারা রাত তকোন প্রায় বারোটার কাচাকাচি।'

'তোমার সাগরেদ ওদেরকে খেতে দেখেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেকেনি মানে!'

'না, আমি জিজ্ঞেস করছি, সে কি ওদের আচরণ কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে? ধরো, সেকি বলতে পারবে মেয়েটা সম্পূর্ণ ফ্রী ছিল কিনা? কথার মাঝখানে পরস্পরের হাত ধরেছে ওরা?'

'কার সাকরেদ দেকতে হবে তো! তাছাড়া, এত যত্তোর দিয়েচেন, ভেবেচেন সেগুলো ব্যবহার করব না? এই নিন, স্যার। দেকুন!' বলে পকেট থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করে রানাকে দিল গিলটি মিয়া।

অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা শারমিন চৌধুরীর। পানপাতা আকৃতির অবয়ব, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। যুবকের একটা বাহু আঁকড়ে ধরে হাসছে সে-হালকা বা মৃদু নয়, রীতিমত খিলখিল করে হাসছে, মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে যুবকের দিকে। 'কোথায় তোলা হয় ফটোটা?'

'চাইনীজ রেস্তোরাঁ থেকে যকোন বেরুচ্ছিল...'

রানা ভাবল, শারমিন চৌধুরীর সাথে সুব্রত বড়ুয়ার সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠ—ওরা কি পরস্পরকে ভালবাসে? 'তারপর, স্ট্যান্ড রোডে ফেরার পর কি ঘটল?'

'ছোকরা বাড়ির সামনে নেমে পড়ল, গাড়ি নিয়ে চলে এল ছুঁড়ি।'

'ব্যস?'

'আমার সাকরেদ তো তাই বলচে।'

'আর রিয়াজ সাহেব? রাতে তিনি বাড়ি ফিরলেন, তারপর কিছুই ঘটেনি?'

'আমার দুই সাকরেদকে বসিয়ে রেকে আমি একটু চোক বুজেচিলুম, স্যার। তারা বলচে, কেউ আসেনি বা যায়নি। রিয়াজ সাহেব কোতাউ ফোন করেননি বা কোন ফোন আসেনি।'

রানা চিন্তিত।

গিলটি মিয়া বলল, 'ঘাবড়াবার কিছু নেইকো, স্যার। আপনার রিয়াজ সাহেব ঠিকই পা দেবে ফাঁদে।'

দেবে কি?—ভাবল রানা। কে জানে, সম্ভবত রিয়াজুল হাসান সম্পূর্ণ নির্দোষ। ওরা তিনজনই হয়তো নিরপরাধ। দেখেশুনে এখন পর্যন্ত তাই মনে হচ্ছে বটে। তবে কোন প্রমাণ নেই, না এদিকে না ওদিকে। 'তোমার লোকজনের তো অভাব নেই, তাই না? আরও দু'জনকে কাজে লাগিয়ে দাও, তারা সুব্রত বড়ুয়া আর শারমিন চৌধুরীর ওপর নজর রাখবে।'

'আচ্ছা! আপনি তাহলে তেনাদেরও চেনেন! ঠিক আচে, স্যার, ঠিক আচে, আপনার কতা মতনই কাজ হবে।' দু'সেকেন্ডের মধ্যে কামরা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল গিলটি মিয়া।

ধীরে-সুস্থে কাপড় পরল রানা, হোটেলের গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে রওনা হলো বাংলাদেশ এয়ারফোর্স-এর ল্যাবরেটরি ভবনের উদ্দেশে। ঠিকানা দরকার নেই, কর্ণফুলী নদীর কিনারায় বিল্ডিংটা কোথায় জানা আছে ওর। অলসভঙ্গিতে গাড়ি চালাল ও, কেসটা নিয়ে ভাবছে। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, মানুষের মনের ভেতর কি ঘটছে তার সূত্র হিসেবে বাইরের আচরণ অত্যন্ত দুর্বল। সব মানুষকেই দৈনন্দিন জীবনে কিছু না কিছু গোপন রাখতে হয়, এভাবে বেশিরভাগ মানুষই মনের ভাব গোপন রাখার কৌশল আয়ত্ত করে ফেলে। প্রশ্নটা হয়ে ওঠে মাত্রার, কে কতটা স্বাভাবিক আচরণ করতে পারল। তবে এই কেসে মনে রাখতে হবে বেঈমান লোকটা জানে তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। আগেই সাবধান করে দেয়া হয়েছে তাকে। সে পুরুষ হোক বা নারী, তার প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়ার কথা? স্বভাবতই সে ভান করবে উদ্বেগের কোন কারণ ঘটেনি, এমনকি তারা শুক্রবার ছুটির সন্ধ্যায় চাইনীজ খেতেও যেতে পারে, হাসি না পেলেও হাসতে পারে খিলখিল করে।

এয়ারফোর্স-এর ল্যাবরেটরি ভবনে সাড়ে দশটায় পৌঁছুল রানা। গোটা বিল্ডিং উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, পাঁচিলের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। খানিক পর পর পাঁচিলের মাথায় তৈরি করা হয়েছে সেন্ট্রি বক্স, সেন্ট্রি বক্সের মাথায় সার্চলাইট বসানো

হয়েছে। কড়া পাহারা, তবে বাইরে থেকে কোন প্রহরীকে দেখতে পাওয়া গেল না। রানার পরিচয়-পত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হলো গেটে, দু'জন সিকিউরিটি অফিসার ওকে পৌঁছে দিল প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান-এর অফিসে। অফিসারদের একজন পকেট থেকে চাবি বের করে ইস্পাতের ভারী একটা দরজা খুলে দিল। খালি একটা ওয়েটিং রুমে ঢুকল রানা। প্রায় গোল আকৃতির ছোট আকারের কয়েকটা চেয়ার আর নিচু একটা টেবিল ছাড়া কামরায় কোন ফার্নিচার নেই। টেবিলটার ওপরে ফুলদানিতে তাজা গোলাপ রয়েছে। উল্টোদিকের দেয়ালে আরেকটা ভারী দরজা, সেটাও ইস্পাতের তৈরি। কয়েক সেকেন্ড পর ভেতর থেকে খুলে গেল দরজাটা। ওয়েটিং রুমে বেরিয়ে এল রিয়াজুল হাসান। সন্দেহ নেই, মেইন গেট থেকে টেলিফোনে খবর পেয়েছে সে।

'গ্ল্যাড টু সি ইউ, মেজর। আসুন, প্লীজ, এদিক দিয়ে।'

দরজার পর প্যাসেজ, প্যাসেজের শেষ মাথায় আরেকটা দরজা, ভেতরে রিয়াজুল হাসানের ল্যাবরেটরি। বেশ বড়সড় কামরা উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে, চারদিকে হরেক রকম সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট, কামরার দু'দিকে জানালা।

'আসুন, আমার সহকর্মীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। মিসেস শারমিন চৌধুরী, ইনি মেজর শফিকুর রহমান।'

শারমিন চৌধুরীই প্রথম হাত বাড়াল, হ্যান্ডশেক করার সময় রানার বুকের কাছে শিরশিরে একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। ফটোতে আসল রূপ ধরা পড়েনি, রক্ত-মাংসের শারমিন চৌধুরী আরও অনেক সুন্দর। ছোট ছোট নিখুঁত দাঁত, পটলচেরা চোখ, কর্সা চামড়ায় লাবণ্যের প্রলেপ। ধবধবে সাদা ব্লাউজটা তাকে নিষ্কলুষ দেবীর মহিমা দান করেছে। রানা লক্ষ করল, মেয়েটা তার চুলের রঙ পাল্টেছে। ঘন কালোর বদলে লালচে-কালো।

'হাউ ডু ইউ ডু? আপনি আসায় আমরা খুশি হয়েছি,' বলল শারমিন চৌধুরী, আন্তরিক, স্বতঃস্ফূর্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। তার হাসি আর শরীরের দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে এখানে আসার উদ্দেশ্য বেমালুম ভুলে গেল রানা।

'আর ইনি সুব্রত বুড়ুয়া।'

সাদা কোট পরা দীর্ঘদেহী যুবক জোরাল ঝাঁকির সাথে করমর্দন করল, কিন্তু কোন কথা বলল না। চওড়া, শক্তিশালী চোয়াল রানার দৃষ্টি এড়াল না। সুব্রত বুড়ুয়ার মুখটা ছোট, তবে বয়সের তুলনায় রেখা আর ভাঁজের সংখ্যা একটু বেশি। সোনালি ফ্রেমের চশমা তার চেহারায় অ্যাকাডেমিক একটা ভাব এনে দিয়েছে। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে তার গাম্ভীর্য আর ব্যক্তিত্ব।

রিয়াজুল হাসানের দিকে ফিরল রানা। 'আমার আসার কারণটা কি ব্যাখ্যা করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'প্রথমে আমি তাহলে কামরার চারদিকটা একবার দেখে নিই?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

বড় আকারের তিনটে টেবিল, ওপরে ড্রইং আর কাগজ-পত্র রয়েছে। ফাইলিং কেবিনেট রয়েছে দুটো, একটা বুককেস। পিছনের দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট–রিটর্ট, পিপেট, ফিউমকাবার্ড, গ্লাস কাবার্ডের ভেতর সূক্ষ্ম স্কেল, টিউব আর কনডেনসার নিয়ে কন্টেইনার, বানসনবার্নার, আরও কত কি। কিন্তু এগুলো সম্পর্কে রানার কোন আগ্রহ নেই। সরাসরি জানালার দিকে এগোল ও। ভেতর দিক থেকে তারের জাল দিয়ে ঘেরা ওগুলো।

'জাল কি ইস্পাতের তৈরি?'

'হ্যাঁ,' বলল রিয়াজুল হাসান।

'জানালা কি কখনও খোলা হয়?'

'না। কামরাটা এয়ার-কন্ডিশনড। জানালাগুলো শুধু দিনের আলো পাবার জন্যে।'

'বাথরুমে যাবার দরকার হলে কি করেন?'

একটা হাত তুলল রিয়াজুল হাসান। 'পিছনের দরজা খুললে পাশাপাশি দুটো বাথরুম পাবেন।'

'ওদিক দিয়ে আর কোথাও যাওয়া যায়?'

'না।'

'আর কোন পথ নেই, বেরুবার?'

'না। ঢোকার বা বেরুবার পথ একটাই, যেটা দিয়ে ঢুকলেন আপনি।'

'দরজাটার চাবি শুধু আপনার কাছে থাকে?'

'হ্যাঁ।'

'সিকিউরিটি অফিসার, যে আমাকে ওয়েটিং রুমে দিয়ে গেল, তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি নেই?'

'না।'

'তাহলে বাইরে থেকে কেউ এসে চুরি করবে, সে-সম্ভাবনা নেই বলতে হয়, কি বলেন?'

'নেই,' গম্ভীর সুরে বলল রিয়াজুল হাসান। 'এককথায়, অসম্ভব।'

'আপনি কি বলেন?' ঝট্ করে ঘুরে প্রশ্নটা সুব্রত বড়ুয়াকে করল রানা, একটা টেবিলের পাশে অনড় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

'আমি একমত,' ছোট্ট করে জবাব দিল সুব্রত বড়ুয়া।

'আপনি?'

'না···মানে, আমি একমত নই,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল শারমিন চৌধুরী, সরাসরি রানার চোখে চোখ রেখে। 'ভিক্ত হলেও আপনার কথাটাকেই সত্যি বলে মানছি আমরা–ডকুমেন্টটা হয় সরানো হয়েছে, নয়তো কপি করে পাচার করা হয়েছে। আমরা কেউ বেইমান নই, তারমানে বাইরের কেউ নিয়ে গেছে জিনিসটা। যদি বলা হয় তা অসম্ভব, আমি একমত হতে বাধ্য এই জন্যে যে উল্টোটা প্রমাণ করতে পারছি না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি বলব, সম্ভব। কাজেই আমাদের কাজ হবে, বাইরের কেউ কিভাবে জিনিসটা নিয়ে যেতে পারল সেটা খুঁজে

বের করা। একমাত্র প্রশ্ন: কোত্থেকে শুরু করব আমরা।'

'সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি, সন্দেহ নেই,' উৎসাহ দিয়ে হাসল রানা। 'আমি হয়তো আপনাদের সাহায্য করতে পারব, তবে আমাকেও আপনাদের সাহায্য করতে হবে। সমস্যাটার সমাধান হবেই, তবে সহজে হবে কিনা নির্ভর করছে আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতার ওপর। এখানে কি ঘটে না ঘটে সব আপনারা জানেন, আমি কিছুই জানি না। এমন দু'একবার হয়তো ঘটেছে যে দরজা খোলা ছিল, আর আপনারা কেউই ঘরে ছিলেন না…'

বাধা দিল রিয়াজুল হাসান, 'না, আপনাকে আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি…'

'শুনুন, হাসান সাহেব,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা, 'শুরু থেকেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। আমি খোলা মন নিয়ে এখানে এসেছি, প্রমাণ আর পরিস্থিতি ছাড়া আর কিছুই আমাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। কিন্তু পরিস্থিতির বাস্তবতা আপনাদেরকেও মেনে নিতে হবে। যা ঘটেছে, তার খানিকটা দায়-দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে নিতেই হবে। কিন্তু আপনি যদি আঙুল তুলে দেখাতে পারেন কিভাবে ঘটেছে তাহলে হয়তো বেশ অনেকটা দায় থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কাজেই আমার সাথে সহযোগিতা করলে নিজেরই উপকার করা হবে, কেমন?'

'হ্যাঁ, বুঝলাম, আপনি যদি এভাবেই দেখেন ব্যাপারটাকে…'

'দরজাটা দু'একসময় খোলা থাকতে পারে। এমনও ঘটতে পারে যে খোলা দরজা দিয়ে কেউ ভেতরে ঢুকল বা বেরিয়ে গেল, কারও চোখে ধরা না পড়ে। আমি এখন চাই, এখানকার নিয়ম আর নিরাপত্তার দিকগুলো মনে রেখে, নিজেদেরকে প্রত্যেকে আপনারা বহিরাগত একজন চোর বলে ভাবতে চেষ্টা করুন—আপনাদের উদ্দেশ্য ডকুমেন্টগুলো চুরি করা। সিরিয়াসলি ভাবুন। এভাবে হয়তো একটা সূত্র আমরা পেয়েও যেতে পারি।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়—চিন্তা করে দেখা যাক,' হঠাৎ উৎসাহী হয়ে উঠল সুব্রত বড়ুয়া।

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। যদিও সে নিস্তব্ধতা বর্ণভিন্ন প্রসব করল না। অনড় দাঁড়িয়ে থাকল তিনজন বিজ্ঞানী, গভীর ধ্যানমগ্ন।

হঠাৎ করে সুব্রত বলল, 'আমাদের ইকুইপমেন্ট যেবার বিস্ফোরিত হলো, মনে আছে?'

ভুরু কুঁচকে উঠল শারমিন চৌধুরীর, তবে এদিক-ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'উঁহুঁ, না। জঞ্জাল সাফ করার জন্যে একজন ঢুকেছিল বটে, কিন্তু সব নিয়ে আমাদের সামনেই বেরিয়ে যায় সে। পুরোটা সময় তিনজনই আমরা এখানে ছিলাম।'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো।'

'আমি কি আপনাদের সাহায্য করতে পারি?' অবশেষে প্রস্তাব দিল রানা। 'দু'একটা প্রশ্ন করে? যেমন, ধরুন—বাতিল কাগজগুলো আপনারা কি করেন?'

'সব আমরা এই চপার-এ ফেলি,' বলল রিয়াজুল হাসান, ওয়াশিংআপ মেশিনের মত দেখতে একটা বাক্সের দিকে হাত তুলে দেখাল সে। 'ওটার ভেতর কাগজগুলো

ছোট ছোট টুকরো হয়ে যায়–ফুলপ্রুফ।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। মেশিনটা সম্পর্কে জানে ও, বি.সি.আই. অফিসে আছে। 'তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন। আপনারা তিনজন বাদে আর কেউ কখনও এই ল্যাবে পা ফেলেছে?'

'না, আপনাকে তো আগেই বলেছি,' জানাল রিয়াজুল হাসান, 'এটাই সবেচেয়ে কড়া নিয়ম, কখনও ভাঙা হয়নি।'

'অথচ আজ ভাঙা হয়েছে, তাই না?' হাসল রানা।

'মানে?'

'আমি কি আপনাদের তিনজনের একজন?'

রিয়াজুল হাসানের মুখ ঝুলে পড়ল, তারপর অপ্রতিভ একটু হাসল সে। 'আপনার ব্যাপারটা আলাদা!'

'আলাদা কেন?'

'তা কি ব্যাখ্যা করে বলতে হবে?'

'প্লীজ!'

'আপনি একটা তদন্তের কাজে এসেছেন, আপনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন অফিসার।'

'কিভাবে জানলেন?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল রানা।

এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রিয়াজুল হাসান, তারপর আবার হাসল। 'জানলাম, কারণ প্রজেক্ট ডিরেক্টর বৃহস্পতিবার রাতে আমাকে বলেছেন যে কাল সকাল দশটায় আপনি আমার সাথে দেখা করতে আসবেন।'

'আমার সম্পর্কে কি বলেছেন তিনি আপনাকে?'

'বলেছেন আপনি একজন মেজর, আপনার নাম শফিকুর রহমান।'

'তিনি কি আমার চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন? কিংবা আমার কোন ফটো দেখিয়েছেন আপনাকে?'

'না।'

'অথচ আপনার ফ্ল্যাটের দরজায় আমাকে দেখে আপনি আমার পরিচয় সম্পর্কে কোন প্রমাণ চাননি। কি করে জানলেন আমি মেজর শফিকুর রহমান?'

'হতে আপনি বাধ্য! তা না হলে তথ্য পাচার সম্পর্কে জানবেন কিভাবে!'

'কেন, সহজেই জানা যায়। হতে পারে আমি সি.আই.এ-র লোক, জেনেছি আসল শফিকুর রহমানের কাছ থেকে, আপনার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম তার পরিচয় নিয়ে, আমার হয়তো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ আছে…'

কাঁপা কাঁপা হাসি নিয়ে রিয়াজুল হাসান বলল, 'এ-ধরনের ঘটনা শুধু স্পাই থ্রিলারে ঘটে।'

'এখানটাতেই পুরোপুরি ভুল হচ্ছে আপনার,' ভারী গলায় বলল রানা। 'আপনি খবরের কাগজ পড়েন না? এমন দু'একটা কেসের বিশদ বিবরণ মনে নেই, যা স্পাই থ্রিলারের চেয়েও ফ্যানটাসটিক?'

নিচের ঠোঁট একবার চুষে চুপ করে থাকল রিয়াজুল হাসান।

মৃদুকণ্ঠে নিস্তব্ধতা ভাঙল শারমিন চৌধুরী, 'উনি ঠিকই বলেছেন, হাসান ভাই।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই, এই দেখুন,' বলে মেজর শফিকুর রহমান লেখা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচয়-পত্রটা পকেট থেকে বের করে ওদের তিনজনকে দেখাল রানা। 'আশা করি আপনারা কিছু মনে করেননি, তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ভুল একটা হয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন,' সবিনয়ে বলল রিয়াজুল হাসান। 'সিকিউরিটির ব্যাপারে নিখুঁত হতে চাইলে আরও সাবধান হতে হবে। ঘ্যাপারটা অনেকটা এইরকম: নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকে অপরাধী।'

'ঠিক তাই। কাজেই কথাটা মনে রেখে আবার আপনারা চিন্তা করুন। যখন থেকে এই ল্যাবে আপনারা কাজ করছেন, আপনারা বাদে কেউ কি এখানে ঢোকেনি, এক আধ মিনিটের জন্যে হলেও?'

আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। রিয়াজুল হাসান, সুব্রত বড়ুয়া আর শারমিন চৌধুরী গভীর চিন্তায় মগ্ন।

হঠাৎ 'মনে পড়েছে!' বলে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। 'এসেছিল! এসেছিল!'

ঝট করে তার দিকে ফিরল রিয়াজুল হাসান, চেহারায় উৎকণ্ঠা। 'উঁ?'

'আপনার মনে নেই, হাসান ভাই? রিপোর্টাররা!'

'ইয়েস!' সায় দিল সুব্রত বড়ুয়া, সবেগে মাথা দোলাল। পাঁজরের ভেতর লাফ দিল রানার হৃৎপিণ্ড।

দুর্বল ভঙ্গিতে একটা হাত তুলল রিয়াজুল হাসান। 'ওহ্ গড! ইয়েস! বেমালুম ভুলে গেছি! মেজরকে বলো, শারমিন।'

'দু'জন রিপোর্টার আমাদের ল্যাব দেখতে এসেছিলেন,' বলল শারমিন চৌধুরী, তার পটলচেরা চোখ রানার মুখের ওপর স্থির। 'চার কি পাঁচ মাস আগের কথা।'

মাথা নাড়ল সুব্রত বড়ুয়া। 'তবে আমি যতদূর শুনেছি, ওরা ঠিক রিপোর্টার ছিল না!'

'আপনি তখন এখানে ছিলেন না?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, ক'দিনের ছুটিতে ছিলাম আমি।'

মেয়েটার দিকে ফিরল রানা। 'দুঃখিত। আপনি বলে যান।'

'হ্যাঁ, সুব্রত ঠিক বলেছে,' বলল শারমিন চৌধুরী। 'ওঁদের ঠিক রিপোর্টার বলা চলে না। একজন ফিলাডেলফিয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ছিলেন, আরেকজন মার্সফিল্ড-এর স্কুল অভ অ্যারোনটিকস-এ পড়াতেন। পড়ানোর চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ায় দু'জনই সে-সময় দেশে ফিরে এসেছিলেন, "লাইফ" পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ওঁদের সাথে যোগাযোগ করে অনুরোধ রাখে, অ্যাটমিক এয়ারক্রাফট সংক্রান্ত ফর্মুলা আবিষ্কারের জন্যে বাংলাদেশে যে গবেষণা চলছে তার ওপর তারা একটা অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরি করলে পত্রিকার পাঠকমহল খুব খুশি হবে। লাইফ সম্পাদক পেশাদার সাংবাদিকদের বদলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বেছে নিয়েছিলেন।'

'এবং তাঁরা এই কামরায় এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' বলল রিয়াজুল হাসান। 'ভুলে গিয়েছিলাম সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।

তবে কারণটা হলো, ওঁদের দুজনকে আমি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে চিনি, আর দু'জনেই ওঁরা সন্দেহের উর্ধ্বে। ভদ্রলোকদের একজন রফিকুল বারী। নিউক্লিয়ার ফিশন-এ বিশেষজ্ঞ, দীর্ঘদিন ফিলাডেলফিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছেন। আর একরামুল হক একজন এঞ্জিনিয়ার।'

'এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্স-এর অনুমতি ছিল?'

'ছিল। এয়ারফোর্সের চীফ স্বয়ং ওদের আবেদন মঞ্জুর করেন।'

'আপনাদের ওপর কোন নির্দেশ ছিল, কতটুকু ওদেরকে জানানো যাবে, কি কি বলা যাবে না?'

'হ্যাঁ, ছিল বৈ কি,' শারমিন চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসল রিয়াজুল হাসান। 'তিন পৃষ্ঠা জুড়ে প্রায় পঞ্চাশটা নির্দেশ। তবে, তার কোন দরকার ছিল না। আমরা খুব ভালভাবেই জানি কোনটা টপ সিক্রেট কোনটা নয়।'

'ওঁরা যখন এলেন, গোপন ব্যাপারগুলো নিজেদের মাথায় আর কাবার্ডে তালা দিয়ে রাখলেন আপনারা?'

'বলাই বাহুল্য। অ্যাটমিক এয়ারক্রাফট নির্মাণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা, বললাম গবেষণা এগিয়ে চলেছে, আশা করা যায় অচিরেই সাফল্যের মুখ দেখব আমরা। তারপর ওঁরা জানতে চাইলেন, ফর্মুলাটা কবে নাগাদ সম্পূর্ণ হবে।'

'কি বললেন আপনারা?'

'বললাম, ব্যাপারটা নির্ভর করে অ্যান্টি-রেডিয়েশন স্ক্রীন, ওজন ইত্যাদির ওপর।' রিয়াজুল হাসান ইতোমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে, তার হাবভাবে আত্মবিশ্বাসের আর কোন অভাব দেখা গেল না।

'ওঁরা কি কোন ফটো নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রিয়াজুল হাসান। 'প্রথমে তাঁরা ল্যাবের একটা ছবি তুললেন। তারপর আমার আর শারমিনের একটা—জানালার দিকে মুখ করে, ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াই আমরা, ফটোতে যাতে চেনা না যায়। আরেকটা ছবি তোলা হলো শারমিনের।'

'সেটাতেও আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি, নিচে ক্যাপশন ছাপা হলো—"প্রত্যাশা নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে বিজ্ঞান"।' শারমিন চৌধুরীর সাথে বাকি সবাইও হেসে উঠল।

'লাইফের ওই সংখ্যাটা আমাকে দেখতে দিতে পারেন, যেটায় ওদের রিপোর্ট আর ফটো ছাপা হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল রিয়াজুল হাসান। 'আর্কাইভে একটা কপি আছে। এখুনি চান?'

'যদি সম্ভব হয়।'

রিয়াজুল হাসান বেরিয়ে যেতে কামরার ভেতর অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা নেমে এল। ধীর পায়ে এগিয়ে ল্যাবরেটরি বেঞ্চের সামনে দাঁড়াল সুব্রত বড়ুয়া, ইকুইপমেন্ট নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করল। খুক করে কাশল একবার শারমিন চৌধুরী, ক্ষীণ একটু হাসল,

কিন্তু তারপরও কেউ স্বাভাবিক হতে পারল না দেখে হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল সে, 'আপনাকে এক কাপ কফি দিই?'

'না, ধন্যবাদ। ভাল কথা, দুপুরে আপনারা খাওয়াদাওয়া করেন কোথায়? আর রাতে যেদিন কাজ করেন?'

'ক্যানটিনে।'

'ল্যাব থেকে বেরুবার আগে সব কিছু তালা দিয়ে যান? আপনাদের গোপন কাগজ-পত্র ইত্যাদি?'

'হ্যাঁ, সব সময়। কখনও ভুল হয় না। সব আমরা সেফে তুলে রেখে তারপর বেরুই।' দেয়ালে লাগানো ভারী ইস্পাতের একটা দরজা দেখাল শারমিন। শুধু লাঞ্চের এক ঘণ্টা সময় কেন, ওটা ভাঙতে আট-দশ ঘণ্টাও যথেষ্ট নয়।

'সেফটার কমবিনেশন কে কে জানে?'

'শুধু আমরা তিনজন।'

'আর কেউ না?'

'না।'

'সুব্রত বাবু,' বলল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তার দিকে। 'রফিকুল বারী বা একরামুল হকের সাথে আপনার কখনও পরিচয় হয়েছে?'

'একরামুল হকের সাথে একবার দেখা হয়েছিল,' ল্যাবরেটরি বেঞ্চ থেকে জবাব এল। 'একটা সায়েন্টিফিক সেমিনারে দু'একটা কথা হয়।'

'এখানে আসার আগে ওঁদের কাউকে আমি আগে কখনও দেখিনি,' নিজে থেকেই জানাল শারমিন চৌধুরী।

'এমন হতে পারে, ওঁরা আপনাদের কোন ডকুমেন্টের ফটো তুলে নিয়ে গেছেন?'

'না, প্রশ্নই ওঠে না,' জোর দিয়ে বলল শারমিন চৌধুরী।

'হুম।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। সমস্যাটা আগের মতই জটিল থেকে যাচ্ছে। শারমিন চৌধুরী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করলেও, তার জবাবগুলো বড় বেশি সহজ-সরল, কথার পিছনে খুব একটা চিন্তা-ভাবনা নেই, আর উদ্দেশ্য একটাই মাত্র—সহকর্মীদের সহ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা। কিন্তু সুব্রত বড়ুয়া ঠিক উল্টো আচরণ করছে, যেন গোটা ব্যাপারটা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় সে। 'সুব্রত বাবু,' ডাকল রানা। 'এদিকে একটু আসবেন, প্লীজ?'

বিড়বিড় করতে করতে সামনে এগিয়ে এল সুব্রত বড়ুয়া, 'স্যরি করবেন।'

'একটা কথা—নিশ্চয়ই আপনারা তা বুঝতে পারছেন,' বলল রানা। 'তথ্য পাচারের ঘটনাটা যদি বাইরে থেকে ঘটে থাকে, তাহলে নিখুঁত সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কে আপনারা আমাকে যা বলছেন তা সত্যি হতে পারে না। আপনারা হয়তো ভাবছেন নিখুঁত, কিন্তু আসলে তা নয়। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে, আর সেই ভুলের দায়-দায়িত্ব এই কামরায় যারা কাজ করে তাদের ঘাড়েই বর্তাবে। এবার আমাকে স্পষ্ট করে কথা বলতে হবে। কি করবেন সেটা বেছে নিন আপনারা। হয় ভুলটা খুঁজে বের করার কাজে আমাকে সাহায্য করুন, আমরা যদি সফল হই তাহলে

শুধু অবহেলার অভিযোগ তোলা হবে আপনাদের বিরুদ্ধে। নয়তো এখন যা করছেন তাই করুন, বারবার বলতে থাকুন–এ কখনও ঘটতে পারে না। সেক্ষেত্রে আপনাদের সাহায্য ছাড়াই তদন্ত চালাতে হবে আমাকে, রেজাল্ট পেতে তাতে সময় লাগবে, কিন্তু মনে রাখবেন, এই পরিস্থিতিতে আপনাদের তিনজনকেই আমি সন্দেহ করব। কাজেই নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে কি করা দরকার বুঝে দেখুন।'

এত কথা বলার পরও হতাশ হতে হলো রানাকে, কারণ অত্যন্ত শান্ত সমাহিত ভঙ্গিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা দু'জন, তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। ব্যাপারটা অদ্ভুত। সাধ্যের মধ্যে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করছে তারা, প্রতিবাদের সুরে এ-ধরনের কিছু বলাটা স্বাভাবিক ছিল না? ওরা নির্দোষ হলে কথাগুলো শোনার পর চেহারায় বিরক্তি বা অসহিষ্ণু ভাব ফুটত না?

রানার প্রশ্নবোধক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে সুব্রত বড়ুয়া নির্লিপ্ত থাকল, বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

বড়বড় চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল শারমিন চৌধুরী, কোন কথাই বলল না। এই সময় লাইফের একটা কপি আর কাগজের দুটো শীট নিয়ে ল্যাবে ফিরে এল রিয়াজুল হাসান। 'রফিকুল বারী আর একরামুল হক এখানে আসার আগে এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্স তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ-খবর নিয়েছিল। আমাদের প্রজেক্ট ডিরেক্টর রিপোর্টের একটা করে কপি পাঠিয়েছিলেন। আপনি দেখতে চাইবেন মনে করে নিয়ে এসেছি।' পত্রিকা আর কাগজ দুটো রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কাজে আসবে।' কাগজ দুটো পকেটে ভরল ও, পত্রিকাটা বগলের তলায় রাখল।

সরে গিয়ে সুব্রত বড়ুয়া আর শারমিন চৌধুরীর সাথে জোট বাঁধল রিয়াজুল হাসান, তিনজনের চেহারা দেখে রানার মনে হলো, ওরা আশা করছে এবার ওদেরকে রেহাই দেবে সে। আপাতত তা দেয়া যেতে পারে, ভাবল রানা। 'পরে আবার আপনাদের সবাইকে দরকার হবে আমার,' বলল ও। 'তার আগে আমাকে যদি আপনাদের দরকার হয়, হোটেল সেভেন স্টারে ফোন করে দিলীপ সরকারকে চাইবেন।'

'ঠিক আছে,' হাসিমুখে বলল রিয়াজুল হাসান। 'আপনি যদি ওয়েটিং রুমে একটু অপেক্ষা করেন, সিকিউরিটি অফিসারকে ফোন করে ডাকতে পারি আমি...'

দশ মিনিট পর নিজের গাড়িতে ফিরে এল রানা। ড্যাশ বোর্ডের নিচে আটকানো রেডিও অন করে গিলটি মিয়ার সাথে যোগাযোগ করল। নির্দেশ দিল, কাজ শেষ করে ল্যাবরেটরি ভবন থেকে বেরুলে তিনজন বিজ্ঞানীকেই অনুসরণ করতে হবে। তারপর জিজ্ঞেস করল, শারমিন চৌধুরীর টেলিফোনে আড়িপাতার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা।

গিলটি মিয়ার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'মেকানিকরা কাজ করে যাচ্ছে, স্যার। একটু সময় লাগছে, কারণ হলো গে টেলিফোন শুদু ওই ছুঁড়ির ঘরেই রয়েছে, লাইনটা রাস্তা থেকে পাঁচিল টপকে সরাসরি উঠে গেছে পাঁচতালায়। এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না, স্যার, আজ রাতেই হয়ে যাবে।'

'রাতে নয়, সন্ধ্যায়। ছ'টার মধ্যে। খুব জরুরী, বুঝতে পারছ? কি বলেছি মনে আছে, আমাদের নিজস্ব লোক ছাড়া আর কাউকে দিয়ে কাজ করাবে না?'

'জ্বী, স্যার, মনে আছে।'

সেট অফ করে হোটেলে ফিরে এল রানা। এবার রফিকুল বারী আর একরামুল হককে নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। এই দুটো নাম ছাড়া বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আর তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তার নিয়ম রক্ষায় কোথাও ভুল হয়েছে, এটা স্বীকার করতে তিনজনের একজনও রাজি নয়। ভুল হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে, এটাই তারা মেনে নিতে পারছে না। ফলে প্রত্যেকের চিন্তাস্রোত বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছাকৃত অসহযোগিতা নয়, এ এক ধরনের জেদ বা অসহিষ্ণুতার ফল। তারাও, দুনিয়ার আর সব বিজ্ঞানীর মত, নিজেদের কাজ নিয়েই শুধু মগ্ন, অন্য কোন সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে উৎসাহী বা অভ্যস্ত নয়। পেশাগত সমস্যার সমাধান নিজেদের স্বার্থে করতে চায় তারা, প্রেরণার উৎস হিসেবে দেশপ্রেম তেমন বড় কোন ভূমিকা রাখে না। আর তাই, নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে-কোন নিয়ম তাদের জন্যে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে নিয়মগুলো এড়িয়ে চলে তারা, মনে করে এ-সবের কোন দরকার নেই। শুধু এই মানসিকতার কারণে অতীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেশ থেকে পাচার হয়ে গেছে।

# সাত

টিকেট করা ছিল, সেদিনই বাংলাদেশ বিমানের বিকেলের ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরে এল রানা। একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল, সরাসরি মণিপুরীপাড়ায় পৌঁছে গেল ও, সি ব্লকের তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটবাড়িটা খুঁজে বের করতে কোন অসুবিধে হলো না। এটাই রফিকুল বারীর ঠিকানা। লাইফ ম্যাগাজিনে যে দুই ভদ্রলোক ফিচার লিখেছেন তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পড়ার পর রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রথমে রফিকুল বারীর সাথেই দেখা করবে ও।

দু'জনের মধ্যে রফিকুল বারীকে বেশি সন্দেহ করছে রানা, ব্যাপারটা তা নয়। বরং একরামুল হক সম্পর্কেই প্রচণ্ড কৌতূহল বোধ করছে ও। ভদ্রলোকের অতীত শুধু ঘটনাবহুলই নয়, ধোঁয়াটে ও জটিলও বটে। তাঁর বর্তমান জীবনযাপনও স্বাভাবিক নয়। ভদ্রলোক মধ্যবয়স্ক, সুদর্শন, মাঝারি গড়ন, কাঁচাপাকা চুল। স্বাধীনতার আগে যুক্তরাষ্ট্রে একটা এয়ারক্রাফট কোম্পানীতে চাকরি করেছেন, তারপর পাকিস্তান এয়ারফোর্সে যোগ দেন, পদোন্নতি পেয়ে স্কোয়াড্রন লীডার হয়েছিলেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে করাচীতে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে, পরবর্তী ছ'মাস তাঁর অবস্থান বা ভূমিকা সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ছবি পাওয়া যায়নি। করাচীতে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছিল, নাকি স্বেচ্ছায় তিনি থেকে গিয়েছিলেন, এটা একটা বিতর্কিত বিষয়। ছ'মাস পর, সেপ্টেম্বর মাসে, হঠাৎ করে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে উদয় হন তিনি,

সাংবাদিকদের জানান লাহোর সেন্ট্রাল জেল থেকে পালিয়ে এসেছেন। সেখানে তাঁকে নাকি দেশদ্রোহিতার অভিযোগে দশ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভারত সরকার তাঁকে পাকিস্তানের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে গ্রেফতার করে। পরবর্তী তিন মাস কোথায় তাঁকে রাখা হয়েছিল কেউ জানে না। দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তি পান তিনি, কিন্তু দেশে না ফিরে চলে যান যুক্তরাষ্ট্রে, মাসফিল্ড-এর স্কুল অভ অ্যারোনটিকস-এ চাকরি নিয়ে। বছর কয়েক আগে দেশে ফিরে এসেছেন। সম্ভবত দেশের কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পড়ানোর কোন প্রস্তাব তিনি পাননি কিংবা পেলেও তা গ্রহণ করেননি। জানা গেছে, রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর তেমন কোন আগ্রহ নেই। ভদ্রলোক চিরকুমার, জীবনযাপনে সংযম বা রুটিনের কোন বালাই নেই। নিয়মিত মদ্যপান করেন, ড্রাগসেও অরুচি নেই, ভোগী পুরুষ, অনেক নারীতে আসক্ত। তার কোন পিছু টান বা বাঁধন নেই।

ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ রফিকুল বারী। এক মওলানার ছেলে, কঠোর পরিশ্রমী, ধর্ম-কর্মে সাংঘাতিক ভক্তি। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন, কিছুদিন সৌদি আরবে ছিলেন, অধ্যাপনা করেছেন ফিলাডেলফিয়া ইউনিভার্সিটিতে। বিবাহিত, তিন সন্তানের জনক। বর্তমানে দেশেরই একটা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করছেন।

মণিপুরীপাড়ায় পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে গেল, ইতোমধ্যে লাইটপোস্টের মাথায় টিউব লাইট জ্বলে উঠেছে। শুধু যারা প্রাচুর্যের অধিকারী তাদেরই বসবাস এদিকে, আভিজাত্যের একটা ছাপ ফুটে আছে গোটা এলাকায়, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রানা আবিষ্কার করল অন্তত সি ব্লকে বিদেশ ফেরত কোন ডাক্তার চক্ষুপীড়াদায়ক সাইনবোর্ডবহুল ক্লিনিক খুলে বসেনি। এবার ঢাকায় এসে আরও হাজারটা রুচিবিকৃতির ঘটনার মত এটাও লক্ষ করেছে ও, ঢাকার সদর রাস্তাগুলোয় হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ক্লিনিকগুলো যেন একেকটা বসন্তের রোগী। মীরপুর রোডে এ-ধরনের তিনটে ক্লিনিক দেখেছে ও, গড়পড়তায় প্রতিটির গায়ে রঙিন সাইনবোর্ডের সংখ্যা বিশ, রঙগুলো গায়ে যেন চাবুক মারে। অভিজাত এলাকা হলেও, ফুটপাথের অন্তত একটা ম্যানহোলে ঢাকনি দেখল না রানা। তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটবাড়ির উল্টোদিকের লাইটপোস্টে টিউবটা জ্বলছে না। টুলে বসা দারোয়ানের কাছ থেকে জানা গেল, বারী সাহেব পাঁচতলায় থাকেন। সে জানে না তিনি বাড়িতে আছেন কিনা। সাততলা বাড়ি, চোদ্দটা ফ্ল্যাট, এলিভেটর আছে। রফিকুল বারীর ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল বাজাল রানা।

কয়েক সেকেন্ড পর মোটাসোটা এক ভদ্রলোক দরজা খুলে রানার সামনে দাঁড়ালেন। মাথায় চকচকে টাক, চোখে ভারী ফ্রেমের চশমা, ফুলহাতা শার্ট আর লুঙ্গি পরে আছেন। 'আপনি কি রফিকুল বারী?' স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। বলুন?'

পকেট থেকে কার্ডটা বের করে দেখাল রানা। 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আসছি, মেজর শফিকুর রহমান। যদি সময় হয়, আপনার সাথে কিছু কথা ছিল।'

কার্ডটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন রফিকুল বারী, তবে বিস্মিত হয়েছেন বলে মনে

হলো না। শুধু বললেন, 'আসুন।'

সরু হলরুমে ঢুকে হাসি পেল রানার। ফ্ল্যাটটা নতুন, কিন্তু এরইমধ্যে সেটার বারোটা বাজতে শুরু করেছে। কয়েক জায়গায় প্লাস্টার খসে পড়ার পর মেরামত করা হয়নি। দেয়ালগুলো রীতিমত ভীতিকর সব ছবি আর পোস্টারে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। এক কোণে তিনচাকার একজোড়া সাইকেল, দুটোরই একটা করে চাকা ভেঙে গেছে। মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে খেলনা আর হাত ভাঙা পুতুল।

ড্রইংরুমেও খুদে দানবদের কীর্তির ছাপ স্পষ্ট। মেহগনি কাঠের আসবাব-পত্র, অসম্ভব ভারী। চাপ দাড়ি, মাথায় টুপি পরা বৃদ্ধ এক ভদ্রলোকের ফটো দেয়ালে; রানা আন্দাজ করল, ইনিই বোধহয় রফিকুল বারীর মরহুম পিতা। মেঝেতে কার্পেট, মাঝখানে খয়েরি দাগ। ইঙ্গিতে একটা বড়সড় কাঠের চেয়ার দেখিয়ে রানাকে বসতে অনুরোধ করলেন রফিকুল বারী, তার আগে চেয়ার থেকে তুলোর একটা সিংহ সরালেন তিনি। বললেন, 'হ্যাঁ, শুরু করুন। আমি শুনছি।' উল্টোদিকের আরেকটা চেয়ারে বসে হাত দুটো বুকের নিচে ভাঁজ করলেন।

'ফ্ল্যাটে আপনি একা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এই মুহূর্তে, হ্যাঁ। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আত্মীয়তা রক্ষা করতে গেছেন গিন্নী। ছাত্রদের খাতা দেখতে হবে, আমার যাওয়া হয়নি।'

'ব্যাপারটা হলো,' শুরু করল রানা, 'মাস কয়েক আগে, লাইফ ম্যাগাজিনের তরফ থেকে একটা রিপোর্ট করার জন্যে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন আপনি—এয়ারফোর্সের ল্যাবরেটরি ভবনে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন রফিকুল বারী। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। আমার সাথে একরামুল হক ছিল।'

'হ্যাঁ। আপনার কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য হলো, ইদানীং জানা গেছে, ল্যাবরেটরি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডকুমেন্ট চুরি গেছে, এই চুরির সাথে আপনাদের দু'জনের ওখানে যাওয়ার কোন সম্পর্ক আছে কিনা তদন্ত করে দেখা।'

অবিশ্বাস আর বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন রফিকুল বারী। 'কি! চুরির সাথে আমাদের যাওয়ার সম্পর্ক? আপনি সিরিয়াস?'

'সিরিয়াস।'

'ইয়া আল্লাহ! কি ডকুমেন্ট?'

'সেটা এই মুহূর্তে খুলে বলা যাচ্ছে না।'

'আর আপনি আমার কাছে এসেছেন, ধরে নিতে পারি, আমাকে সন্দেহ করা হচ্ছে বলে?'

'না, বারী সাহেব, না। আপনাকে নয়। সন্দেহ করছি আমি একরামুল হককে। আপনার কাছে এসেছি, কারণ আপনি তাঁকে চেনেন। আশা করছি তাঁর সম্পর্কে আপনি আমাকে কিছু তথ্য দিতে পারবেন।'

এই প্রথম উদ্বিগ্ন দেখাল রফিকুল বারীকে। ব্যস্ত হাতে টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিলেন, রানাকে অফার না করেই ধরালেন একটা। 'একরামুল হক···তার সম্পর্কে তথ্য···কি তথ্য?'

'গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত তথ্য,' বলল রানা। 'যা যা জানেন। ভদ্রলোককে আপনি পছন্দ

করেন?'

'পছন্দ করা না করার সাথে কি সম্পর্ক?' একটু যেন বিরক্ত হলেন রফিকুল বারী।

'হয়তো বিরাট।'

বিড়বিড় করে, শোনা যায় কি যায় না, রফিকুল বারী বললেন, 'আমি চাই না একরাম কোন বিপদে পড়ুক।'

'বন্ধুকে রক্ষা করতে চাওয়া ভাল, কিন্তু একজন বেঈমানকে বাঁচানোর চেষ্টা করা? ভেবে দেখুন, রফিক সাহেব। গুরুতর একটা অপরাধ ঘটানো হয়েছে, কাজটা দেশের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর। একরাম সাহেব যদি দেশের নিরাপত্তার জন্যে একটা হুমকি হন, আপনার দায়িত্ব বোধ কি বলে? আপনি চাইবেন না তার শাস্তি হোক?'

জাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো। চট করে উল্টোদিকের দেয়ালে লটকানো বৃদ্ধ বাবার ফটোর দিকে একবার তাকালেন রফিকুল বারী। 'চাইব, অবশ্যই চাইব,' তাড়াতাড়ি বললেন তিনি। 'কিন্তু ব্যাপারটা খুব জটিল, মেজর···দুঃখিত, আপনার নামটা আমি ভুলে গেছি।'

'শফিকুর রহমান।'

'রহমান সাহেব, সত্যি কথা বলতে কি, একরাম আমার বন্ধু নয়—তাকে আমি একেবারেই পছন্দ করি না।'

'কেন?'

'তার নৈতিক চরিত্রের জন্যে।' রফিকুল বারীর চেহারা কঠিন হয়ে উঠল, হঠাৎ জ্বলে ওঠা চোখ দেখে তাঁকে ফ্যানাটিক বলে মনে হলো রানার। 'শুধু যে মদ খায় তাই নয়, ধর্ম নিয়ে বিচ্ছিরি সব ব্যঙ্গ করে সে। পেশাগত কারণে মাঝে-মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, তা না হলে তার ছায়া মাড়াতেও ঘৃণাবোধ করি আমি। মেজর রহমান, আল্লাহ আমাকে মাফ করবেন, কিন্তু না বলেও পারছি না—এই লোক যে নির্ঘাত দোজখে যাবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। নামাজ তো পড়েই না, ধর্ম সম্পর্কে এমন সব কথা বলে যে শুনলেও পাপ হবে!'

কিন্তু মারা যাবার পর একরামুল হকের কি হবে সেটা রানার মাথা ঘামানোর বিষয় নয়, ওকে লোকটার রাজনৈতিক আনুগত্য সম্পর্কে জানতে হবে। 'লাহোরের সেন্ট্রাল জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছিলেন তিনি, এ-সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেছেন কখনও?'

'দূর!' তাচ্ছিল্যের সাথে হাত নাড়লেন রফিকুল বারী। 'যত সব গালগল্প!'

'তাই?'

'ওর কথা কি আর বলব। একবার এক সেমিনারে গেছে, তা-ও মদ খেয়ে। তখনই, সম্ভবত মুখ ফস্কে, বলে ফেলে কথাটা।'

'কি কথা?' আগ্রহের সাথে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা।

'বলল, "সবাই আমাকে হিরো বানিয়ে ছাড়ল! আসলে কি ঘটেছে তা যদি কেউ জানত রে!" বলেই বুঝতে পারে, ভুল হয়ে গেছে। টলতে টলতে চলে গেল।'

'ঠিক জানেন, জেলভাঙার প্রসঙ্গেই কথাটা বলেছেন?'

'কেন জানব না! সেই থেকে আমি বুঝে নিয়েছি, পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেনি, ওকে পাঠানো হয়েছে। তার প্রমাণ ভারত সরকার ওকে গ্রেফতার করেছিল।' চেহারায় বিজয়ীর ভাব নিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন রফিকুল বারী, একরামুল হককে 'বিপদে' ফেলার সমস্ত ভয় মন থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে। তার মত মানুষের কাছে নৈতিক চরিত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি জীবনের সারবস্তু। কবরে ঢোকার আগে পর্যন্ত আফসোস করেন, কী এক জঘন্য দুনিয়ায় তাঁদের জন্ম হয়েছে! তবু বলতে হয়, রানা ভাবল, খবরটা গুরুত্বপূর্ণ।

'আপনার সাথে রাজনীতি নিয়ে কখনও তিনি আলাপ করেছেন?'

মাথা নাড়লেন রফিকুল বারী। 'তবে, দেখা হলেই প্রচুর অভিযোগ শুনতে হয়। দুনিয়াটা ভাল জায়গা নয়, মৌলবাদীরা দেশটাকে ধ্বংস করছে, অযোগ্য লোকেরা বড় বড় পদ আঁকড়ে আছে, সম্পদের সুষম বণ্টন হওয়া দরকার ইত্যাদি। আসলে নিজে জল না হলে যা হয় আর কি, সবার বিরুদ্ধে আক্রোশ পুষে রাখে।'

রানা উপলব্ধি করল, সুযোগ পেলে ভদ্রলোক তাঁর পরিচিত সবার বিরুদ্ধে সারারাত ধরে নিন্দা করবেন। সাক্ষাৎকারটা সংক্ষিপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিল ও। 'আর একটা প্রশ্ন, রফিক সাহেব। আপনি নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারে আমার সাথে একমত হবেন যে তথ্য পাচারের ঘটনার সাথে অবশ্যই একরামুল হক জড়িত। আপনি কি তার বিরুদ্ধে কোন অকাট্য প্রমাণ বা নিরেট তথ্য দিতে পারেন, যা আমার তদন্তে সাহায্য করবে?'

'অকাট্য প্রমাণ...' মাথা চুলকালেন রফিকুল বারী। '...নিরেট তথ্য ...' চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন তিনি। 'তার সম্পর্কে আমি কি ভাবি তা তো আপনাকে আমি বলেইছি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু নিরেট তথ্য বা প্রমাণ যদি চান...মানে, না।' এই 'না' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলা হলো।

প্রায় লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা, অদ্ভুত হলেও সত্যি যে পরম স্বস্তিবোধ করছে ও। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, রফিক সাহেব। যথেষ্ট সাহায্য করলেন আপনি। প্রয়োজনে আবার আমাদের দেখা হবে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটা তো আমার দায়িত্ব...'

সাড়ে সাতটার দিকে গাড়িতে ফিরে এল রানা। গায়ে হিমেল হাওয়া নিয়ে ভাবল, কোথাও সম্ভবত বৃষ্টি হচ্ছে। এবার ফতুল্লা, ৭০নং দীপক ব্যানার্জি রোডে যেতে হয়। ধীরে ধীরে একটা বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে ওর মনে—একরামুল হককেই খুঁজছে সে। ভদ্রলোক পাকিস্তানে ছ'মাস ছিলেন, মুক্ত হোন বা বন্দী, তারপর ভারত সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে, এ-সব ঘটনা বিরাট তাৎপর্য বহন করে। ফর্মুলাটা চুরি করেছে ভারত সরকারের কোন এজেন্সি নয়, বিজনেস সিন্ডিকেট, আর বিজনেস সিন্ডিকেট ছোট আকারে হলেও বিশ-বাইশ বছর আগে থেকেই উপমহাদেশে তৎপর রয়েছে, যদিও

তখন এই নামে কুচক্রটি পরিচিত হয়ে ওঠেনি। সে-সময় পাকিস্তানে আরও যারা বন্দী ছিল এবং পরে মুক্ত হয়ে ভারতে বা দেশে ফিরেছে, তাদের জবানবন্দী থেকে জানা গেছে, কুচক্রটির তখনকার প্রতিনিধিরা তাদেরকে দলে টানার কম চেষ্টা করেনি। ধরে নিতে হয়, এ-ধরনের প্রস্তাব একরামুল হককেও দেয়া হয়েছিল।

যানজট থেকে মুক্ত হয়ে ফতুল্লায় পৌঁছুতে আধ ঘণ্টা লাগল রানার। দীপক ব্যানার্জি রোডের সত্তর নম্বর বাড়িটা মান্ধাতা আমলের, বাড়ির উল্টোদিকে একটা কলেজের সদ্য তৈরি ছাত্রাবাস। দু'জন ছাত্র গেটের সামনে দাঁড়িয়ে 'গ্রীন হাউস এফেক্ট' নিয়ে তুমুল আলোচনা করছে, রানাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। বাড়ির নম্বর মিলিয়ে দেখছে রানা, রাস্তা পেরিয়ে ছাত্র দু'জন এগিয়ে এল। একজন জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

'একরামুল হক সাহেব তো এ বাড়িতেই থাকেন, তাই না?'

'প্রফেসর একরামুল হক তো?' প্রথম ছাত্র জানতে চাইল।

দ্বিতীয় ছাত্র বলল, 'বল্, মিসগাইডেড প্রফেসর।'

'আহ্, তুই চুপ কর!' রানার দিকে ফিরল প্রথম ছাত্র। 'হ্যাঁ, এই বাড়িতেই থাকেন উনি, দোতলায়। কিন্তু আপনাকে উঠতে হবে পিছনদিকের সিঁড়ি বেয়ে।'

'প্রফেসর বাড়ি নেই,' অপর ছাত্র বলল। 'তবে অপেক্ষা করলে, প্রফেসরের দেখা যদি না-ও পান, অদ্ভুত সব চিড়িয়ার সাথে মোলাকাত ঘটবে আপনার।'

'আহ্, তুই না···!'

কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা। 'কি রকম?'

দ্বিতীয় ছাত্র বলল, 'দোতলায় উঠে যান, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।' রানার আপাদমস্তক চোখ বুলাল সে। 'আপনাকে দেখে তো ভদ্রলোক বলেই মনে হয়, কি দরকার ওনার সাথে?'

সঙ্গীর হাত ধরে টান দিল প্রথম ছাত্র। 'সব কিছুতে বাড়াবাড়ি তোর!' বলে তাকে নিয়ে রাস্তা পেরোতে শুরু করল সে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা, বাড়ির পিছন দিকে এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ল দোতলায়। বারান্দাটা প্রায় অন্ধকার, খাঁ খাঁ করছে। বেশ লম্বা বারান্দা, খানিক পর পর একটা করে পিলার, প্রতি দুই পিলারের মাঝখানে রেলিং, উল্টোদিকের দেয়ালে একটাই মাত্র দরজা। ছোট একটা তালা ঝুলছে কড়ার সাথে।

বারান্দার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত বার দুয়েক হাঁটল রানা। কি করবে ভাবছে। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় কে জানে। রেলিঙের ওপর বসে পিলারে হেলান দিল ও, একটা সিগারেট ধরাল। ঘাড় ফিরিয়ে মাঝে মধ্যে সিঁড়ির দিকে তাকাল। কেউ আসছে না। রাত বাড়ছে, সেই সাথে মেঘ জমছে আকাশে।

বিশ মিনিট পর ধৈর্য হারাল রানা। রেলিং থেকে নামতে যাবে, খস খস শব্দ পেয়ে স্থির হয়ে গেল শরীরটা। পিলারের আড়ালে রয়েছে ও, ঘাড় ফিরিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ধাপ বেয়ে উঠে আসছে একটা ছায়ামূর্তি। অন্ধকারে কাঠামোটাও ভাল করে ঠাহর করা গেল না।

নড়ল না রানা। ছায়ামূর্তির উঠে আসার মধ্যে অস্বাভাবিক কি যেন একটা

আছে। ধীরে ধীরে উঠল সে, প্রচুর সময় নিয়ে, ভয়ে ভয়ে বা সতর্কতার সাথে। বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল, হাত রাখল দুই কোমরে, তবে এদিক ওদিক বিশেষ তাকাল না। আবার পা বাড়াল, নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়াল বন্ধ দরজাটার সামনে। বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো রানা। ছায়ামূর্তি পুরুষ নয়।

তার নিঃশ্বাসের শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে, পিছন ফিরে হেলান দিল দরজার গায়ে। রীতিমত হাঁপাচ্ছে।

অদ্ভুত ব্যাপার, ভাবল রানা। রাস্তাটা প্রায় নির্জন, এলাকায় একটা ছাত্রাবাস রয়েছে, বাড়িটার এই অংশে চিরকুমার একরামুল হক ছাড়া আর কেউ বাস করে না, তার ওপর দোতলার বারান্দায় কোন আলো নেই—এই পরিবেশ আর পরিস্থিতিতে একা একটা মেয়ে কেন আসবে? আর যদি কোন প্রয়োজনে আসতেই হয়, একরামুল হক নেই দেখেও কেন দাঁড়িয়ে থাকবে?

মেয়ে, না মহিলা? বোঝা যাচ্ছে বেশ লম্বা, তবে একটু যেন কুঁজো। শাড়ি পরে আছে, তবে হাতে চুড়ি থাকলে শব্দ পেত ও। একটা হাত অপরটার তুলনায় কম নড়াচড়া করছে, সেটা বুকের কাছাকাছি উঁচু হয়ে থাকায় রানা আন্দাজ করল, হাতটায় হাতব্যাগ থাকতে পারে। আশ্চর্য, এত হাঁপাচ্ছে কেন?

একটা অপরাধবোধ জাগল রানার মনে। বারান্দায় ওর উপস্থিতি সম্পর্কে আগেই মেয়েটাকে সচেতন করা উচিত ছিল। এখন যদি শব্দ করে ও, মেয়েটা নির্ঘাত চমকে উঠবে, ভয় পেয়ে চেঁচিয়েও উঠতে পারে। ছাত্রদের একজনের কথা মনে পড়ে গেল ওর, অদ্ভুত সব চিড়িয়ার সাথে মোলাকাত ঘটবে। চিড়িয়া?

'ভয় পাবেন না,' মৃদুকণ্ঠে কথাটা বলে খস করে দিয়াশলাই জ্বালল রানা। 'আমিও হক সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করছি।' সিগারেট ধরাল ও। ধরাবার পরও কাঠিটা নেভাল না।

অদ্ভুত ব্যাপার, মেয়েটা ভয় পায়নি। রানার মনে হলো ভয়, রাগ, ঘৃণা ইত্যাদি ভাবাবেগের উর্ধ্বে উঠে গেছে এই মেয়ে। বয়স···বাইশ থেকে পঁচিশের মধ্যে হবে। সুন্দরী না হলেও সুশ্রী, কিন্তু চেহারা থেকে অকালে ঝরে পড়েছে সমস্ত লাবণ্য। পরনের শাড়িটা ছাপা চায়না সিল্ক, আজকাল খুব কম মেয়েই পরে। হাতকাটা ব্লাউজ। রানার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখ দুটো বড় বড় হলেও দৃষ্টিতে রাজ্যের ক্লান্তি, প্রায় ঢুলুঢুলু। মুহূর্তে বুঝে নিল রানা, মরণনেশা ড্রাগসে আসক্ত সে। প্যাথেড্রিন? নাকি হেরোইন? সম্ভবত প্যাথেড্রিন।

'কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন?' শুদ্ধ বাংলা, আঞ্চলিকতার কোন টান নেই, প্রশ্ন করলেও এক চুল নড়ল না সে।

হাতের কাঠিটা নিভে গেল, রেলিং থেকে নেমে দাঁড়াল রানা। 'আধ ঘণ্টা হবে। আপনি কি···?' প্রশ্নটা শেষ না করে আরেকটা কাঠি জ্বালল ও।

'এসে যখন পাননি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মেয়েটা, 'আজ আর তাহলে পাবেন না। একরাম ভাই যেখানে গেছেন, এখুনি ফিরবেন বলে মনে হয় না।'

'কোথায় গেছেন?'

দম নিয়ে কিছু বলতে গিয়েও বলল না মেয়েটা, রানার দিকে পিছন ফিরল,

একটা হাত তুলে দরজার মাথার ওপর কংক্রিটের সরু কার্নিসে কি যেন খুঁজল। এই সময় রানার হাতে নিভে গেল কাঠিটা।

অন্ধকারে ভাল ঠাহর করতে পারল না রানা কি ঘটছে। তালা খোলার আওয়াজ পেল ও। কয়েক সেকেন্ড পর খোলা দরজার ভেতর আলোকিত হয়ে উঠল কামরাটা। রানার দিকে পিছন ফিরে ঘরের আরও ভেতরে হেঁটে গেল মেয়েটা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিক মুখ করে একটা চেয়ারে বসল। ঠিক বসল না, বলা যায় নেতিয়ে পড়ল। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, কোন কৌতূহল বা সংকোচ নেই। ভেতরে ঢোকার জন্যে ডাকল না রানাকে।

দরজার কাছে এসে রানা বলল, 'ভদ্রলোক কে হন আপনার?'

'একরাম ভাই? এমনি পরিচয়, বন্ধু···কেন, আপনার কি দরকার?'

'কিছু যদি মনে না করেন, আপনাদের অনেকদিনের পরিচয়?'

চোখ বুজল মেয়েটা। 'আমি ক্লান্ত, আমাকে একটু একা থাকতে দেবেন, প্লীজ?'

দরজার চৌকাঠে হেলান দিল রানা। 'দুঃখিত। কিন্তু হক সাহেবকে আমার খুব জরুরী দরকার। যদি বলেন কোথায় তাকে পাওয়া যাবে···'

'সুজি ওয়াং চেনেন?' চোখ না খুলেই জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'চাইনীজ রেস্তোরাঁ? গেণ্ডারিয়ায়, রেল স্টেশন রোডে?'

'হ্যাঁ, ভেতরের একটা কামরায় বার-ও আছে।' চোখ খুলল মেয়েটা। 'ওখানেই পাবেন তাঁকে। জানতে পারি, কি দরকার? উনি কারও সাথে কথা বলার অবস্থায় আছেন বলে মনে হয় না।'

'ধন্যবাদ,' জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

পিছন থেকে ডাকল মেয়েটা। 'শুনুন।'

ফিরল রানা।

'আপনি কি এখুনি একরাম ভাইয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

কি যেন চিন্তা করল মেয়েটা। 'কি এমন দরকার যে···'

'উনি খুব বিপদে আছেন,' সত্যি কথাই বলল রানা।

'বিপদে আছেন!' মেয়েটার নেতিয়ে পড়া শরীর হঠাৎ নড়ে উঠল। 'অদ্ভুত তো!'

'কি অদ্ভুত?'

'খানিক আগে তার সাথে যখন কথা হলো আমার, টেলিফোনে, উনি চেঁচামেচি করে বললেন, কারা যেন তাঁর পিছু নিয়েছে। বললেন শালারা বাইরে ঘুরঘুর করছে, কাজেই রাত বারোটার আগে আমি বেরুচ্ছি না···তুমি বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করো, তোমার জন্যে প্যাথেডিন নিয়েই ফিরব···' নিজেকে সামলে নিল সে, কিন্তু তার আগেই যা বলার বলে ফেলেছে।

দ্রুত চিন্তা চলছে রানার মাথায়। উচ্চশিক্ষিত এক ভদ্রলোক, তার এই অধঃপতনের কারণ কি? গুরুতর কিছু একটা করার পর অপরাধবোধে ভুগছেন? কারা

যেন পিছু নিয়েছে–মানে? তাড়াতাড়ি সুজি ওয়াগু পৌঁছুনোর জোরাল একটা তাগাদা অনুভব করল রানা। 'ঠিক আছে, ধন্যবাদ।'

'দাঁড়ান,' আবার পিছু ডাকল মেয়েটা। 'বাড়ির সামনে দেখলাম একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনার?'

'হ্যাঁ।'

কি যেন ভাবল মেয়েটা। 'কিছু যদি মনে না করেন, আমার একটা উপকার করবেন?'

'বলুন।'

'হয় আমাকে একরাম ভাইয়ের কাছে নিয়ে চলুন,' চোখ নামিয়ে, মৃদুকণ্ঠে বলল মেয়েটা, 'নয়তো···' ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিল সে, '···নয়তো গোটা পঞ্চাশ টাকা দিন আমাকে।'

হায় নেশা! রানা ভাবল, মেয়েটা বেশিদিন বাঁচবে না। কে জানে কি দুঃখে এই সর্বনাশা পথে পা বাড়িয়েছে! ওর ভেতর থেকে কোমল একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, মেয়েটার জন্যে কিছু করা যায় না? উপযুক্ত চিকিৎসা পেলে হয়তো সেরে উঠবে। 'ঠিক আছে, চলুন।' এখুনি কোন প্রস্তাব দেয়া ঠিক হবে না, সিদ্ধান্ত নিল রানা, আজ শুধু বাড়ির ঠিকানাটা চেয়ে নেবে।

চেয়ার ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল মেয়েটা। তালা বন্ধ করল দরজার। চাবিটা রাখল দরজার মাথায়। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানার সাথে।

বাড়িটার সামনে এসে রানা দেখল, বৃষ্টির ভয়ে রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেছে। জড়োসড়ো হয়ে, নিশ্চল ওর পাশে বসে থাকল মেয়েটা। গাড়ি চালাতে চালাতে রানা তার নাম জানতে চাইল। আকাশের পুব কোণে বিদ্যুৎ চমকে উঠল।

চুপ করে থাকল মেয়েটা। চেহারায় কোন অভিব্যক্তি ফুটল না।

নরম সুরে আবার প্রশ্ন করল রানা, 'আপনি থাকেন কোথায়? বাড়িতে কে কে আছেন?'

'প্লীজ!' মিনতির সুরে বলল মেয়েটা, আর তাতেই হাঁপিয়ে গেল।

'কি ভাবছেন জানি না,' খানিক পর বলল রানা। 'কথা দিতে পারি, আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আজকাল তো ভাল চিকিৎসাও বেরিয়েছে। আপনি শুধু আমাকে আপনার ঠিকানাটা দিন।'

রানার দিকে ক্লান্ত চোখ তুলে তাকাল মেয়েটা। 'আপনি বরং গাড়ি থামান, আমি নাহয় একরাম ভাইয়ের বাড়িতেই অপেক্ষা করি।'

'ঠিক আছে, কিছু জিজ্ঞেস করব না।'

পথে আর কোন কথা হলো না। সম্ভব হলে নাম-ঠিকানা হক সাহেবের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে, ভাবল রানা। গেণ্ডারিয়ায় পৌঁছে গেল গাড়ি। সুজি ওয়াং খানিকটা দূরে থাকতেই মেয়েটা অনুরোধ করল, 'রেস্তোরাঁটার সামনে যেতে চাই না। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, গাড়িতে বসে থাকি আমি। আপনি একরাম ভাইকে ডেকে আনুন?'

'ঠিক আছে।' সুজি ওয়াঙের সামনে দিয়ে এগোল গাড়ি, দেড়শো গজের মত

আসার পর হাতের ডান দিকে একটা নির্জন গলি দেখল রানা, গলিটা ছাড়া গাড়ি রাখার আর কোন সুবিধেমত জায়গা পেল না।

গলি থেকে স্টেশন রোডে বেরিয়ে এল ও, সাথে সাথে ওকে প্রায় ছেঁকে ধরল রিকশা ড্রাইভাররা। সবারই জিজ্ঞাস্য—সাব কৈ যাইবেন? রানার চোখের সামনে আফ্রিকার একটা দৃশ্য ভেসে উঠল—কালোদের ঘাড়ে চড়ে শ্বেতাঙ্গরা অগভীর জলাশয় পেরুচ্ছে। শুধু শ্বেতাঙ্গ নয়, দুঃস্থদের ঘাড়ে চড়তে ইস্থুক কালো মহাজনদের সংখ্যাও কম নয়। কে বলল, ক্রীতদাস প্রথা উঠে গেছে? বলা যায়, ধরনটাই শুধু বদলেছে। হঠাৎ চোখ রাঙিয়ে তিরস্কার করল নিজেকে রানা—তুমিও তো কম যাও না হে, দরদী সাজার ভান করছ! অমানবিক বলে নিন্দা করা সহজ, কিন্তু রিকশায় না উঠে হেঁটে যাওয়া কঠিন। তুমি নিজে তার একটা দৃষ্টান্ত নও?

স্টেশন রোড দখল করে রেখেছে রিকশাগুলো। রাস্তায় পথচারী আর আলোর অভাব, শুধু সুজি ওয়াঙের রঙিন নিওন সাইন জ্বলছে সামনে। হালকা নীল ইউনিফর্ম পরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন দারোয়ান। রানাকে দেখে কপালে হাত ছোঁয়াল সে। ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা।

রেস্তোরাঁটা ছোট, কামরাটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে মখমলের ভারী একটা লাল পর্দা। চার কি পাঁচটা টেবিলে বসে খাওয়াদাওয়া করছে লোকজন, বয়সে সবাই তরুণ। এদের মধ্যে একরামুল হক নেই। একজন বেয়ারা এগিয়ে এল। পর্দার ওদিক থেকে বহু লোকের গুঞ্জন ভেসে আসছে।

'একরামুল হক নামে এক ভদ্রলোককে খুঁজছি।'

রানার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল বেয়ারা, কথা না বলে ইঙ্গিতে লাল পর্দাটা দেখিয়ে দিল। 'ধন্যবাদ,' বলে সেদিকে এগোল রানা। পর্দা সরাতেই দেখল, দশ-বারোটা টেবিল, প্রতিটি টেবিলে চারটে করে চেয়ার, কোনটাই খালি নেই। নিষ্প্রভ নীলচে আলোয় সিগারেটের ধোঁয়া ভাসছে, একেবারে কাছে না গেলে কাউকে চেনা যাবে না। বোঝা গেল, নামে মাত্র চাইনীজ রেস্তোরাঁ, এখানে আসলে মদ বিক্রি হয়। মনে পড়ল, বাংলাদেশে সুস্থ কোন মুসলমানকে মদ কেনার পারমিট দেয়া হয় না। সকৌতুকে ভাবল রানা, এখানে ক'জন লোক পাওয়া যাবে যাদের মুসলমানী হয়নি বা মদ খাওয়ার পারমিট আছে? টেবিলগুলোর মাঝখান দিয়ে ধীর পায়ে এগোল ও। সিগারেট ধরাবার জন্যে থামল একবার, এই সুযোগে কাছাকাছি টেবিলে বসা লোকগুলোকে দেখে নিল ভাল করে। কামরার একবারে শেষ মাথায় পৌঁছে, জানালার ধারে একটা টেবিলে বসে থাকতে দেখল একরামুল হককে। চেহারার বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। টেবিলে আরও তিনজন রয়েছে, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তারা। একরামুল হকের হাতে সিগারেট, হাঁ করে তাকিয়ে আছেন সিলিঙের দিকে।

'হক সাহেব।'

চোখ নামিয়ে তাকালেন ভদ্রলোক। তাঁর দৃষ্টি দেখে সাথে সাথে বুঝল রানা, নেশা করেছেন। মাথাটাও এদিক-ওদিক দুলছে। 'কে, বাওয়া? হ্যাঁ, এক হক সাহেবকে চিনতাম বটে···কিন্তু সে-তো কবেই মারা গেছে!'

'আপনার সাথে কিছু কথা ছিল, আমার সাথে একটু বাইরে আসবেন, প্লীজ?'

তিনজনের একজন রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওহে, অধ্যাপক, এই ভদ্রলোক বলছেন তিনি তোমার সাথে কথা বলতে চান। গিলেছ তো মোটে তিন পেগ, তাতেই এই!'

ঢলে লোকটার গায়ে পড়লেন একরামুল হক। 'কথা বলতে চাইছেন?' সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, রানার দিকে তাকালেন না। 'কে উনি? কি চান? বলে দাও, আমার এখন সময় হবে না।'

রানা বলল, 'আপনার জন্যে ভাল একটা প্রস্তাব ছিল।'

পালা করে তিন সঙ্গীর কাঁধ খামচে ধরলেন একরামুল হক, শুধু তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে নয়, ভারসাম্য রক্ষার জন্যেও বটে। 'শোনো তোমরা, শোনো! উনি আমাকে প্র-প্রস্তাব দেবেন।' ঢুলুঢুলু চোখ তুলে রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'কিন্তু ভাই, আমি তো কুমারী নই!' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন। তারপর হঠাৎ সিরিয়াস হতে চেষ্টা করলেন। 'আপনার প্রস্তাবে কি যথেষ্ট মালপানি আছে? নাকি শুকনো খটখটে প্রস্তাব?'

'আছে।'

'ক-কত?'

'লাইফের হয়ে একটা রিপোর্ট করেছিলেন, মনে আছে? আমি আপনাকে দিয়ে ওই ধরনেরই আরেকটা রিপোর্ট করাতে চাই।'

যেমন আন্দাজ করেছিল রানা, মুহূর্তে নেশা ছুটে গেল একরামুল হকের। রানার মুখে কি যেন খুঁজলেন তিনি। হঠাৎ ঠোঁটের একটা কোণ কেঁপে উঠল। 'কে আপনি? আমার সাথে ঠাট্টা করতে এসেছেন?' প্রায় কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নাড়ল রানা। 'অনেক দূর থেকে এসেছি আমি। আপনাকে খুঁজতে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। ঠাট্টা হবে কেন?'

কিন্তু একরামুল হক তবু সতর্ক। 'আপনি জানলেন কিভাবে কোথায় আছি আমি?'

'একটা মেয়ে আপনার কামরায় অপেক্ষা করছিল। খানিক আগে তার সাথে আপনার ফোনে কথা হয়েছে, তাই না?'

'ও, হ্যাঁ।' অন্যমনস্ক দেখাল ভদ্রলোককে। হঠাৎ জোড়া হাত দিয়ে টেবিলের ওপর চাপড় মারলেন তিনি, গ্লাস থেকে ছলকে পড়ল খানিকটা মদ, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'এখুনি ফিরছি,' সঙ্গীদের বললেন। 'ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে হবে।' টেবিল আর চেয়ারের মাঝখান থেকে সাবধানতার সাথে বেরিয়ে এলেন, পা বাড়ালেন পর্দার দিকে—চেষ্টা করছেন দু'পাশের টেবিলের সাথে যাতে ধাক্কা না খান। একবার রানার মনে হলো, পড়ে যাবেন। ধরার জন্যে হাত বাড়াল ও। হাতটা ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। 'লাগবে না!'

বার থেকে রেস্তোরাঁয়, রেস্তোরাঁ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। রানা সামনে, পিছনে একরামুল হক। ঠাণ্ডায় কাঁপ ধরার অবস্থা হলো রানার। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানোর বহর দেখে মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামবে।

'ওদিকে নয়,' দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। 'দোকানদার সিগারেটের টাকা পাবে।'

হাত তুলে রাস্তার আরেক দিক দেখালেন রানাকে। 'ওদিকে চলুন।' অগত্যা ঘুরতে হলো রানাকে। ওদের পিছনে রয়ে গেল গলিতে রেখে আসা গাড়িটা।

বিশ গজের মত এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভদ্রলোক, ঘুরলেন, হেলান দিলেন পাঁচিলের গায়ে–পাশের পোস্টারে টুপি পরা ও দাড়িওয়ালা এক হাতুড়ে ডাক্তার মোনাজাতের ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে স্থির হয়ে রয়েছে, নিচে লেখা–স্বপ্নে পাওয়া ওষুধে ইনশাল্লাহ আপনার ক্যানসার ভাল হয়ে যাবে। 'বলুন, কি প্রস্তাব?'

'এখানে?'

'হ্যাঁ। আপনাকে আমি চিনি না, কাজেই আপনার সাথে দূরে কোথাও আমি যেতে পারি না। এখানেই বলুন।' পাশের অন্ধকার গলি থেকে দু'জন লোককে বেরিয়ে আসতে দেখে কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। লোক দু'জন অন্য দিকে চলে যাচ্ছে দেখে ঢিল পড়ল তাঁর পেশীতে। বিকট শব্দে দূরে কোথাও বাজ পড়ল একটা, সেই সাথে বৃষ্টি শুরু হলো।

'মাস কয়েক আগে আপনি চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন, অ্যাটমিক এয়ারক্রাফট সম্পর্কে একটা গবেষণার ওপর রিপোর্ট লেখার জন্যে, তাই না?'

'বলে যান।'

'আপনার সাথে আরেক ভদ্রলোক ছিলেন–রফিকুল বারী।'

'আপনি দেখছি অনেক কিছু জানেন।'

'আপনাদের রিপোর্টটা আমি পড়েছি। চমৎকার হয়েছে। তার কারণও অবশ্য আছে–বিষয়টার ওপর আপনারা বিশেষজ্ঞ।'

ইঙ্গিতটা এড়িয়ে গেলেন ভদ্রলোক। 'প্রস্তাবটা কি বলবেন?' বৃষ্টির প্রকোপ বেড়েছে, ভিজে যাচ্ছে ওরা। 'সারারাত দাঁড়িয়ে ভিজব নাকি?'

'ওই কাজের শেষ অংশটা সম্পর্কে আগ্রহী আমি,' শান্ত সুরে, স্পষ্ট ভাবে বলল রানা। 'তবে তার আগে গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে বিস্তারিত শুনতে চাই।'

'শেষ অংশ? বিস্তারিত শুনতে চান? আমার তো ধারণা ছিল, সবই আপনি জানেন!' পাঁচিল থেকে কাঁধ তুললেন একরামুল হক। সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল করে তাকালেন, যেন রানাকে বোঝার চেষ্টা করছেন। কেন যেন আবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। 'তারচেয়ে আপনি বলুন, আমি শুনি।'

'এ-ধরনের একটা বিষয়ে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলাটা কি ঠিক হবে? আপনি চান, দুনিয়ার সবাই শুনুক?'

'আপনি দেখছি আজব একটা মানুষ!' ঠিক রাগ নয়, অভিযোগের সুরে বললেন ভদ্রলোক। 'রাস্তায় ডেকে নিয়ে এসে কি সব আবোলতাবোল বকছেন। কাজের কথা থাকলে সরাসরি বলুন, ভণিতা বাদ দিন...'

'তারচেয়ে আপনি বরং আমার বাড়িতে চলুন,' বলল রানা। 'আমার সাথে গাড়ি আছে। আর সেই মেয়েটা, আপনার বান্ধবী না কি যেন, তিনিও আমার গাড়িতে...'

'কোথায়?'

হাত তুলে সুজি ওয়াণ্ডের দিকটা দেখাল রানা। 'ওদিকের একটা গলিতে।'

'না।'

'না মানে?'

'আপনার সাথে কোথাও আমি যাব না। যদি কিছু বলার থাকে...'

'হক সাহেব,' বলল রানা, একটু কঠিন হবার প্রয়োজন বোধ করছে। 'আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে...'

রানা যা সম্ভব বলে ভাবেনি পরমুহূর্তে তাই ঘটে গেল, যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল একরামুল হকের শরীরে। ঠিক নাভীর ওপর দেড় মণ ওজনের একটি ঘুসি খেলো ও, ফুসফুস থেকে এক পলকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস। ব্যথায় কুঁজো হয়ে গেল ও, সময় আর সুযোগ পেয়ে ওর চিবুকে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে বেমক্কা গুঁতো মারলেন একরামুল হক। ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন তিনি, পাঁচিলে বাড়ি খেয়ে পতনের হাত থেকে রক্ষা পেলেন। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত রানা, ভদ্রলোককে ধরা হলো না। নিজেকে সামলে নিয়েই দৌড় দিলেন তিনি, বৃষ্টির মধ্যে একটা মিশুকের হলদেটে আলোয় রানা দেখল পাশের গলির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন।

মধ্যবয়স্ক এক লোক, মাতাল, তাকে মারধর করে পালিয়ে যাচ্ছে, নিজেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো রানার। ছুটে গলির মুখে এসে শুধু অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। তবে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ঢুকল কানে। গলির ভেতর ঢুকে ছুটল রানাও, গলা চড়িয়ে বলল, 'শুনুন, বোকামি করবেন না, দাঁড়ান!' বোঝা গেল, রানার চেয়ে দ্রুত ছুটছেন ভদ্রলোক। সামনে থেকে একটা ডাস্টবিন উল্টে পড়ার শব্দ শুনে রানা বুঝল, মাঝখানের দূরত্ব আরও বেড়ে গেছে।

আরও খানিক এগোবার পর রানা দেখল, গলিটার একটা শাখা বাঁ দিকে চলে গেছে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে বাঁক ঘুরল, আর ঠিক তখুনি পর পর দু'বার মাজল্ ফ্ল্যাশ দেখতে পেল ও, পরমুহূর্তে বাতাসে শিস কেটে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল বুলেটগুলো। ডাইভ দিয়ে রাস্তার কাদা-পানির ওপর পড়ল রানা, সাথে অস্ত্র নিয়ে আসেনি বলে তিরস্কার করল নিজেকে।

কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেল। কোন শব্দ হলো না। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা দরকার, ভাবল ও। একরামুল হকের হাতে প্রাণ হারাবার কোন ইচ্ছে নেই ওর। একটু পরই আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকাল। সামনে একটা ডাস্টবিন উল্টে পড়ে আছে, সরু গলি সম্পূর্ণ ফাঁকা।

দাঁড়াল রানা। ভিজে সপসপ করছে কাপড়চোপড়। মাথার ওপর গর্জন করছে মেঘ। পকেটে হাত ভরে একটা বন্ধ দরজার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। পেন্সিল টর্চটা বের করে একবার জ্বেলেই নিভিয়ে ফেলল। কিছুই ঘটল না। টর্চটা আবার জ্বালল। ডাস্টবিনের আবর্জনার সাথে একরামুল হকের এক পাটি জুতো পড়ে থাকতে দেখল ও, জুতোর পাশেই একটা পিস্তল। দেখে মনে হলো পুরানো একটা ব্রিটিশ সার্ভিস পিস্তল, নাইন এম এম ওয়েবলি স্কট। রুমাল দিয়ে পিস্তলটা ঢাকল রানা, সাবধানে তুলে পকেটে ভরল।

গলিটা গেছে কোন্ দিকে? শেষ মাথায় পাঁচিল, নাকি আর কোন রাস্তায় বেরুনো যাবে? সাবধানে এগোল রানা, ভয় লাগছে অন্ধকার থেকে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন একরামুল হক। যার কাছে পিস্তল থাকে, ছোরা থাকাও বিচিত্র নয়।

এঁকেবেঁকে এগিয়েছে গলিটা। মিনিট সাতেক একটানা হাঁটার পর বড় একটা রাস্তায় বেরিয়ে এল। জানা কথা, এই পথেই বেরিয়েছেন একরামুল হক। তারমানে অনেক আগেই পগার পার হয়ে গেছেন তিনি।

প্রথমে রাস্তাটা চিনতে পারল না রানা। বৃষ্টি শুরু হবার পর দু'পাশের দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে, এলাকায় এই মুহূর্তে কারেন্টও নেই। মিনিট দশেক হাঁটার পর একটা তেমাথায় পৌঁছে স্টেশন রোড চিনতে পারল। আরও মিনিট আড়াই হাঁটলে গাড়ির কাছে পৌঁছুবে ও।

সুজি ওয়াঙকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। একরামুল হক এখানে ফিরে আসবে না, কাজেই থামল না রানা। সোজা হেঁটে গলির দিকে এগোচ্ছে ও। পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, মেয়েটার সাহায্য দরকার হবে ওর। সে হয়তো বলতে পারবে, পালিয়ে গিয়ে কোথায় লুকাতে পারেন একরামুল হক। গলির মুখে চলে এল রানা। দেখল, গাড়িটা নেই। মেয়েটাকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

# আট

কয়েক সেকেন্ড ফাঁকা গলির ভেতর তাকিয়ে থাকল রানা। সমস্যার প্রকৃতি বোঝার সাথে সাথে সমাধানও উঁকি দিল মনে। যতই ক্লান্ত আর ভিজে হোক সে, পথে একরামুল হকের পায়ের দাগ তাজা থাকতেই পিছু নিয়ে ধরতে হবে তাকে। ভদ্রলোককে খুঁজে বের করার পথ একটা নয়। দীপক ব্যানার্জি রোডের কামরাগুলায়, ওর স্থির বিশ্বাস, কিছু গোপন রহস্যের চাবি অবশ্যই পাওয়া যাবে। সেগুলো কি দেখার এখনই সময়। আপাতত এই পথটাই অনুসরণ করবে ও।

'সাব, কৈ যাইবেন?' বলে কেউ ডাকল না, বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর আরোহী পেতে অনেকেরই কোন অসুবিধে হয়নি, কেউ কেউ রিকশা নিয়ে আজকের মত গ্যারেজে ফিরে গেছে। ভিজতে ভিজতে ফতুল্লার দিকে হাঁটা ধরল রানা। বেশ দূরের পথ, খালি রিকশার খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল। খানিক পর দেখল, বিদ্যুৎবেগে প্যাডেল ঘুরিয়ে একটা আসছে বটে, কিন্তু থামবে বলে মনে হলো না। তবু হাত তুলল রানা, বলল, 'এই যে ভাই, ওদিকে যাবেন নাকি?'

মাথা নেড়ে রানাকে পাশ কাটাল ড্রাইভার। ঝম ঝম বৃষ্টি মাথায় করে আবার হাঁটা ধরল ও। বিশ-পঁচিশ সেকেন্ড পর পিছনে বেল বাজল। ঘাড় ফেরাতে শুরু করেছে রানা, পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রিকশাটা। 'আহেন, সাব। কই যাইবেন?'

'আপনার বোধহয় উল্টোদিকে হয়, তাই না? ফিরে এলেন কি মনে করে?' রিকশায় চড়ে বসল রানা।

প্যাডেলে চাপ দিল ড্রাইভার, রানার দিকে তাকাল না। 'আপনে যে "আপনে" কইরা ডাক দিলেন...' দু'একটা শব্দ আরও কি যেন বলল রিকশাওয়ালা, বৃষ্টির জন্যে শুনতে পেল না রানা।

একজন লোককে উল্টোদিকে কতদূর নিয়ে যাওয়া যায়, খানিক পর রিকশা বদল করল ও। দীপক ব্যানার্জি রোডে পৌঁছুতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল। ছাত্রাবাসের গেট বন্ধ, সত্তর নম্বর বাড়ির সামনে বা গোটা রাস্তায় না আছে লোকজন, না আলো। রিকশা বিদায় করে দিয়ে হেঁটে বাড়িটার পিছন দিকে চলে এল রানা, সরু গলিটাও অন্ধকার। সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে, সাবধানতার সাথে উঠল ও। ওঠার পর ভাল করে পরীক্ষা করল বারান্দাটা, বিশেষ করে পিলারের আড়াল আর রেলিঙের নিচেটা। কেউ নেই। চাবিটা দরজার মাথার ওপরই পাওয়া গেল। ঘরের ভেতরে ঢুকে প্রথমেই দরজা বন্ধ করল রানা, তারপর আলো জ্বালল।

বিশ্রাম নেয়ার সময় নেই, কারণ মেয়েটা বা খোদ একরামুল হক ফিরে আসতে পারেন। দুটো মাত্র কামরা, একটায় লেখাপড়া ও বসার কাজ চলে, আরেকটা শোবার ঘর। ছোট্ট একটা কিচেন আর ততোধিক ছোট একটা বাথরুম রয়েছে। স্টাডি কাম ড্রইংরুমে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। বৈজ্ঞানিক কোন ইকুইপমেন্টও নেই। বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখল রানা। বেশিরভাগই টেকনিক্যাল বই। বেডরুমেও একটা বুকশেলফ রয়েছে। আলমারিটাতেও প্রচুর বই পাওয়া গেল। বেডরুমে একটা টেবিল আর চেয়ার রয়েছে। টেবিলের ওপর একটা ইংরেজি টাইপরাইটার। দেয়ালে ঝুলছে একটা বেহালা। নেড়েচেড়ে সেটা দেখল রানা।

বেডরুমেই শুধু কার্পেট রয়েছে, বহুকালের পুরানো। সেটা কয়েক জায়গায় তুলে মেঝেটা পরীক্ষা করল ও। ট্র্যাপডোর ধরনের কিছু দেখল না। দুনিয়ার জিনিস-পত্রে ঢাকা পড়ে আছে টেবিলের ওপরটা। মোজা থেকে শুরু করে ফ্লাস্ক, কি নেই। এমনকি তোবড়ানো একটা পুতুল পর্যন্ত পেল রানা। পুতুলটা ঝাঁকাল ও। ভেতরটা ফাঁকা। প্রচুর কাগজ-পত্র রয়েছে, পরীক্ষা করতে সময় লাগবে। একটা তুলে নিয়ে চোখ বুলাল ও। নামকরা এক ভারতীয় বিজ্ঞানীর চিঠি, ইংরেজিতে লেখা। কি একটা গবেষণার বিষয়ে একরামুল হকের পরামর্শ চাওয়া হয়েছে।

থামল রানা। ভাবল, কি খুঁজছে সে? বলা মুশকিল। তবে এমন একটা কিছু, যা দেখে একরামুল হককে অপরাধী ভাবা চলে। টেবিলের দেরাজগুলো দেখল ও, দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর পিছনে তাকাল, এলোমেলো করল বিছানা। টেবিলের পাশে, কার্পেটের ওপর রয়েছে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট। উপুড় করল সেটা। ছড়িয়ে পড়ল খালি সিগারেটের প্যাকেট, ভাঙা একটা চিরুনি ইত্যাদি। অনেক কাগজ, বেশিরভাগ ছেঁড়া। একটা কাগজে বিজবিজ করছে অসংখ্য টাইপ করা অক্ষর। পড়ল রানা, 'অ্যাটমিক নিউক্লিআই কন্টেইন নট ওনলি প্রোটনস, বাট বডিজ অভ সিমিলার সাইজ অ্যান্ড ওয়েট হুইচ আর ইলেকট্রিক্যালি নিউট্রাল অ্যান্ড আর নোন অ্যাজ নিউট্রনস…' সাধারণ বিষয়, তাই না? সম্ভবত ছাত্রকে দেয়া নোট হবে। উঁহুঁ, তল্লাশি চালিয়ে কোন লাভ হচ্ছে না।

আবর্জনাগুলো লোহার জালের তৈরি বাস্কেটে তুলতে যাবে রানা, হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। বাস্কেটের তলিটা নিশ্ছিদ্র টিনের পাত দিয়ে তৈরি, উল্টোদিকে ছোট একটা কার্ডবোর্ড টিউব টেপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। টেপ খুলে জিনিসটা হাতে নিল রানা। ভেতর থেকে বেরুল সেলোফিনে মোড়া সিক্স-বাই-সিক্স

নেগেটিভ-এর একটা প্যাকেট।

নেগেটিভটা বের করে আলোর সামনে ধরল রানা। হালকা রঙের ওভারঅল পরা এক মেয়ে ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভাব দেখে মনে হলো তাকিয়ে আছে জানালার দিকে। কিন্তু এইটুকুই সব নয়। তার ডান দিকে, ছবিতে পরিষ্কার ধরা পড়েছে, নল আকৃতির পায়ার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌকো একটা কি যেন, সম্ভবত ড্রইং-বোর্ড।

নেগেটিভটা তাড়াতাড়ি এনভেলাপে ভরে ফেলল রানা, এনভেলাপটা রেখে দিল ম্যানিব্যাগের ভেতর। মেয়েটা কি শারমিন চৌধুরী? নিজেদের ল্যাবে দাঁড়িয়ে আছে? আর ড্রইং-বোর্ডে কিছু যদি থাকে, কি হতে পারে সেটা?

উত্তেজনার লাগাম টেনে পরবর্তী পদক্ষেপ কি নেয়া যেতে পারে ভাবল রানা। এত রাতে, বৃষ্টি হচ্ছে, রিকশা বা বেবী ট্যাক্সি পাওয়া কঠিন হবে। তাছাড়া, ফতুল্লা থেকে রমনা অ্যাপার্টমেন্ট ভবন অনেক দূরের পথ। ঘুমোবার জন্যে একরামুল হকের বিছানাটা মন্দ কি! ভদ্রলোক ফিরে আসতে পারেন, কিন্তু তার পিস্তলটা ওর কাছে রয়েছে। বরং ফিরে আসতে পারেন বলেই এখানে ওর রাতটা কাটানো দরকার। ঘুমোবার ব্যবস্থা না হয় হবে, কিন্তু পেটে যে ছুছুন্দরীরা নাচানাচি শুরু করেছে, তার কি?

কাপড়চোপড় ছেড়ে গ্যাসের চুলোয় শুকাতে দিল রানা। হাতমুখ ধুলো। তারপর হানা দিল ফ্রিজে। আবার কাপড় পরে দরজার গায়ে একটা চেয়ার ঠেকিয়ে রাখল ও। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। পকেটে আশ্রয় পাওয়া পিস্তলের ওজন আশ্বস্ত করল ওকে, ঘুম আসতে কোন অসুবিধে হলো না। ঘুম যত গভীরই হোক, সামান্য শব্দেও যাতে জেগে ওঠে সে-ট্রেনিং দেয়া আছে নিজেকে।

অনেক বেলা করে ঘুম ভাঙল রানার। চোখ মেলেই দেখল, জানালা দিয়ে রোদ ঢুকছে ভেতরে। হাতঘড়িতে আটটা বাজে। কেউ আসেনি। একরামুল হক জানেন, দীপক ব্যানার্জি রোডে একবার এসেছে রানা, কাজেই আবারও আসতে পারে ভেবে বাড়িটা থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

বিছানা থেকে নামতে যাবে, এই সময় বারান্দায় পায়ের আওয়াজ হলো। বিছানা থেকে নিঃশব্দে নামল ও, ড্রইং আর বেডরুমের মাঝখানের দরজার আড়ালে চলে এল। পায়ের শব্দ থামল বারান্দায়। খস খস শব্দ শুনে উঁকি দিল রানা। দেখল দরজার তলা দিয়ে ড্রইংরুমে খবরের কাগজ ঢুকছে। দূরে মিলিয়ে গেল পায়ের আওয়াজ।

ড্রইংরুমে ঢুকে কাগজটা তুলে নিল রানা। হেডিঙে রাজনৈতিক খবর। আট নম্বর কলামে, একেবারে নিচের দিকে, ছোট্ট একটা খবর চোখে পড়ল। শিরোনামটা পড়ল রানা—'বুড়িগঙ্গা থেকে প্রফেসরের লাশ উদ্ধার'। খবরে বলা হয়েছে—'পুলিস সূত্রে জানা গেছে কাল রাতে ফতুল্লার কাছাকাছি রাস্তা থেকে একটা প্রাইভেট কার সরাসরি বুড়িগঙ্গা নদীতে পড়ে যায়। দুটো লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। একজন প্রফেসর একরামুল হক, অপরজন এক যুবতী, তার পরিচয় এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি...'

এইটুকুই যথেষ্ট। নষ্ট করার মত এক সেকেন্ড সময়ও নেই। যে-কোন মুহূর্তে পুলিস হাজির হতে পারে। এখনও যে কেন আসেনি সেটাই আশ্চর্য। কাগজটা ভাজ করল রানা, কোটের পকেটে ভরল, বেরিয়ে এল বারান্দায়। দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা রেখে দিল আগের জায়গায়।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ের দিকে হাঁটছে রানা, পুলিসের একটা জীপ পাশ কাটাল ওকে। কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁ দেখে ঢুকে পড়ল। ভেতরটা নোংরা, কিন্তু গুরুত্ব দিল না, বসে পড়ল খালি একটা মাছি-ওড়া টেবিলে। পকেট থেকে কাগজটা বের করে ভাঁজ খুলছে, অর্ডার না দেয়া সত্ত্বেও একটা প্লেটে করে চারটে ডালপুরী দিয়ে গেল ওয়েটার।

'চা দিন,' বলে খবরের বাকি অংশটুকু পড়তে শুরু করল রানা।

'কাল রাত প্রায় সাড়ে ন'টার দিকে অজ্ঞাতনামা এক লোক টেলিফোন করে ফতুল্লা থানায় খবর দেয় যে রাম বাবুর কাঠগোলার পিছনে একটা প্রাইভেট কার বুড়িগঙ্গা নদীতে পড়ে গেছে। পরে কাঠগোলার পিছনে নদীর কিনারায় চাকার দাগ দেখে খবরের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়। তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে ওঠায় এক ঘণ্টা পরই দুটো লাশ উদ্ধার করা গেছে। পোশাকের সাথে পাওয়া কাগজ-পত্র পরীক্ষা করে জানা গেছে তাদের মধ্যে একজন হলেন অধ্যাপক একরামুল হক। অধ্যাপক হক দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রের স্কুল অভ অ্যারোনটিকস-এ শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। দুর্ঘটনার কারণ এখনও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। পুলিস কর্তৃপক্ষ অজ্ঞাতনামা খবরদাতাকে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানিয়েছেন। তবে সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, ব্যাপারটা ঠিক দুর্ঘটনা নাও হতে পারে। রাস্তা থেকে নদী খানিকটা দূরে হওয়ায় এ-কথা মনে করার কারণ আছে যে ঘটনার পিছনে মানসিক ভারসাম্যহীনতা বা ভাবাবেগের অবদান থাকতে পারে। আশা করা হয়েছে আজ দুপুরের মধ্যে গাড়িটা উদ্ধার করা সম্ভব হবে।'

## নয়

সেদিনই বিকেলের পর দ্বিতীয়বার যখন বি.সি.আই. হেডকোয়ার্টারে ঢুকল রানা, চীফ রাহাত খানের চেম্বারে দশাসই এক ভদ্রলোককে কার্পেটের ওপর অস্থিরতার সাথে পায়চারি করতে দেখল ও। রাহাত খান পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক রিসার্চ প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান-এর ডিরেক্টর, উইং কমান্ডার হাবিবুর রহমান। চট্টগ্রাম থেকে খানিক আগে পৌঁচেছেন, রাহাত খানের জরুরী বার্তা পেয়ে।

বসের অনুমতি পেয়ে একটা চেয়ারে বসল রানা। ইতোমধ্যে পায়চারি থামিয়েছেন উইং কমান্ডার, রানার পাশের চেয়ারটায় বসলেন, বিশাল শরীরের আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল সেটা। 'মেজর,' ভদ্রলোক আড়ষ্ট একটু হাসলেন, 'বুঝতে পারছি না আপনাকে অভিনন্দন জানাব, নাকি আপনার নিন্দা করব। আপনি

আমাকে বিপদে ফেলে দিয়েছেন।' ডেস্ক থেকে তুলে রানার দিকে একটা থারটি-বাই-ফরটি প্রিন্ট বাড়িয়ে দিলেন। 'দেখুন এটা।'

'তোমার নেগেটিভের এনলার্জমেন্ট,' ব্যাখ্যা করলেন রাহাত খান।

পরিষ্কার, ঝকঝকে ছবি। ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানো মেয়েটা অবশ্যই শারমিন চৌধুরী। কিন্তু রানাকে স্তম্ভিত করল তার ডান দিকে ঢালু ড্রইং-বোর্ডের বিষয়বস্তু।

'ওখানে আপনি আমাদের সমস্ত পরিশ্রম আর সাধনার যাবতীয় ফল দেখতে পাচ্ছেন,' গম্ভীর সুরে বললেন উইং কমান্ডার। 'অ্যাটমিক এয়ারক্রাফট তৈরির জন্যে অ্যান্টি-র‍্যাডিয়েশন স্ক্রীন-এর ব্লু-প্রিন্ট। বোর্ডের বাঁ দিকে, একেবারে মাথার কাছে পিন দিয়ে আটকানো রয়েছে রিয়াজুল হাসান আর তার সহকর্মীদের আবিষ্কারগুলোর টাইপ করা স্পেসিফিকেশন—ওয়েট, কমপোজিশন, মেটেরিয়ালস, মেথড অভ ফিক্সিং এটসেটেরা। খালি চোখে ওগুলো আপনি পড়তে পারবেন না, তবে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলে প্রতিটি অক্ষর পরিষ্কার পড়া যাবে। বুঝে দেখুন, কি ঘটে গেছে!'

'গুড গড!' বিড়বিড় করে উঠল রানা, হতভম্ব হয়ে গেছে। উইং কমান্ডার, তারপর বসের দিকে তাকাল ও, দু'জনেই তাঁরা চুপ করে থাকলেন। অবশেষে দম ফেলল রানা, 'কথাটা তাহলে এমনি বলা হয় না, বিজ্ঞানীদের কখনও বিশ্বাস কোরো না।'

'এর জন্যে অবশ্যই ভুগতে হবে রিয়াজুল হাসানকে,' গমগম করে উঠল উইং কমান্ডারের ভারী গলা। 'ওর বেঁচে থাকা অসম্ভব করে তুলব আমি? ব্লাডি ট্রেইটর!'

'তাই কি?' প্রশ্ন করলেন রাহাত খান। 'সত্যি কি লোকটা বেঈমান? তুমি কি বলো, রানা?'

'ঠিক মেলে না,' সতর্কতার সাথে বলল রানা। 'রিয়াজুল হাসান, সুব্রত বড়ুয়া বা শারমিন চৌধুরী, তিনজনই ওঁরা যখন খুশি ডকুমেন্টগুলো চাইলেই পেতে পারেন। ল্যাবের চাবি শুধু রিয়াজুল হাসানের কাছে থাকে, এ আমি বিশ্বাসই করিনি। জানা কথা, তিনজনই যখন ইচ্ছে ঢুকতে বা বেরুতে পারেন। ওঁদের কেউ যদি টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট বিদেশে পাচার করতে চান, একটা ক্যামেরা নিয়ে একা ঢুকলেই পারেন। সবদিক থেকে নিরাপদ সেটা। কিন্তু তা না করে, ঝুঁকির পথটা কেন তিনি বেছে নেবেন? কি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে, ভেবে দেখুন। ড্রইং-বোর্ডটা ডকুমেন্ট দিয়ে সাজাতে হয়েছে, পাশে দাঁড় করাতে হয়েছে শারমিন চৌধুরীকে অর্থাৎ তাঁকে অপরাধের সাক্ষী বানানো হয়েছে, তারপর বলা হয়েছে, "এক মিনিট, ডার্লিং, স্থির হয়ে দাঁড়াও—একরামুল হক সাহেব ছবিটা তারতে পাঠাতে চান"। অসম্ভব না?'

অন্য কোন পরিস্থিতি হলে উইং কমান্ডার অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন। কিন্তু তিনি শুধু মুচকি একটু হাসলেন। 'তাহলে?'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছি, রানা,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু বিকল্পটা কি হতে পারে?'

'আমাদের কাছে যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক, এর জন্যে দায়ী অবহেলা,' বলল

রানা। টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট সারাক্ষণ হাতের কাছে থাকায়, দেখতে দেখতে বিজ্ঞানীরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে নিরাপত্তার দিকগুলো বেমালুম ভুলে বসেছিলেন।'

'এ অসম্ভব!' তিরস্কারের সুরে বললেন উইং কমান্ডার।

'রানা বোধহয় ঠিক বলছে,' রাহাত খান বললেন। 'এই ব্যাপারটা থেকেই এসপিওনাজ জগতে যত সমস্যার সৃষ্টি–বিজ্ঞানীরা ভুলে যায়।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'তাহলে এখন তুমি কি করবে বলে ভাবছ?'

'এক মিনিট, স্যার,' উইং কমান্ডার রাহাত খানকে বললেন, ফিরলেন রানার দিকে। 'তাহলে কি ধরে নেব, আপনি বলছেন, ওদের তিনজনের বিরুদ্ধে আমি কোন অ্যাকশন নেব না? যেমন কাজ করছে তেমনি করে যেতে দেব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'অ্যাকশনের ব্যাপারে আমি বলব–না। কাজ করার ব্যাপারেও–না। গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে ওঁদেরকে হাত দিতে দেয়া উচিত হবে না। কি সর্বনাশ ঘটে গেছে, সেটা ওঁদেরকে আমি জানাতে চাই। তার আগে আরেকটা কথা–সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্টই কি পাচার হয়েছে? নাকি পাচার হবার যোগ্য আরও কিছু আছে ওখানে?'

'প্রজেক্টটা তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এখন পর্যন্ত ওরা শুধু দুটো ভাগ নিয়ে কাজ করেছে। বাকি অর্থাৎ শেষ ভাগটা নিয়ে কাজ শুরু হবে আগামী মাসে। গুরুত্বের বিবেচনায় সেটাও প্রথম দুটোর তুলনায় কম নয় কোন অংশে।'

'তারমানে কি দুটো যদি পাচার হয়ে থাকে, ফর্মুলাটা সম্পূর্ণ পায়নি ওরা?'

মাথা নাড়লেন উইং কমান্ডার। 'পায়নি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'তাহলে তো ওদেরকে কাজ করতে দেয়া আরও উচিত নয়।'

'এখন কি ঘটবে?' প্রশ্ন করলেন উইং কমান্ডার।

চুরুট ধরাতে যাচ্ছিলেন রাহাত খান, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তিনিও রানার দিকে তাকালেন।

'একরামুল হক সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে, তাঁকেই বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু অন্য রকম চিন্তা-ভাবনা করার কারণও আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'যেমন?'

'তিনি নিশ্চয়ই খবর পেয়েছিলেন যে আমরা তাঁকে খুঁজছি। তাহলে, একটা কপি ভারতে পাঠাবার পরও কেন তিনি আরেকটা কপি ঘরে রেখেছিলেন? কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি ওটা নষ্ট করে ফেলেননি কেন?'

'এমন হতে পারে,' আন্দাজ করলেন রাহাত খান, 'তার ভারতীয় বন্ধুরা তাকে সাবধান করেনি। নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভেবেছিল সে।'

রানা বলল, 'আমার তা মনে হচ্ছে না, স্যার। বিজনেস সিন্ডিকেট অবশ্যই তাকে সাবধান করবে। তারা বিশ্বাস করেছে জাহাজে করে ঢাকায় আসার সময় মাইক্রোফিল্মটা আমি দেখেছি, তা না হলে তারা আমাকে প্রজেক্ট জিরো-জিরো-

ওয়ানের কথা বলত না। লোক দু'জন দিল্লীতে ফিরে না যাওয়ায় বিজনেস সিন্ডিকেট ধরে নিতে বাধ্য যে ঢাকার বেঈমানটাকে অর্থাৎ তাদের লোককে খোঁজ করা হবে। কেন তাহলে একরামুল হককে তারা সাবধান করবে না?'

'এমন হতে পারে না যে তারা জানত, কিন্তু একরামুল হককে জানায়নি?' চুরুট কামড়ে ধরে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন রাহাত খান। 'হতে পারে না, তারা আসলে একরামুল হককে হারাতে চাইছিল!'

গুরু-শিষ্য তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ। রানা শুরু করল, 'কিন্তু...'

বাধা দিলেন রাহাত খান। 'এক মিনিট। মাতাল একরামুল হকের দ্রুত অধঃপতন ঘটছিল, বিজনেস সিন্ডিকেটের দৃষ্টিতে লোকটা হয়ে উঠছিল বিরাট একটা সিকিউরিটি রিস্ক। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে কি ঘটে, সবাই আমরা জানি। হয় তাকে দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়, নয়তো ফেলে দেয়া হয় বাঘের খাঁচায়।'

'বাঘ মানে আমরা?' উইং কমান্ডার জিজ্ঞেস করলেন, নিজেদের পরিচয় উপলব্ধি করে চোখ জোড়া তাঁর বিস্ফারিত হয়ে গেছে।

তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রাহাত খান বললেন, 'ছোটখাট এজেন্টদের একটা কন্ট্র্যাক্ট দেয়া হয়—ভুয়া পরিচয় নিয়ে এক লোক, সে তাদেরকে জানায় কখন ও কোথায় তাদের দেখা হবে। এই লোক যদি আসতে ব্যর্থ হয়, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, হারিয়ে গেল এজেন্ট। তারপর, সে যদি ধরা পড়ে, ফাঁস করার মত কিছুই তার থাকবে না। আমরাও তার পিছনের লোকগুলোকে কোন দিন খুঁজে পাব না।'

রানা বলল, 'কিন্তু লোকটা না আসাতে এজেন্ট একটা ওয়ার্নিং পেল না?'

'পেল। আর, এ-ধরনের ওয়ার্নিং থেকে সে বুঝে নেবে বন্ধুরা তাকে পরিত্যাগ করেছে। ফলে একরামুল হকের মত দুর্বলচিত্ত লোকের সামনে একটাই পথ খোলা থাকে—নদীতে ঝাঁপ দেয়া।'

'জল-চিকিৎসা!' মুচকি হাসলেন উইং কমান্ডার।

'তোমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার পর,' রাহাত খান বললেন, 'একরামুল হক কি করল? ঘুরপথে তোমার গাড়ির কাছে চলে আসে সে, দেখতে পেয়ে মেয়েটা তাকে তাকল। সম্ভবত গাড়িতে ওঠার পর আত্মহত্যা করার উপায়টা দেখতে পায় সে। ফুলশয্যায় যাচ্ছিল, হঠাৎ বাঁক নিয়ে নদীর দিকে ছুটল গাড়ি।'

'কিন্তু মেয়েটাকে সাথে নিয়ে কেন?'

'একরামুল হক ভেবে থাকতে পারে, মেয়েটারও বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই। ব্লাগসের শিকার, তাকে হয়তো ভালও বাসত লোকটা, নিজেদেরকে আলাদাভাবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিল না। তবে, আমিও চাই লোকটার অতীত সম্পর্কে আরও তথ্য যোগাড় হোক।'

'কাঠগোলার পিছনে, অত রাতে, লোকজন থাকার কথা নয়,' বলল রানা। 'অথচ একজন লোক গাড়িটাকে পড়ে যেতে দেখল নদীতে। থানা খুব বেশি দূরে নয়, কিন্তু সেখানে না গিয়ে সে টেলিফোন করল, নিজের পরিচয় প্রকাশ করল না। আমি তার পরিচয় জানার চেষ্টা করি। গাড়িটাও একবার দেখে আসা দরকার।'

'পুলিসের সাথে তোমার কথাও বলা দরকার,' রাহাত খান পরামর্শ দিলেন। 'ইতিমধ্যে তারা জেনেছে গাড়িটা শফিকুর রহমানের নামে ভাড়া করা হয়েছিল।'

'গাড়ি হারানোর খবর সকালেই আমি থানায় জানিয়ে দিয়েছি,' বলল রানা। 'টেলিফোনে। রেন্ট-এ-কার কোম্পানীকেও বলেছি।'

'তাহলে এখানের কাজ সেরে কালই আবার তুমি চট্টগ্রামে ফিরে যাও। বিজ্ঞানীরা কি বলেন দেখো।'

'চট্টগ্রামে কোথায় আমার সাথে যোগাযোগ করতে হবে আপনি জানেন?' জিজ্ঞেস করলেন উইং কমান্ডার। মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কি ঘটল আমাকে তাহলে জানাবেন, প্লীজ।'

'জানাব,' বলল রানা। 'ফটোগ্রাফটা কি আমার কাছে থাকতে পারে?'

'রাখো,' বললেন রাহাত খান। 'ওটা তোমার লাগবে।'

ফতুল্লা থানায় যাবার আগে সামরিক ইউনিফর্ম পরল রানা। চোখে হালকা ফ্রেমের সান গ্লাস আর ঠোঁটের উপর সরু গোঁফ লাগিয়ে খানিক বদলে নিল চেহারা। বলা তো যায় না, সত্তর নম্বর দীপক ব্যানার্জি রোডের বাড়িটায় ওকে হয়তো ঢুকতে বা বেরুতে দেখেছে কেউ।

ফতুল্লা থানার ও. সি., ফারুক আহমেদ, একজন মেজরকে ঢুকতে দেখে শশব্যস্ত ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। নিজের পরিচয় দিল রানা, হাত বাড়াল করমর্দনের জন্যে, সে-ই ফারুক আহমেদকে বলল, 'বসুন।' ডেকের এ-ধারে নিজেও একটা চেয়ারে বসল ও। তারপর আলাপের সুরে প্রশ্নপর্ব শুরু করল।

অজ্ঞাতনামার কোন কল এসেছিল, কাঁটায় কাঁটায় ন'টা বিয়াল্লিশ মিনিটে। কোত্থেকে ফোনটা করা হয়েছে, তদন্ত চালিয়ে জানতে পেরেছে থানা। অকুস্থল থেকে সবচেয়ে কাছের টেলিফোন ওটা, দক্ষিণ পাড়ায়, একটা আবাসিক বাড়ির। বাড়ির মালিক তাঁর ড্রইংরুমে বসে পড়াশোনা করছিলেন, এই সময় দরজায় নক হয়। আগন্তুককে বেকার যুবক বলে মনে হয়েছে তাঁর। ভদ্রলোককে সে জানায়, রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসার সময় একটা গাড়িকে নদীতে পড়ে যেতে দেখেছে সে, থানায় ফোন করতে চায়। ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞেস করেন, থানা তো কাছেই, টেলিফোন করার দরকার কি? উত্তরে যুবক বলে, কাছে হলেও তার উল্টোদিকে হয়। তাছাড়া, থানায় গিয়ে খবর দিলে তার নাম-ঠিকানা লিখে রাখা হবে, আবার হাজিরা দিতে বলতে পারে, ইত্যাদি নানা ঝামেলা। তাই সে শুধু ফোন করে দায়িত্বটা কাঁধ থেকে নামাতে চায়। এরপর ভদ্রলোক তাকে টেলিফোনটা দেখিয়ে দেন।

নদী থেকে উদ্ধার করা গাড়িটা দেখানোর জন্যে গ্যারেজে নিয়ে আসা হলো রানাকে। 'আপনার কি ধারণা তাহলে?' ফারুক আহমেদকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'অ্যাক্সিডেন্ট, নাকি অন্য কিছু?'

'আপনি বরং, স্যার,' বললেন ও. সি., ইতোমধ্যে রানা আপত্তি করা সত্ত্বেও সম্বোধন পাল্টাতে সফল হলেন না তিনি, 'আগে গাড়িটা দেখুন চিনতে পারেন কিনা।'

ঝুঁকে গাড়ির ভেতর, ড্যাশবোর্ডে ফিট করা ঘড়িটার দিকে তাকাল রানা। ন'টা আটত্রিশ মিনিটে বন্ধ হয়ে গেছে ওটা। 'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল ও। 'বুটে আমার একটা সুটকেস থাকার কথা।'

'ছিল, আছে,' আশ্বস্ত করলেন ফারুক আহমেদ। 'অফিসে পাবেন, স্যা···জ্বী, প্রথমে আমরা দুর্ঘটনা বলেই মনে করেছিলাম। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল, মেইন রোড থেকে বেশ চওড়া একটা কাঁচা রাস্তা রাম বাবুর কাঠগোলার পাশ ঘেঁষে নদীর দিকে চলে গেছে, অন্ধকারে মেইন রোড থেকে সেটাকে আলাদাভাবে চেনা সম্ভব নয়। কাঁচা রাস্তাটা লম্বা নয়, দেড়শো গজের মত হবে। অধ্যাপক সাহেব মদ খেয়েছিলেন। কিন্তু পরে অন্যরকম চিন্তা-ভাবনা করার কারণ ঘটেছে।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'অধ্যাপক হকের বন্ধু-বান্ধবরা বলছেন, ইদানীং প্রায়ই নাকি তিনি আত্মহত্যার কথা বলতেন।'

'কেন, কারণ কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কারণ কি তা কেউ পরিষ্কার বলতে পারছে না। কারও কারও ধারণা, লাবণীর বিয়ে ভেঙে যাবার পর থেকেই আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে ওঠেন হক সাহেব।'

'লাবণী মানে দ্বিতীয় লাশ?'

'জ্বী। তার পরিচয়ও আমরা জানতে পেরেছি। আমাদের এলাকার অত্যন্ত নামকরা এক হেডমাস্টার সাহেবের মেয়ে। এক পাষণ্ডের সাথে বিয়ে হয়েছিল। বাবার কাছ থেকে যৌতুকের টাকা চাইতে পারবে না বলে রোজই বেচারিকে স্বামীর হাতে মারধর খেতে হত। তারপর লোকটা দ্বিতীয় বিয়ে করল। তলপেটে লাথি খেয়ে লাবণীকে একবার হাসপাতালে যেতে হয়, তখনই প্রথম প্যাথেডিন নিতে হয় তাকে। ব্যথাটা পুরোপুরি সারেনি। অসহ্য লাগলেই প্যাথেডিন নিত। এভাবেই অভ্যেস হয়ে যায়। এরপর স্বামী তাকে তালাক দেয়। প্যাথেডিন কিনতে গিয়েই হক সাহেবের সাথে তার পরিচয়। সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠতা। কেউ কেউ বলছে, বিয়ে ভেঙে যাবার পর হক সাহেব লাবণীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লাবণী নাকি রাজি হচ্ছিল না। কাজেই, আমরা ধরে নিচ্ছি, গাড়িতে ওদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ ব্যাপারটা দুর্ঘটনাও হতে পারে, আবার আত্মহত্যাও হতে পারে।'

রানা খানিকটা স্বস্তিবোধ করল এই ভেবে যে ও. সি. আরও গভীরে যেতে আগ্রহী নয়। অফিস থেকে সুটকেস নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল ও। মনে খচখচ করে একটা প্রশ্ন বিঁধছে।

ন'টা আটত্রিশ মিনিটে পানিতে পড়ে গাড়িটা। ড্যাশবোর্ডের ঘড়ি সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা মিথ্যে বলে না। ঘড়িটা যে নির্ভুল সময় দেয়, ওর জানা আছে। অথচ ও. সি. বলছে, অজ্ঞাতনামার ফোন কল এসেছিল কাঁটায় কাঁটায় ন'টা বিয়াল্লিশে। সময়ের এই হিসেব সম্পর্কেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, কারণ ফোন আসার সাথে সাথে ডিউটি সার্জেন্ট সময়টা খাতায় টুকে রেখেছে। তারমানে গাড়িটাকে নদীতে পড়তে দেখা আর ফোন করার মাঝখানে সময় ব্যয় হয়েছে মাত্র

চার মিনিট। চার মিনিট অত্যন্ত কম সময় নয়?

রাম বাবুর কাঠগোলা কাছেই, মটরসাইকেল নিয়ে দক্ষিণ পাড়া হয়ে পৌঁছে গেল রানা। আসার পথে বাড়িটাও দেখল, যে-বাড়ি থেকে টেলিফোন করা হয়েছিল। বাড়ি আর নদীর কিনারা, মাঝখানে আধ মাইলেরও বেশি দূরত্ব। দ্রুত হাঁটলে একজন লোক আট মিনিটে পেরুতে পারবে, দৌড়ালে লাগবে অর্ধেক সময়–কোন অবস্থাতেই চার মিনিটের কমে সম্ভব নয়। কিন্তু তাহলে যুবক বাড়ির মালিকের সাথে কথা বলার সময় পেল কোত্থেকে? উঁহুঁ, ঘাপলা মনে হচ্ছে।

আবার দক্ষিণ পাড়ার বাড়িটার সামনে ফিরে এল রানা। কলিং বেল বাজাতে প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন। ইউনিফর্ম দেখে ভুরু কোঁচকালেন তিনি। নিজের পরিচয় দিয়ে রানা জানাল, কাল রাতে চুরি যাওয়া গাড়িটা তার। 'ভাগ্য ভাল যে গাড়িটাকে নদীতে পড়তে দেখেছিল একজন, তা না হলে ওটা উদ্ধার করা যেত কিনা সন্দেহ।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' ভদ্রলোক বললেন। 'ভেতরে এসে বসুন না।'

'জ্বী-না, ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'যুবকের প্রতি সত্যি আমি কৃতজ্ঞ। সামান্য কিছু উপহার দিতে চাই, কিন্তু তার ঠিকানা তো জানি না। আপনি তাকে চেনেন···?'

'পুলিসও জিজ্ঞেস করেছিল। না।'

এক মুহূর্ত পর রানা বলল, 'সে যে-ই হোক ঝড়ের গতিতে ছুটে আসতে হয়েছে বেচারিকে। নিশ্চয়ই হাঁপাচ্ছিল?'

'হাঁপাচ্ছিল? না তো!' প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন। 'সম্পূর্ণ শান্ত দেখলাম তাকে আমি। তবে গাড়ি নিয়ে এসেছিল কিনা বলতে পারব না।'

ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল রানা। প্রমাণ যা দরকার ছিল, পাওয়া গেছে। অজ্ঞাতনামা যুবক নদীর কিনারায় ছিল না, গাড়িটাকে সে নদীতে পড়তে দেখেনি। অথবা লোকটা গাড়ি নিয়ে ফোন করতে এসেছিল।

## দশ

পরদিন সকাল ন'টা, চট্টগ্রামে নিজের হোটেল কামরায় গিলটি মিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে রানা। প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়্যানের বিজ্ঞানীরা গত দু'দিন কি করেছে না করেছে তার কাছ থেকে জানা যাবে। ওর বিশ্বাস, অবহেলাই যদি সত্যি দায়ী হয়, রিপোর্টটা হবে নেতিবাচক। আর যদি···

খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল রানা, হোটেলের উঠানে তাকাল। একটা ট্রাক থেকে শাক-সব্জি নামানো হচ্ছে। রেডিওতে খানিক আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস শুনেছে রানা, ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট।

একরামুল হকের ব্যাপারটা এখনও চিন্তার মধ্যে রেখেছে ওকে। বসের কথাই বোধহয় ঠিক, ভাবল ও, বিজনেস সিন্ডিকেট হয়তো হক সাহেবকে খরচের খাতায়

তুলতে চেয়েছিল। অজ্ঞাতনামা যুবক সম্ভবত সুজি ওয়াঙেই বসেছিল, একরামুল হককে নিয়ে রানা যখন বেরিয়ে এল, সে ওদেরকে অনুসরণ করে। তারপর, গাড়ি নিয়ে একরামুল হক নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাথে সাথে পুলিসে ফোন করার জন্যে দক্ষিণ পাড়ায় চলে আসে, তার সাথেও হয়তো একটা গাড়ি ছিল। কিন্তু কেন? কারণ, উদ্দেশ্য যাই হোক, বিজনেস সিন্ডিকেটের যুবক এজেন্ট আর তার সঙ্গীরা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল, তারা একরামুল হককে খুন করার আগে বি. সি. আই. যেন ভদ্রলোকের পিছু নেয়। হ্যাঁ, খুন করার আগে। কারণ রানার বিশ্বাস, একরামুল হক নিজে যদি আত্মহত্যা না করতেন, তারাই তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিত। এই অদ্ভুত কাহিনী থেকে কি উপসংহার বেরিয়ে আসছে?

গিলটি মিয়া যখন এল, তখনও চিন্তা করছে রানা। এসেই ঝড় তুলল গিলটি মিয়া। বিশদ রিপোর্ট, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। শারমিন চৌধুরী আর সুব্রত বড়ুয়ার টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা হয়েছে। ল্যাবরেটরিতে যাওয়া ছাড়া, গত দু'দিন বাড়ি থেকে একবারও বেরোয়নি রিয়াজুল হাসান। একটা মাত্র ফোন পায় সে। তার বোনের কাছ থেকে, পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা হয়।

'তা'পর, স্যার, কাল রেতে,' চেহারায় উত্তেজনা নিয়ে বলল গিলটি মিয়া, 'রিয়াজ সাহেব নিজে একটা ফোন কোরলেন।'

'কোথায়?'

'ওয়াসা অপিসে, স্যার। ট্যাপ নাকি লিক হয়ে গেচে…'

'ঠিক আছে, ওটা বাদ দিয়ে যাও।'

'সেকি, স্যার! আপনি জানতে চান না মিস্ত্রি এয়েচিল কিনা?'

'না।'

'কিন্তু, স্যার, এয়েচিল!'

'রিয়াজ সাহেব সম্পর্কে তাহলে এইটুকুই বলার আছে তোমার?'

'জ্বি।'

'এবার তাহলে বাকি দু'জন সম্পর্কে বলো।'

বাকি দু'জন সম্পর্কেও জানার মত কিছু নেই। দু'দিনই সন্ধ্যার সময় পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তারা, প্রথম দিন আগ্রাবাদের একটা চাইনীজ রেস্তোরাঁয় ডিনার খায়, সিনেমা দেখে। দ্বিতীয় দিন আরেক চাইনীজ হোটেলে খায়। সুব্রত বড়ুয়া শারমিন চৌধুরীকে হোস্টেলে পৌঁছে দেয়। সে অবশ্য তার কামরায় ঢুকতে চেয়েছিল, কিন্তু শারমিন চৌধুরী তাকে সে সুযোগ দেয়নি, কৌশলে এড়িয়ে গেছে। দু'দিন সকালেই শারমিনকে ফোন করে সুব্রত। 'কি কি কতা হলো, আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না, স্যার।' লজ্জা পাবার ভঙ্গি করল গিলটি মিয়া। 'সে আমি আপনাকে বলতেও পারব না।'

'আহ্, গিলটি মিয়া, তুমি সিনেমায় অভিনয় করছ না, একটা ইনভেস্টিগেশনে সাহায্য করছ। সংক্ষেপে বলো।'

'সুব্রত বাবু, স্যার,' মাথা নিচু করে মৃদুকণ্ঠে জানাল গিলটি মিয়া। 'ছুঁড়িটাকে…খুড়ি, গোলাপীকে পটাবার চেষ্টা করচিল।' শারমিন চৌধুরীকে ছুঁড়ি

বলতে পারবে না, রানা এই নিষেধাজ্ঞা জারির পর তার একটা নাম রেখেছে সে।

'ও, আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কিছু?'

'গোলাপী তার খালাকে একবার ফোন করেচে। আর সুব্রত বাবু মফিজ নামে তার এক দোস্তকে।'

'বন্ধুর সাথে কি কি কথা হলো?'

'কবে বেড়াতে আসচে, ছোট্টোবোনের চশমার পাওয়ার মিলেচে কিনা…'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'ঠিক আছে, বুঝেছি। এবার তুমি তোমার কাজে যাও।' গিলটি মিয়াকে বিদায় করে দিয়ে নিজেও রানা বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে রওনা হলো এয়ারফোর্সের ল্যাবরেটরি ভবনের দিকে।

থমথমে চেহারা নিয়ে রানাকে অভ্যর্থনা জানালেন রিয়াজুল হাসান। 'হক সাহেবের দুর্ঘটনা সম্পর্কে কাগজে পড়লাম। আপনি নিশ্চয় আরও বিস্তারিত জেনেছেন।'

'হ্যাঁ, তা জেনেছি,' বলল রানা।

'এই ব্যাপারটার সাথে ভদ্রলোকের মৃত্যুর সম্পর্ক আছে?'

'আমার তাই বিশ্বাস।'

'তাহলে আপনার ধারণা…'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একরাম সাহেবই অপরাধী ছিলেন। এ-ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ঘটনাটা থেকে আপনাদের জন্যে একটা শিক্ষাই বেরিয়ে আসে, এসপিওনাজ সাংঘাতিক বিপজ্জনক ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, তা তো বটেই। কিন্তু, ভদ্রলোক এখানে মাত্র একবারই এসেছেন–কিভাবে তিনি তথ্যটা নিয়ে গেলেন আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এ-ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারব,' শুকনো গলায় বলল রানা। 'আপনার সহকর্মীরা সবাই উপস্থিত তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' ওয়েটিং রুম থেকে রানাকে ল্যাবে নিয়ে এলেন রিয়াজুল হাসান। শারমিন চৌধুরী আর সুব্রত বড়ুয়াকে দেখা মাত্র, দু'জনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক জানা থাকায়, ক্ষীণ একটু অপরাধবোধ জাগল রানার মনে। অদ্ভুতই বলতে হয়, এতদিন এসপিওনাজ জগতে থেকেও এ-ধরনের অনুভূতি বিসর্জন দিতে পারেনি ও।

'গুড মর্নিং,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'আপনাদের তিনজনকে একটা জিনিস দেখাব আমি।' সুব্রত বড়ুয়া আর শারমিন চৌধুরী কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল, রিয়াজুল হাসানকে শুধু কৌতূহলী মনে হলো। সাথে করে একটা লেদার পোর্টফোলিও নিয়ে এসেছে রানা, সেটা থেকে এনলার্জ করা ফটোগ্রাফটা বের করল। প্রথমে রিয়াজুল হাসানকে দেখতে দিল ও, সতর্কতার সাথে দেখার পর দেরাজ খুলে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করল সে। তারপর আরও কিছুক্ষণ দেখল, আতঙ্কে নীল হয়ে গেল তার চেহারা। 'বাট দিস ইজ ফ্যানটাসটিক…!' ফটো আর গ্লাসটা সুব্রত বড়ুয়ার দিকে ঠেলে দিল সে।

যতটা না আতঙ্কিত, তারচেয়ে বেশি বিস্মিত হলো সুব্রত বড়ুয়া। চোখে নগ্ন

অবিশ্বাস নিয়ে রিয়াজুল হাসানের দিকে তাকাল সে। 'এ-ধরনের একটা ভুল আপনারা করলেন কিভাবে!'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রিয়াজুল হাসান। 'শারমিনকে দেখাও।'

শারমিন চৌধুরী ফটোটা পরীক্ষা করল, ভুরু কোঁচকাল, রানার দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকাল যেন কোন ব্যাখ্যা পেতে চায়, কিন্তু কেউ কোন কথা না বলায় নিজেই নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'এ আমি বুঝতে পারছি না।' রিয়াজুল হাসানের দিকে তাকাল সে। 'আপনি পারছেন?'

রিয়াজুল হাসান কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় কথা বলল রানা, 'এই ছবিটা লাইফ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়নি। সেটায় শুধু দেখা গেছে আপনি আর শারমিন চৌধুরী জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। এটা হলো আরেকটা, যেটার কথা আপনি আমাকে বলেছিলেন আমি যখন আপনার সাথে প্রথমবার দেখা করি–শারমিন চৌধুরীর একক ফটো। ফটোয় বহু কিছু ধরা পড়েছে, তাই না? এর কি ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?'

'আমি জোর দিয়ে বলতে পারি...' শুরু করল শারমিন চৌধুরী।

তাকে থামিয়ে দিয়ে রিয়াজুল হাসান বললেন, 'মেজর,' রীতিমত ঘাবড়ে গেছে সে, 'এ-ব্যাপারে কি বলব জানি না। ফটোটা না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না...কসম খেয়ে বলতাম হক সাহেবরা যেদিন ল্যাবে আসেন সেদিন সকালে আমাদের সমস্ত টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট তালাচাবির ভেতর রাখা হয়েছিল। শারমিন, তুমি কি বলো?'

শারমিন চৌধুরী এতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে যে কয়েক সেকেন্ড কথাই বলতে পারল না। 'হ্যাঁ,' অবশেষে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'আমি জানি তালাচাবির ভেতর ছিল।'

ঠোঁটে অসহিষ্ণু হাসি নিয়ে রিয়াজুল হাসান বললেন, 'কিন্তু তা ছিল না, দেখতেই পাচ্ছ–ফটোগ্রাফটা উল্টো কথা বলছে। দু'জনেরই ভুল হচ্ছে, তবে আমি অন্তত আমার চোখের সাক্ষ্য মেনে নিচ্ছি।'

'না, কিন্তু...' শুরু করল শারমিন চৌধুরী।

'এর মধ্যে কোনই কিন্তু নেই, শারমিন। আমাদের স্বীকার করতে হবে, সেদিন আমরা মেজরকে যা বলেছিলাম তা মারাত্মক ভুল ছিল, প্রায় অপরাধের সমতুল্য একটা মারাত্মক ভুল। ওঁকে আমরা শতকরা একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলি যে হক সাহেবরা যেদিন এলেন সেদিন নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম। ছিলাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার মুখ থেকে কিছুই তারা জানতে পারেননি। কিন্তু পুরোটা সময় ব্লু-প্রিন্ট আর স্পেসিফিকেশনগুলো ড্রইং-বোর্ডে ছিল, যেখানে সাধারণত ওগুলো থাকে, অথচ দু'জনের একজনেরও খেয়াল হয়নি যে কি রয়েছে ওখানে! অসম্ভব বলি, অবিশ্বাস্য বলি, কিন্তু ছিল!' রানার দিকে ফিরল সে। 'জানি আপনি ব্যাখ্যা চেয়েছেন, মেজর। কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছি না তা-ও বুঝতে পারছি। কিন্তু ভুলের কোন ব্যাখ্যা কিভাবে দিতে হয় আমার জানা নেই।' চেহারায় উদ্বেগ, আতঙ্ক, অসহায়ত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে।

'আপনি তাহলে অভিযোগের উত্তরে,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'আবেদন জানাতে চাইছেন, বলতে চাইছেন, এর জন্যে দায়ী অবহেলা?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রিয়াজুল হাসান।

তার দিকে চট করে একবার তাকাল শারমিন চৌধুরী, কিন্তু কোন কথা বলল না।

রিয়াজুল হাসান বলল, 'এটা কোন ব্যাখ্যা নয়, তবু বলি। একরামুলক হক সাহেবকে বেশ ভালভাবে চিনতাম আমি, তাকে বিশ্বাসও করতাম, ভুলটা হওয়ার সেটাও একটা কারণ হতে পারে। হিউম্যান মাইন্ডের এ এক রহস্য, কোথাও একটা ব্ল্যাক স্পট আছে। মানুষটাকে বিশ্বাস করতাম বলেই হয়তো সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা জোরালভাবে উপলব্ধি করিনি...'

'এনকোয়্যারি বোর্ডের সামনে আপনার এ-সব যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল শোনাবে,' বলল রানা।

'তা কি আর জানি না? কিন্তু আর কিই-বা বলার আছে আমার!'

শারমিন চৌধুরী, রানা লক্ষ করল, রিয়াজুল হাসানের দিকে আর তাকাচ্ছে না, তাকিয়ে আছে সুব্রত বড়ুয়ার দিকে। আর সুব্রত বড়ুয়া সবার কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দিন এখানে এসেও তাকে দূরে সরে থাকতে দেখেছিল রানা। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন ছুটিতে ছিল সে, ফলে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু শারমিন চৌধুরী যেভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে, তাতে রানার যেন মনে হলো সুব্রত বড়ুয়াও কোন না কোনভাবে ব্যাপারটার সাথে জড়িত।

একঘেয়ে সুরে কথা বলে চলেছে রিয়াজুল হাসান। এনকোয়্যারি বোর্ডের সামনে খুশি মনে দাঁড়াবে সে। ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি শেষ হয় ততই ভাল। কিন্তু তার কথায় একটা কান থাকলেও তাকিয়ে আছে রানা সুব্রত বড়ুয়ার দিকে। তার আর শারমিন চৌধুরীর মধ্যে নীরবে যেন একটা স্নায়ুযুদ্ধ চলছে। মেয়েটা যেন চাইছে সুব্রত মুখ খুলুক, কিংবা মুখ খুলে ফেলবে এই ভয় করছে। কোন সন্দেহ নেই নিঃশব্দে একটা আবেদন জানাচ্ছে সে।

রিয়াজুল হাসান থামতে রানা সুব্রত বড়ুয়াকে বলল, 'আপনি ভাগ্যবান, সুব্রত বাবু, সেফ-সাইডে রয়েছেন। নাকি আপনারও কিছু বলার আছে?'

'আমার?' প্রায় চমকে উঠল সুব্রত বড়ুয়া। 'না, আমার কি বলার থাকবে! আমি তো এখানে ছিলামই না।' নার্ভাস একটু হাসি দেখা গেল তার মুখে, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা বদলে ডান পা থেকে বাঁ পায়ে নিল শরীরের ভর, আর কোন কথা বলল না।

'বেঁচে গেছ!' বলে ফটোটার দিকে আবার তাকালেন রিয়াজুল হাসান, তারপর অকস্মাৎ পকেটে হাত ভরলেন। 'নিয়ম নেই, আমাকে ক্ষমা করবেন!' সিগারেটের প্যাকেট বের করে ধরালেন একটা। 'প্লীজ?' রানা আর সুব্রতকে অফার করলেন তিনি, কিন্তু ওরা কেউ নিল না। সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন, কানের পিছনটা চুলকালেন, তাকালেন রানার দিকে। 'জানি আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা বদলে গেছে, মেজর রহমান। কিন্তু যা ঘটে গেছে তা তো আর অস্বীকার করার যো নেই। যা হয় হবে, সব দোষ আমি আমার কাঁধে তুলে নিচ্ছি।'

'তারপরও কথা থেকে যায়, হাসান সাহেব,' বলল রানা। 'বুঝতেই পারছেন, এটা পূর্ব-পরিকল্পিত ক্রাইম হতে পারে না। একরামুল হক তো আর জানতেন না যে আপনি মারাত্মক ভুলটা করতে যাচ্ছেন।'

'না, তা জানতেন না।'

'তাহলে আপনার ব্যাখ্যা কি?'

'সম্ভবত বিদ্যুৎ চমকের মত বুদ্ধিটা খেলে যায় তার মাথায়। গোটা ব্যাপারটাকে আমরা হরিবল কোইন্সিডেন্স বলতে পারি। ভদ্রলোক···তাকে এখন আমার ভদ্রলোক বলতে ঘৃণা হচ্ছে···লোকটা ভারতীয় স্পাই ছিল, আর আমার হয়েছে অপরাধতুল্য ভুল। দুটো মিলে এই সর্বনাশ ঘটেছে।'

'হুম,' বলল রানা। রিয়াজুল হাসান মেনে নিতে পারলেও, ও পারছে না। এ-ধরনের কাকতালীয় ঘটনা যে ঘটতে পারে না তা নয়, কিন্তু যেখানে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ, বিশ্বব্যাপী সামরিক শক্তির ভারসাম্য ইত্যাদি প্রশ্ন জড়িত সেখানে এ-ধরনের কাকতালীয় ঘটনাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অসম্ভব বলে ধরে নিতে হবে।

অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। উঁকি দিয়ে নিচের উঠানে তাকাল। পাকা চত্বরে একা একটা সাদা বিড়াল গা চুলকাচ্ছে। 'একরামুল হক সাহেব কতক্ষণ ছিলেন এই ঘরে?' মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ও।

'প্রায় আধ ঘন্টা।'

'আপনার মনে আছে, কাছাকাছি থেকে বা খুঁটিয়ে ড্রইং-বোর্ডটা উনি পরীক্ষা করেছিলেন কিনা?'

'না, মনে পড়ছে না।' শারমিন চৌধুরীর দিকে ফিরলেন রিয়াজুল হাসান। 'তোমার মনে পড়ে?'

'না,' বলল শারমিন চৌধুরী, তার চেহারায় ও সুরে যথেষ্ট অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল।

'যদি দেখতেন, জিনিসটা যে গুরুত্বপূর্ণ, বুঝতে পারতেন তিনি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, সাথে সাথে। একরাম আর রফিকুল বারী সাহেব, দু'জনেই বিষয়টার ওপর যথেষ্ট ধারণা রাখতেন। সেজন্যেই তো আমি অত্যন্ত সতর্ক ছিলাম।'

'সতর্ক ছিলেন?' প্রায় হেসে উঠল রানা। 'আপনি বলতে চাইছেন, কথাবার্তায়?'

'হ্যাঁ···'

'ঠিক কখন একরাম সাহেব ফটো তুললেন?'

'একেবারে শেষ মুহূর্তে, যাবার আগে।'

'কোত্থেকে?'

'ওই কোণ থেকে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে।'

এই সময় মেঘ সরে যাওয়ায় হেসে উঠল সূর্য। উঠানে বিড়ালটা এমনভাবে মাথা তুলল কেউ যেন তাকে আঘাত করেছে। জানালার কাছ থেকে সরে এল রানা, রিয়াজুল হাসানের হাত থেকে ফটোগ্রাফটা নিল, ল্যাবের কোণে চলে এসে বারকয়েক ছবি আর সামনের দৃশ্যটা মিলিয়ে দেখল। কোন সন্দেহ নেই, ছবিটা এই

জায়গায় দাঁড়িয়েই তোলা হয়েছে, কিন্তু···'দিনের কোন সময় একরাম সাহেব আসেন এখানে?'

'সকাল দশটায়,' বলল রিয়াজুল হাসান।

হ্যাঁ, গুরুতর বৈসাদৃশ্য একটা আছে বটে। হার্টবিট বেড়ে গেল রানার। এগিয়ে এল রিয়াজুল হাসান, রানার কাঁধের ওপর দিয়ে ফটোটার দিকে তাকাল। সে-ও কি অমিলটা দেখতে পাচ্ছে?

'ঠিক আছে,' বলল রানা, ফটোটা উল্টো করে নিয়ে পোর্টফোলিও-তে ভরল। এই মুহূর্তে এখান থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে ওর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। 'আপাতত আমার আর কোন প্রশ্ন নেই, আপনারা যে-যার নিজের চিন্তা নিয়ে থাকুন। হাসান সাহেব, আপনাদের প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে আমি কথা দিয়েছি আজকের ইন্টারভিউ সম্পর্কে জানাব। তাঁর কাছ থেকে শুনবেন আপনারা। বুঝতেই পারছেন, সাংঘাতিক আপ-সেট হয়ে গেছেন তিনি।'

'হ্যাঁ, হবেনই তো,' ম্লানকণ্ঠে বললেন রিয়াজুল হাসান। 'আমরাও কি কম আপ-সেট?'

শারমিন চৌধুরী আর সুব্রত বড়ুয়াকে 'গুডবাই' বলল রানা, হ্যান্ডশেক করল রিয়াজুল হাসানের সাথে, বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ল্যাব থেকে। দশ মিনিট পর, গাড়িতে বসে, ট্র্যান্সমিটার-রিসিভার-এর সুইচ অন করল ও। প্রায় সাথে সাথে গিলটি মিয়ার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আচি-স্যার, গিলটি মিয়া বলচি। মানে, শুনচি। ইয়ে, মানে, শোনার জন্যে বলচি।'

'তৈরি থাকো, গিলটি মিয়া, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তে পারে,' বলল রানা। 'কোন রকম গাফিলতি বা অবহেলা নয়, নজর রাখার কাজটা ঠিকমত চালিয়ে যাও। প্রতিটি মুহূর্ত সতর্ক থাকতে হবে।'

# এগারো

বিকেলে বৃষ্টি শুরু হবার পর আর থামেনি, সাড়ে পাঁচটাতেই চারদিক অন্ধকার মত হয়ে গেছে।

জুবিলী রোডের মোড়ে গাড়ি পার্ক করেছে রানা, একটা চোখ কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের গেটের দিকে। ভাঁজ খোলা খবরের কাগজটা সামনে মেলে ধরেছে ও, খবরগুলোর ওপর মাঝে-মধ্যে চোখ বুলাচ্ছে, অপেক্ষা করছে শারমিন চৌধুরীর জন্যে।

গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো পড়া হয়ে গেছে রানার, খুদে শিরোনামগুলো আকৃষ্ট করতে পারলে পড়ছে, তা না হলে এড়িয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ অস্থির চোখ জোড়া তন্ন তন্ন করে খুঁজতে শুরু করল। শেষ পৃষ্ঠায় রফিকুল বারী নামটা কোথাও দেখেছে, কিন্তু দেখার সাথে সাথে ধরতে পারেনি, হারিয়ে ফেলেছে পরমুহূর্তে। মিনিট খানেক চেষ্টা

করার পর পাওয়া গেল আবার। 'ঢাকার সংবাদ' শিরোনামে অনেকগুলো খবর, তারই একটা হলো, 'মর্মান্তিক'।

খবরটা এক নিঃশ্বাসে পড়ল রানা।

'কাল সকাল সাড়ে পাঁচটায় একজন ট্রাক ড্রাইভার ঢাকা থেকে পনেরো মাইল দূরে আরিচা রোডে একটা গাড়িকে জ্বলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। গাড়ির ভেতর থেকে পাঁচটা অগ্নিদগ্ধ লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। সনাক্ত করার পর লাশগুলোর পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন, অধ্যাপক রফিকুল বারী, তাঁর স্ত্রী, ও তাঁদের তিন শিশুসন্তান। অধ্যাপক রফিকুল বারী বিদেশে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করার পর কিছু দিন হলো দেশে ফিরে আসেন, দেশের একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছিলেন তিনি, নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট হিসেবে দেশে-বিদেশে তাঁর প্রচুর সুখ্যাতি ছিল।'

ব্যস, এইটুকুই। ঘটনার কারণ হিসেবে কিছুই বলা হয়নি। তবে কারণটা আঁচ করা কঠিন কিছু নয়। গাড়িতে আগুন লাগলে পুড়ে মরার অপেক্ষায় সীটে বসে থাকে না আরোহীরা। ব্যাপারটা যে নির্মম হত্যাকাণ্ড তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

একরাম সাহেব মারা গেলেন, তারপর রফিক সাহেব। মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল রানার। রাগের কারণ অদৃশ্য শত্রুর স্পর্ধা, নাকি নিজের ব্যর্থতা ঠিক বুঝল না। ওর তদন্তে কোথাও গুরুতর কোন ত্রুটি আছে। রফিকুল বারীকে একবারও সন্দেহ করেনি ও। তাঁর সম্পর্কে তথ্যগুলো তাঁকে সন্দেহের বাইরে রাখতে সাহায্য করেছে। আর মানুষ হিসেবে তাঁকে যেমন দেখেছে রানা, সন্দেহ হবার কথা নয়।

শনিবার সন্ধ্যার ইন্টারভিউ-এর কথা মনে পড়ল রানার, মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটার ঠিক দশ ঘণ্টা আগের ঘটনা। ঢাকা থেকে পনেরো মাইল দূরে আরিচা রোড ধরে সপরিবারে কোথায় যাচ্ছিলেন রফিকুল বারী? ঘটনাটা যদি ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘটে থাকে, ধরে নিতে হয় অন্তত এক ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছিল বারী পরিবার। রওনা হবার জন্যে প্রস্তুতি দরকার হয়েছে, তারমানে ঘুম থেকে তাঁরা আরও এক ঘণ্টা আগে ওঠেন। অথচ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় রানা যখন বিদায় নিয়ে চলে এল তাঁর মণিপুরী পাড়ার বাড়ি থেকে, কই, তিনি তো দূরে কোথাও সপরিবারে যাবার কথা কিছু বলেননি! না, অসম্ভব! তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল, রফিকুল বারীর ভাব দেখে মনে হয়েছে ফিরতে তাদের রাত হবে। কেউ যদি দূর-পাল্লার ভ্রমণে সপরিবারে কোথাও যেতে চায়, তার আগে সে তার ছেলেমেয়েকে যথেষ্ট বিশ্রাম নেয়ার সময় দেবে না? ক্লান্ত বাচ্চাদের নিয়ে ভ্রমণ করা আর নরকযন্ত্রণা ভোগ করা একই কথা। কেন তা করতে যাবেন রফিকুল বারী?

ভদ্রলোকের পরিচয় সম্পর্কে ক্ষীণ একটা সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল রানার মনে। হঠাৎ করে আরেকটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সন্দেহটা আরেকটু বাড়ল। রানাকে তিনি বলেছেন, ছাত্রদের খাতা দেখতে হবে, তাই পরিবারের সাথে যেতে পারেননি। কথাটা বলে আসলে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? ছাত্র? ইউনিভার্সিটির ছাত্র? কিন্তু ইউনিভার্সিটিগুলো তো ছুটি উপলক্ষে বন্ধ সব। ব্যাপারটার হয়তো অন্য কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে, আরেকটু খোঁজ-খবর করা দরকার।

ড্যাশবোর্ডে লাল একটা আলো জ্বলে উঠল। গিলটি মিয়া কথা বলতে চায়।

তার গোলাপী অর্থাৎ শারমিন চৌধুরী নিউমার্কেট থেকে কেনাকাটা সেরে জুবিলী রোডের দিকে ফিরছে। গাড়িটা একটা গ্যারেজে রেখে হেঁটে ফিরছে সে, বোধহয় মেরামত দরকার। তারপর সে বলল, 'স্পষ্ট বুজতে পারচি না, তবে মনটা কেমন কেমন করচে–কেউ বোদায় স্যার পিছু লিয়েছে আমাদের। আপনি যদি গোলাপীর ওপর চোক রাকেন, কেউটাকে চাকমা দেখিয়ে ভাগতে পারি আমরা। আর যদি বলেন একহাত দেকাতে হবে…'

'একহাত মানে হাঙ্গামা? না,' নিষেধ করল রানা। 'আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া মারপিটের মধ্যে যাবে না। আগে সন্দেহ সত্যি কিনা দেখো। সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, এলাকা ছেড়ে কোথাও যাবে না তোমরা। জুবিলী রোডের আশপাশে চাই তোমাদের।'

'ঠিক আচে।'

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করল রানা। দু'মিনিট পর ফুটপাথ ধরে শারমিন চৌধুরীকে হেঁটে আসতে দেখল ও, হাতে একটা ব্যাগ রয়েছে। রানার সামনে বিশ গজ দূরে রাস্তা পেরোল সে, হোস্টেলের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। গাড়ি থেকে নেমে তার পিছু নিল রানা। লম্বা লম্বা পা ফেলে পাশে চলে এল। 'হ্যালো, মিসেস শারমিন। এক মিনিট সময় হবে?'

বিস্মিত হলো, তবে সামান্যই, রানার দিকে ফিরে মৃদু হাসল। 'আরে, এমন হঠাৎ, কোত্থেকে?'

'গাড়িতে বসে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কিছু কথা হওয়া দরকার, আজ সকালের ইন্টারভিউ-এর ব্যাপারটা নিয়ে। আমরা কি কোন রেস্তোরাঁয় বসতে পারি?'

'না,' বলল শারমিন চৌধুরী। 'কথা আমারও কিছু আছে। আপনি বরং আমার কামরায় চলুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মত হলো রানা। দু'জন, একসাথে এলিভেটরে চড়ল। পাঁচতলায় উঠছে এলিভেটর, নিঃশব্দে তাকে লক্ষ করল রানা। চেহারায় স্মিত হাসি থাকলেও, তার মনের উদ্বেগ পরিষ্কার ফুটে রয়েছে চোখ দুটোয়। সারা শরীরে একটা রোমাঞ্চ অনুভব করল রানা, কি না কি শুনতে হবে ওকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অপ্রতিভ বোধ করল ও। ছি ছি, একটা মেয়ের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকা উচিত নয়। কিন্তু চেষ্টা করেও চোখ দুটো সরাতে পারল না রানা। পানপাতা আকৃতির অবয়বে এত বেশি লাবণ্য, গায়ের চামড়া এত মসৃণ আর কোমল, শরীরের গড়ন এতটাই নিখুঁত যে রোমান্টিক কবিতার দু'একটা লাইন নিজের অজান্তেই উঁকি দিল মনে।

শারমিন চৌধুরী কিছু টের পেল কিনা বলতে পারবে না রানা, হঠাৎ রানার দিকে ফিরে জোর করে একটু হাসল সে, বলল, 'আপনি আসায় সত্যি আমি খুব খুশি হয়েছি।' কথা বলার সময় চিবুক একটু উঁচু করল সে। 'আমি নিজেই ভাবছিলাম কিভাবে আপনার সাথে যোগাযোগ করা যায়…'

কামরাটা পাঁচতলায়, দুটো ঘর আর একটা কিচেন, সংলগ্ন বাথরুম। হালকা

ফার্নিচার দিয়ে পরিপাটি করে সাজানো, কোথাও কোন বাহুল্য নেই। ফ্রেমে বাঁধা প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো দেশীয় শিল্পীদের আঁকা। জানালার পর্দা টেনে দিয়ে ড্রইংরুমের আলো জ্বেলে দিল শারমিন চৌধুরী। হাতের ব্যাগটা রেখে এল কিচেনে। বলল, 'আপনাকে আপ্যায়ন করার মত কোন উপায় নেই, দুঃখিত, মেজর রহমান। চা বা কফি আমি খাই না। ওমা, আপনি দাঁড়িয়ে কেন, প্লীজ বসুন।' হাত একটু তুলে সিঙ্গেল সোফাটা দেখিয়ে দিল রানাকে। 'আপনি অবশ্য সিগারেট খেতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।' যদিও সিগারেট ধরাল না রানা। 'কে শুরু করবে আগে? আপনি, না আমি?'

রানার সামনে সোফায় বসে কয়েক সেকেন্ড কি যেন চিন্তা করল শারমিন চৌধুরী। তারপর মুখ তুলে তাকাল। থমথম করছে চেহারা। 'ফটোটা সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ—শুরু করুন।'

'হক আর বারী সাহেব যখন ল্যাবে এসেছিলেন, ফটোটা তখন তোলা হয়নি, হতে পারে না।'

'কেন?'

'পরিষ্কার মনে আছে আমার, আমি নিজে ড্রইং-বোর্ড থেকে সব সরিয়েছিলাম, সরিয়ে তালাচাবির ভেতর রেখেছিলাম। তাছাড়া, ফটোতে আমার চুলের যে স্টাইল দেখা যাচ্ছে, ওঁরা যখন ভিজিট করতে আসেন তখন ওই স্টাইলে আমি চুল বাঁধতাম না। ওটা আমি শুরু করেছি এবারের বসন্তে।'

'আপনার কথা বিশ্বাস করি,' বলল রানা। 'কারণ আমিও আপনার মত একই উপসংহারে পৌঁচেছি।'

'তারমানে আপনিও ধরে ফেলেছেন যে ফটোটা ওই সময়ের নয়?'

'হ্যাঁ।'

'উফ্, বাঁচা গেল! আমার ভয় হচ্ছিল আপনি বোধহয় আমাকেও মিথ্যেবাদী ভাববেন।'

'আপনাকেও? আপনাকেও? আর কে মিথ্যে কথা বলছে?'

'আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে, দয়া করে আমাকে বলবেন, কিভাবে আপনি আন্দাজ করলেন ওটা একরাম সাহেবের তোলা ফটো নয়?'

'ব্যাপারটা আন্দাজ নয়, শারমিন,' নাম ধরে সম্বোধন করলেও, উচ্চারণে সমীহের সুর থাকল। 'আমার চোখে ধরা পড়েছে, ছায়াগুলো আলাদা। হক সাহেব সাড়ে দশটার সময় ছবি তোলেন, তাই না? এটা দেখুন,' বলে পকেট থেকে প্রিন্টটা বের করল রানা, চার ভাঁজ করা, ধরিয়ে দিল তার হাতে। 'আজ আমিও আপনাদের ল্যাবে সাড়ে দশটার সময় ছিলাম। দরজার পাশের কোণটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে হক সাহেব ছবিটা তুলেছিলেন বলে বলা হচ্ছে। সেদিনের মত, আজও রোদ ঢুকেছিল ঘরে। ফটোতে ছায়া পড়েছে যেদিকে, আজ আমি তার উল্টোদিকে ছায়া দেখলাম, বিশেষ করে আপনার ছায়াটা। দেখতে পাচ্ছেন?' উঠে দাঁড়াল রানা, শারমিন চৌধুরীর পাশে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ল, আঙুল দিয়ে ফটোর ছায়াটা

দেখাল।

'হ্যাঁ,' বলে মুখ তুলল শারমিন চৌধুরী, হঠাৎ দু'জনের মুখ অত্যন্ত কাছাকাছি চলে এল, প্রায় ছোয়াছুয়ি হতে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি সিধে হলো রানা। 'ফটোটায় দেখতে পাচ্ছি রোদ ঢুকেছে পশ্চিম দিক থেকে, তারমানে সময়টা হবে শেষ বিকেল।' এক সেকেন্ড চিন্তা করল সে, তারপর আবার মুখ খুলল, 'হক বা বারী সাহেব আর কখনও ল্যাবে ফিরে আসেননি, কাজেই ধরে নিতে হয় এটা তুলেছে দু'জনের একজন—হয় হাসান ভাই, নয়তো সুব্রত।'

সহজ, শান্তভাবেই কথাগুলো বলল শারমিন চৌধুরী, যেন এই সন্দেহটা অনেক আগে থেকেই মনে পুষে রেখেছে সে। কিন্তু বলে ফেলার পর তার প্রতিক্রিয়া হলো। হাত থেকে খসে পড়ল ফটোটা, নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল, দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে পানি ঝরল। 'খোদা! ওহ্ খোদা! এ কাজ কেন করতে গেল ও! কিসের অভাব ওর, কেন এ-পথে পা বাড়াল!'

রানার জন্যে এটা একটা বিস্ময়। 'সুব্রত বাবু?'

'হ্যাঁ, সে ছাড়া আর কে!' মুখ লুকিয়ে সোফা ছাড়ল শারমিন চৌধুরী। 'প্লীজ, মাফ করবেন আমাকে। এক মিনিট, প্লীজ···' এক ছুটে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

মুখ ধুয়ে প্রায় তখুনি ফিরে এল সে, রুমাল দিয়ে চোখ মুছল।

একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'শান্ত হয়ে বসুন, এখুনি কিছু বলার দরকার নেই। ধীরে ধীরে সব শোনা যাবে, কেমন?'

সোফায় বসে হেলান দিল শারমিন চৌধুরী, নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নিয়েছে। রানার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসলও সে। 'বলে ফেলার পর মনটা হালকা লাগছে। আজ সকালেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিলাম। ফটোটা দেখে ধড়ে আমার প্রাণ ছিল না। ওটা যে তোলা হয়েছে তাই আমার জানা ছিল না। তার আগে পর্যন্ত দুটো পরস্পর বিরোধী ধারণা ছাড়া আর কিছুই আমি ভাবতে পারছিলাম না। একটা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলাম আমি, হক সাহেবরা যেদিন এলেন সেদিন সকালে তথ্য ফাঁস হওয়ার কোন উপায় ছিল না। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো, আমি মরিয়া হয়ে বিশ্বাস করতে চাইছিলাম হক সাহেবই অপরাধী, আমি আর হাসান ভাই যেভাবে হোক কোথাও ভুল করেছি। বুঝতেই পারছেন, সময়টা কি কষ্টের মধ্যে কেটেছে আমার···'

'হক সাহেব যে অপরাধী তাতে কোন সন্দেহ নেই, অন্তত তিনি জড়িত ছিলেন। তবে আসল লোক তিনি ছিলেন না। আপনার কি ধারণা, রিয়াজুল হাসান সত্যি বিশ্বাস করেন তাঁর ভুল হয়েছে?'

'না, আমি তা মনে করি না। তাঁর এ-ধরনের ভুল হওয়া অসম্ভব।'

'অথচ আজ সকালে তিনি বার বার জোর দিয়ে সে-কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।'

'জানা কথা সুব্রতকে বাঁচাবার জন্যে। আমি জানি সুব্রতকে তিনি সন্দেহ করেন।'

'কিভাবে জানলেন?'

'এ-ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলেছেন তিনি। বিশেষ করে সুব্রতর অতীত জীবন, সর্বহারা পার্টির সাথে তার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি...' খানিক ইতস্তত করল শারমিন চৌধুরী। 'মানে...বলতে খারাপ লাগছে আমার...'

'হাসান সাহেব আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন, আপনি যেন সুব্রত বাবুর সাথে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন, যাতে তার সম্পর্কে আরও ভালভাবে জানা যায়...?'

বিস্ফারিত হলো চোখ জোড়া, শারমিন চৌধুরী প্রায় আঁতকে উঠে জানতে চাইল, 'আ-আপনি জানলেন কিভাবে?'

'আমি শুধু জানি সুব্রত বাবুর সাথে প্রায়ই আপনি বেড়াতে-টেড়াতে যান।'

'আপনি আমাদের ফলো করেছেন?'

'না,' মিথ্যে বলল রানা। 'তবে জেনেছি।'

'ও।' শারমিন চৌধুরী নড়েচড়ে বসল সোফায়। 'সুব্রতকে কি বলতে হবে সব আমাকে শিখিয়ে দেন হাসান ভাই: দুনিয়ার সবচেয়ে ত্যাঁদোড় আর আসুরিক সাম্রাজ্যবাদ হলো রাশিয়া। কমিউনিজম নির্দয় বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা ছাড়া আর কিছুই নয়, এই মতবাদ মানুষের কোমল অনুভূতিগুলোকে কানাকড়ি মূল্য দেয় না। মার্ক্স ছিলেন অর্ধমানব, হৃদয়হীন একটা ব্রেন। তারপর দেখো কি তার প্রতিক্রিয়া হয়।'

একটা ভুরু কপালে তুলল রানা। 'তারমানে হাসান সাহেব এ-ব্যাপারে রীতিমত সিরিয়াস ছিলেন।'

'ছিলেন না মানে! আমাকে তিনি আরও লক্ষ করতে বলেন সুব্রত দু'হাতে টাকা ওড়ায় কিনা।'

'ওড়ান?'

'হ্যাঁ...মানে,' মৃদু হাসল শারমিন চৌধুরী, 'আমার জন্যে বেশ ভালই খরচ করে সে...!'

রানাও একটু হাসল। 'সেটা সঙ্গত, কারণটা পরিষ্কার। আর তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি? তিনি কি এখনও সর্বহারা পার্টির সাথে গোপনে সম্পর্ক রাখেন? ভাল কথা, হাসান সাহেবকে আপনি জিজ্ঞেস করেননি, সর্বহারা পার্টি করা মানেই কি দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা?'

'করিনি মানে! উনি বললেন, আমরা একটা সন্দেহের ওপর তদন্ত চালাচ্ছি, সুব্রতকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করছি না। না, সুব্রত পার্টির সাথে সম্পর্ক অনেক আগেই চুকিয়ে ফেলেছে। সে নিজে কথাটা বলেছে আমাকে। সর্বহারা পার্টির প্রতি সহানুভূতি আছে তার, তবে এ-কথাও তাকে বলতে শুনেছি দেশের লোক শিক্ষিত না হলে কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়।'

'আপনার মুখে রাশিয়ার নিন্দা শোনার পর কি বলেন তিনি?'

'ওহ্, শারমিন, রাশিয়ার কথা বাদ দাও, আমি তোমার কথা শুনতে চাই!' সামনা আড়ষ্ট ও লালচে হলো সে, ক্ষীণ হাসল।

'সুব্রত বাবুর দোষ কি, সামনে আপনি থাকলে রাজনীতির মত বিষয় নিয়ে

কেই-বা মাথা ঘামাতে চাইবে!'

প্রশংসা শুনে আবারও হাসল বটে শারমিন চৌধুরী, তবে এখনও তাকে উদ্বিগ্ন দেখাল।

প্রসঙ্গ থেকে সরল না রানা, 'সুব্রত বাবু দোষী ভেবে আপনি কেঁদে ফেললেন, কিন্তু নিজেই দেখুন তার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ পাওয়া গেল। আচ্ছা, সুব্রত বাবুর বদলে রিয়াজুল হাসান নয় কেন?' মনে মনে রানা ভাবল, কিংবা নয় কেন শারমিন চৌধুরী? ফটোটায় সে আছে, তারমানে তো এই নয় যে নিজে কেউ নিজের ফটো তুলতে পারে না। সে-ই যে তোলেনি, তার প্রমাণ কোথায়?

সরাসরি উত্তর দিল না শারমিন চৌধুরী, তবে প্রায় লাফিয়ে উঠল। 'কি সর্বনাশ! মনে পড়ে গেছে! আজ রাতে সুব্রতর সাথে বাইরে যাওয়ার কথা আমার। এখুনি তাকে জানিয়ে দেয়া দরকার, আমি যাচ্ছি না।' টেলিফোনের দিকে এগোল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'হাসান ভাই কেন যে দোষী নয়, একটু পর বলছি আপনাকে।'

ড্রইংরুমের এক কোণে টেলিফোনটা। রিসিভার তুলে ডায়াল করল সে। 'হ্যালো? হ্যালো, সুব্রত? আমি, সুব্রত···' মৃদু শব্দে হাসল সে, শুনে শিরশির করে উঠল রানার মেরুদণ্ড। 'সুব্রত, লক্ষ্মীটি রাগ কোরো না। সত্যি আমি ভারি দুঃখিত, জানি তুমি···আহ্, আগে শোনোই না ছাই···আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, একটু শীত শীতও করছে। সন্ধ্যায় যাবার কথা ছিল না? আজ সম্ভব নয়। কি, রাগ হচ্ছে? সত্যি আমি সাংঘাতিক দুঃখিত···কি···? না···দরকার নেই···সত্যি বলছি···না-না, ছেলেমানুষি কোরো না তো···হ্যাঁ, ঠিক আছে···তাহলে কাল সকালে দেখা হচ্ছে। খোদাহাফেজ!'

ফিরে এসে রানার সামনে সোফায় আবার বসল শারমিন চৌধুরী, চেহারায় আড়ষ্ট হাসি, কষ্ট পাচ্ছে বোঝা যায়। 'কি বলব, ও না আমাকে···সত্যি···মানে···'

'ভালবাসে,' বলল রানা।

'কি জানি···অন্তত এইটুকু বলতে পারি, আমি তা চাইনি।'

'রিয়াজুল হাসান সম্পর্কে বলুন।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে কি বলবে ভেবে নিল মেয়েটা। 'প্ল্যানসহ ড্রইং-বোর্ড আর পাশে আমাকে নিয়ে ফটোটা যে-ই তুলে থাকুক, সে চেয়েছে সবাই মনে করুক ওটা একরামুল হক সাহেব তুলেছেন।'

'একমত।'

'কাজেই সে ভেবেছে ফটোটা যদি আমাদের ইন্টেলিজেন্স-এর হাতে পড়ে তাহলে তারা বিশ্বাস করবে যে একরামুল হক অপরাধী।'

'ঠিক।'

'কিন্তু ব্যাপারটা নির্ভর করে হক সাহেব যেদিন এলেন সেদিন ড্রইং-বোর্ডে প্ল্যানটা ছিল কিনা তার ওপর। সুব্রত অনুপস্থিত ছিল, এবং তার ধারণা প্ল্যানটা ওখানে ছিল। আমি আর হাসান ভাই জানি, ছিল না। আমাদের জানাটা মিথ্যে হতে পারে না। তারমানে সুব্রতর ধারণাটা মিথ্যে। মিথ্যে একটা ধারণার পক্ষে কথা বলছে সে,

কাজেই ধরে নিতে হয় কোন না কোনভাবে…'

'আপনার কথায় খানিকটা যুক্তি থাকতে পারে,' বলল রানা, কথাগুলো মেনে নিতে পারছে না। 'কিন্তু কি জানি। তবে একটা কথা তো ঠিক যে আজ সকালে রিয়াজুল হাসান যখন অবহেলাকে দায়ী করছিলেন, উনি আসলে মিথ্যে কথা বলছিলেন?'

'সে তো সুব্রতকে বাঁচাবার জন্যে।'

'নিজের ক্যারিয়ার নষ্ট করার ঝুঁকি নিয়ে কেন তিনি সুব্রতকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন?'

'কারণ সুব্রতকে উনি খুব ভালবাসেন।'

শারমিন চৌধুরীর ম্লান, উদ্বিগ্ন চেহারা দেখে নিয়ে রানা বলল, 'ভাল তো তাকে আপনিও বাসেন?'

'তাকে আমি পছন্দ করি, হ্যাঁ…'

হঠাৎ করে রানার মনে হলো, মেয়েটা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে ধারাল হলেও, ভাবাবেগের লাগাম টেনে ধরার ব্যাপারে এখনও তেমন দক্ষতা অর্জন করেনি। অপরিণতই বলা যায়। রোজ যে লোকটার পাশে বসে কাজ করে তার প্রতি নিজের অনুভূতিগুলো এখনও সে সনাক্ত করতে পারেনি। মনের অনুভূতিগুলোকে ভয় পায় সে, বোধহয় সেজন্যেই সুব্রতর বিরুদ্ধে দ্রুত একটা উপসংহারে পৌঁছুতে চাইছে, যাতে ভাবাবেগের বন্ধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারে। কোন সন্দেহ নেই তার এই আবেগ তাকে, যে-কোন কারণেই হোক, অত্যন্ত অশান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ধর্ম একটা কারণ হতে পারে। সুব্রত মুসলমান নয়, তাকে ভালবাসলে শেষ পরিণতি শুভ হবে না, এই ধারণা থেকেও অশান্তির উদ্ভব হতে পারে।

'আপনি বরং গোটা ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন,' বলল রানা। 'নিজেকে শুধু শুধু কষ্ট দেয়ার কোন মানে হয় না। সুব্রত বাবুর কাছ থেকে বেফাঁস কথা আদায় করার কোন দরকার নেই। তাছাড়া, বুদ্ধিটা আপনার নয়। ভাল কথা, কবে এই পরামর্শটা দেন আপনাকে রিয়াজুল হাসান?'

'বেশ কিছুদিন আগে।'

'ইদানীং নয়?'

'না।'

'দ্বিতীয় ফটোটা তোলার পর, গত বসন্তে?'

'হ্যাঁ, তাই হবে। চুলের স্টাইল দেখে আমি বলে দিতে পারি প্রথমটার বেশ কিছুদিন পর দ্বিতীয় ফটোটা তোলা হয়েছিল।'

'হুম। আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, কিন্তু সুব্রত বাবুর সাথে এই অন্যায় খেলাটা আপনার জন্যে সিরিয়াস বিপদ ডেকে আনতে পারে। কাজেই, ও-সব বাদ। রাজি?'

'খুশি মনে।' দেখে মনে হলো স্বস্তিবোধ করছে শারমিন চৌধুরী, তার জন্যে করুণা বোধ করল রানা। যদিও বোধটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না।

ও বলল, 'অন্য কোন অর্থ করবেন না, বলছি আপনার ভালর জন্যে—আপনি খুব

সুন্দরী, আর সুন্দরী মেয়েরাই বিপদে পড়ে। আমি চাই না আপনার অকালমৃত্যু হোক বা আরও খারাপ কিছু ঘটুক।'

চেহারা শুকিয়ে গেল মেয়েটার, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে।

'দুর্নাম বা দণ্ড, মৃত্যুর চেয়ে খারাপ নয়?'

দম দেয়া পুতুলের মত মাথা ঝাঁকাল শারমিন চৌধুরী।

'তাহলে আমি যা বলব শুনবেন তো?'

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল শারমিন চৌধুরী, রানা কি বলে শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব। তার শাড়ির আঁচল খানিকটা খসে পড়ল, ব্লাউজের গায়ে ফুলে উঠল বুক। 'হ্যাঁ, বলুন।'

সোফায় হেলান দিল রানা। 'প্রথমে, আপনি আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন। সৌন্দর্যের আলাদা একটা আবেদন আছে, ধরে নিতে পারেন আমি আপনার রূপে মুগ্ধ। এখন···আপনি যদি ব্যাপারটার সাথে জড়িত হন, যদি গভীরভাবে জড়িত হন, এই মুহূর্তে সব কথা খুলে বলুন আমাকে। আপনার নিরাপত্তার জন্যে দরকার এটা। একরামুল হক সাহেব জড়িত ছিলেন। আপনি জানেন, তিনি মারা গেছেন। বলতে পারেন, তিনি তো আত্মহত্যা করেছেন। হয়তো তাই, কিন্তু কেন? কারণ তিনি জানতেন, আর কোন পথ খোলা নেই। জানতেন, আত্মহত্যা না করলে তাকে খুন করা হবে। তারপর আর কে খুন হলো? রফিকুল বারী। কেন, তিনি কেন খুন হলেন? তিনি খুন হলেন, কারণ তিনি একরামুল হক সাহেবকে সন্দেহ করেছিলেন। তিনি একা নন, ওরা তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ গোটা পরিবারকে মেরে ফেলেছে। আপনি চান, আপনার ভাগ্যেও তাই ঘটুক?'

আতঙ্কে নীল হয়ে গেল শারমিন চৌধুরী। 'না, মাগো, না! কি-কিন্তু কিভাবে?'

'খানিক আগে খবরের কাগজে পড়লাম। ঢাকায়, আরিচা রোডে পাওয়া গেছে তাঁর গাড়িটা, ভেতরে পাঁচটা পোড়া লাশ।'

'সত্যি খুন?'

'হতে বাধ্য।'

'কিন্তু কেন?'

'এখনও জানি না। আগের রাতে রফিকুল বারী সাহেবের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি। হতে পারে হক সাহেব সম্পর্কে আমাকে যতটা বলেছেন তারচেয়ে অনেক বেশি জানতেন তিনি, আর এই বেশি জানাটাই তার জন্যে কাল হয়েছে।'

হাঁটুর ওপর কনুই রাখল শারমিন চৌধুরী, হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। 'ও আল্লাহ, এসব কি ঘটছে!'

'এ-সব আপনাকে আমি ভয় দেখানোর জন্যে শোনাচ্ছি না,' বলল রানা। 'যদি কিছু জানেন, ভুল বুঝে বা না বুঝে যদি কিছু করে থাকেন, সব আমাকে বলুন। সময় নেই, এখনই। তারপর আপনার নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব আমার।'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে চোখ তুলে তাকাল সে রানার দিকে, চেহারায় যতটা না ভয় তারচেয়ে বেশি দিশেহারা ভাব। 'আপনি আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে সন্দেহ

করছেন, তাই না?'

'সেটাই কি আমার ডিউটি নয়?'

মেয়েটা রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। এমন সঙ্কটে সে কাঁদল না বা অস্থির হলো না দেখে মনে মনে তার প্রশংসা করল রানা। 'আপনিই বলে দিন কিভাবে নিজেকে আমি নির্দোষ প্রমাণিত করব? নির্দিষ্ট কিছু জানতে চান আপনি?'

'হ্যাঁ, চাই। কল্পনা করুন, কেসটা কোর্টে উঠেছে। রিয়াজুল হাসান শপথ করে বলছেন, হক আর বারী সাহেব যেদিন ল্যাবে এসে ছবি তোলেন সেদিন ড্রইং-বোর্ডে ডকুমেন্টগুলো ছিল না। সুব্রত বাবু ল্যাবে সেদিন ছিলেন না। ফটোতে শুধু শারমিন চৌধুরী আর ড্রইং-বোর্ড দেখা যাচ্ছে। আরও কল্পনা করুন, বিচারক স্বয়ং আপনি। আপনার এ-কথা মনে হবে না যে শারমিন মেয়েটা নিজেই টাইম এক্সপোজার বা ডিলেইড অ্যাকশন মেকানিজমের সাহায্যে ফটোটা তুলেছে, যখন ল্যাবে একা ছিল সে?'

বিস্ময়কর চরিত্রের অধিকারিণী শারমিন চৌধুরী সম্পূর্ণ শান্ত থাকল। হঠাৎ যেন সে ঠাণ্ডা আর নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তার বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, সমস্যার সমাধান করতে ব্যস্ত সে। 'হ্যাঁ, তাই ভাবব, আমি বিচারক হলে অবশ্যই তাই মনে করব। কিন্তু আসল ঘটনা তাতে বদলাচ্ছে না—ফটোটা আমি তুলিনি।'

'তাহলে ব্যাখ্যাটা কি হবে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল সে, তারপর শান্তভাবে বলল, 'সহজ ব্যাখ্যা আছে। প্রথমে ড্রইং-বোর্ডের ফটো তোলা হয়েছে, তারপর আমার ফটো সেট করা হয়েছে ওটায়। ওটা একটা ভুয়া ব্যাপার—মন্তাজ বোধহয় একেই বলে। আসুন, ফটোটা আরেকবার দেখা যাক।'

প্রিন্টটা কার্পেটে পড়ে রয়েছে। সেটা তুলে নিল শারমিন চৌধুরী। আবার সোফা ছেড়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'হতে পারে,' বলল ও। 'আপনার পায়ের দিকে তাকান, ওগুলো ঠিক যেন মেঝেতে ঠেকে নেই।'

'আর আমার আউটলাইন একটু যেন বেশি গাঢ়। তবু…' প্রিন্টটা রানাকে ফেরত দিল শারমিন চৌধুরী, 'নিশ্চিতভাবে বলতে পারবে শুধু একজন এক্সপার্ট। তবে একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহে জানুন, মেজর রহমান, এই ব্যাপারটার সাথে কোনভাবে আমি জড়িত নই। আমি সত্যি কথা বলছি, আপনি বুঝতে পারছেন না?'

মেয়েটার চোখের দিকে ঝাড়া তিন সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর রানার মনে হলো, হ্যাঁ, বিশ্বাস করে সে। 'পারছি। প্লীজ ফরগিভ মি…এবার, ক্ষতিপূরণ কিভাবে করা যায় বলুন তো?'

'ক্ষতি? পূরণ? কি বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না?'

'সুব্রত বাবুর সাথে আপনার ডিনারটা আমি নষ্ট করেছি,' বলল রানা। 'আমাকে অপরাধবোধ থেকে উদ্ধার করার একটা উপায় হয় না?'

ফিক্ করে হেসে ফেলল শারমিন চৌধুরী। 'কি উপায় হলে খুশি হন আপনি?'

'এই ধরুন, আপনাকে আমি ডিনার খাওয়াতে কোথাও নিয়ে যেতে পারি না?'

'না, ঘরেই ভাল লাগছে আমার,' রানার মুখে কি যেন খুঁজল শারমিন, আগ্রহে

চকচক করছে চোখ জোড়া। 'তাছাড়া আপনি যা শোনালেন, বাইরে বেরুতে সত্যি ভয় করছে।'

'সাথে আমি থাকলে আপনার কোন ভয় নেই,' আশ্বস্ত করল রানা।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল শারমিন। 'প্লীজ! তবে যাই বলুন, আপনি কিন্তু ভারি আশ্চর্য একটা মানুষ। ভয় দেখিয়ে এইমাত্র কাহিল করে ফেললেন, এখন আবার সাহস দিচ্ছেন।' মাথা তুলল সে, আবার কাছাকাছি চলে এল দুটো মুখ। রানার একটা হাত ধরল সে। 'জানি না কেন, আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ বোধ করছি।'

'অকারণ ভয় দেখাতে চেয়েছি তা কিন্তু সত্যি নয়। সব মিলিয়ে আপনিও স্বীকার করবেন, আপনার আমি ভাল চাইছি। অনেক কারণের একটা হলো...'

'কি হলো, থামলেন কেন?' রানার হাতটা ছাড়ল না শারমিন।

'না, থাক,' হেসে ফেলে বলল রানা। 'তবে হাতটা যদি আরও কিছুক্ষণ ধরে থাকেন, এমন হতে পারে যে ছাড়ার সময় হলে দেখবেন আমি ছাড়তে দিচ্ছি না।'

রানার হাতে মৃদু চাপ দিল শারমিন, তারপর ছেড়ে দিল। 'কই?' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল সে। 'কি ছেলেমানুষি করছি আমরা, তাই না?'

'ছেলেমানুষি বলুন আর যাই বলুন, মাঝে মধ্যে এরকম এক-আধটু তরল হতে পারলে বেঁচে থাকার আনন্দ বেড়ে যায়। তিক্ত কর্তব্য, কৃত্রিম গাম্ভীর্য, বুদ্ধিবৃত্তির ক্লান্তিকর চর্চা, ভাবাবেগ দমন ইত্যাদি শুধু নিরানন্দ ব্যাপার নয়, আয়ুও ক্ষয় করে।' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আজ তাহলে আসি...'

রানার সাথে, প্রায় লাফ দিয়ে, উঠে দাঁড়াল শারমিনও। 'ওমা! সেকি! আপনি না বললেন আমার সাথে খাবেন?'

'কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে প্রস্তাবটা আপনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।'

'ও-ও-মা! ছি-ছি!' রানার হাত আবার শারমিনের মুঠোর ভেতর চলে গেল। 'কি ভুলো মন আমার, এখনও আপনাকে বলাই হয়নি! শুনুন মশাই, আপনার সাথে সময়টা আমার দারুণ কাটছে। কিছু যদি মনে না করেন, আপনার সঙ্গ আমার সাংঘাতিক ভাল লাগছে যাকে বলে প্রাইভেসী, সেটা আমি হারাতে চাইনি--আর সেজন্যেই, বুঝলেন সাহেব, আপনার সাথে বাইরে কোথাও যেতে চাইছি না। বসুন,' নির্দেশের সুরে বলল সে, 'বসুন বলছি!' অগত্যা শারমিনের সোফাতেই, হাতলের ওপর বসে পড়ল রানা। 'বোঝার ভুল হতে পারে, কিন্তু সিদ্ধান্ত আগেই হয়ে গেছে--আমরা একসাথে খাব আজ। আপনিই খাওয়াবেন, তবে পরিবেশন করব আমি।'

'বিজ্ঞানীরা ভুলো হয়, কিন্তু এতটা কি সত্যি হয়?' জিজ্ঞেস করল রানা, মৃদু হাসি লেগে রয়েছে ওর ঠোঁটে। 'আমি ঢোকার সাথে সাথে আপনি কি বলেছিলেন মনে নেই? আমাকে আপ্যায়ন করার মত কিছুই নেই ঘরে।'

সোফায়, রানার পাশে, সরল শারমিন, হাত তুলে ঘরের কোণটা দেখাল। 'ওটা কি দেখতে পাচ্ছেন? টেলিফোন। বিল্ডিঙে ঢোকার আগে ডান দিকে কি আছে দেখেছেন? একটা চাইনীজ হোটেল। ওরা আমার ফোন পেয়ে অভ্যস্ত। বললেই বেয়ারা পাঠিয়ে দেবে। আপনি শুধু বলুন, কি খেতে চান।'

'বাহ্, চমৎকার। সত্যি আমি কৃতজ্ঞ। আপনি যা খাবেন আমিও তাই।'

সোফা ছেড়ে ফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল শারমিন। 'ডিনারের পর আপনার জন্যে কফি বা চা বলব? নাকি ঠাণ্ডা কিছু? ইচ্ছে করলে আপনি বিয়ারও চাইতে পারেন, ওদের ওখানে সব পাওয়া যায়,' চোখে দুষ্টামির ঝিলিক নিয়ে বলল সে। ঝুঁকে ফোনের রিসিভার তুলল, উত্তরের অপেক্ষায় রানার দিকে তাকিয়ে আছে। ভঙ্গিটা ভাল লাগল রানার। সুগঠিত নারীদেহের এটা একটা বৈশিষ্ট্য, স্রেফ শালীন দেহভঙ্গিমার সাহায্যেও পাগল করে তুলতে পারে পুরুষকে।

'না,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'আপনি যা খুশি আনান, আমার জন্যে কফি।'

'সর্দিসর্দি ভাব, কাজেই ঠাণ্ডা কিছু খাব না আমি। আর কফি তো সহ্যই হয় না। তাহলে শুধু আপনার জন্যে।' ডায়াল করল শারমিন, অর্ডার দিল, তারপর ফিরে এল। এবার সে দূরত্ব বজায় রেখে রানার মুখোমুখি অন্য একটা সোফায় বসল। আপন মনে মাথা নাড়ল সে, কি যেন ভাবছে, ঠোঁটে হাসির প্রলেপ।

'কি ব্যাপার?'

'আমার সমস্ত সুনাম ভেস্তে গেল!' বলল শারমিন 'রেস্তোরাঁর ম্যানেজার লোকটাকে বিরতিহীন লাউডস্পীকার বলতে পারেন। কাল সকালের মধ্যে গোটা হোস্টেল জেনে যাবে ব্যাপারটা। শারমিন চৌধুরী ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে। কাল রাতে তার ঘরে পুরুষ মানুষ ছিল! দু'জন একসাথে ডিনার খেয়েছে।'

দু'জনেই ওরা গলা ছেড়ে হেসে উঠল। হাসি থামার পর গম্ভীর হলো শারমিন, বলল, 'না, ঠাট্টা নয়। সত্যি ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। হোস্টেলে কোন পুরুষকে এন্টারটেইন করা এমনিতেও নিষেধ। অবশ্য এক কাজ করলে হবে, বেয়ারা যখন আসবে, আপনি বাথরুমে চলে যাবেন।'

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাজি হলো রানা। 'আর আপনি গলা চড়িয়ে ডাক দেবেন—বিলকিস, তাড়াতাড়ি কর, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল!'

আবার একবার হেসে উঠল ওরা। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। এক সময় রানাই নিস্তব্ধতা ভাঙল। 'আপনার সাথে অন্য কোথাও, অন্য কোন পরিস্থিতিতে আলাপ হলে ভাল হত।'

'সাগর সৈকতে, তাই না? দু'জনেই ছুটিতে আছি, কাজে ফেরার কোন তাগাদা নেই। প্রথমদর্শনেই ভাল লাগল পরস্পরকে। কিন্তু আমার হাত ধরতেই প্রথম তিনটে দিন পার করে দিলেন আপনি। তবু, ছুটির বাকি চারদিন আমরা হাত ধরাধরি করে সৈকতে আর পাহাড়ে হাঁটলাম, বোটে করে ঘুরে বেড়ালাম, কথা বললাম অনর্গল। তারপর একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আর তো ছুটি নেই। বিদায়ের সময় কেউ আমরা কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলাম না।' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল শারমিন চৌধুরী। 'জীবন মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস বৈ কিছু নয়, তাই না?'

'বাধাগুলো টপকাতে পারলে ব্যথাটুকু ভুলে থাকা যায়।'

'মনের আর সমাজের বাধা, ঠিক।' হঠাৎ মুখ তুলল শারমিন, ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা বলতে পারেন, মানুষ কোনদিনই কি মুক্তবিহঙ্গ হতে পারবে না? জানেন, আমি এমন একটা জীবনের স্বপ্ন দেখি যেখানে আমার কোন অপরাধবোধ

নেই. কোন বাধা আমাকে থামাতে আসে না. যা খুশি তাই করি. যাকে ভাল লাগে তাকেই আমার সবচেয়ে মজার জিনিসটা দিয়ে খুশি করতে চাই. তারটা চেয়ে নিয়ে তৃপ্ত হই অথচ কোন কলুষ আমাকে স্পর্শ করে না. সদ্যজাত শিশুর মত পবিত্র, বাঁধনহীন বাতাসের মত স্বাধীন. আমি…'

'কাজ চলছে. তবে খুব ধীরে ধীরে.' না. হাসি গোপন করেই বলল রানা। 'মানবসভ্যতা একদিন হয়তো পৌঁছে যাবে সেই স্বর্গরাজ্যে। তবে একটা শর্ত আছে. যদি না তার আগে পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে নিজেদেরকে আমরা দুনিয়ার বুক থেকে সাফ করে দিই।'

'কোন মানুষকে ভাল লেগে গেলে আমার খুব ভয় করে.' বলল শারমিন। 'জানি. আগে হোক পরে হোক একটা আঘাত আসছে। আপনার ব্যাপারটাই দেখুন না. জানি আপনি আমার অশান্তির কারণ হয়ে উঠবেন।'

'কেন বলুন তো?'

'আবার তাহলে তিক্ত প্রসঙ্গটা তুলতে হয়। হয় হাসান ভাই. নয়তো সুব্রত, তাই না? আপনি জানেন না. ওদের দু'জনকেই আমি খুব পছন্দ করি।'

'হুম… আচ্ছা. আপনার মনে পড়ে না. দু'জনের কেউ একজন আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে কখনও কোন ফটো তুলেছে কিনা?'

'না. অবশ্যই না–তুললে নিশ্চয়ই অদ্ভুত লাগত আমার. কাজেই মনে থাকত।'

হেসে উঠল রানা। 'অদ্ভুত তো লাগতই।' লক্ষ করল. হঠাৎ লালচে হয়ে উঠল শারমিন। 'কিন্তু বুঝে দেখুন। ফটোটা যদি কৃত্রিম হয় তাহলে দিনের কোন্ সময় বা বছরের কোন্ ঋতু এ-সব প্রশ্নের আর কোন গুরুত্ব থাকছে না। ছায়া বা আপনার চুলের স্টাইল কোন উপসংহার টানতে পারছে না। একরামুল হক, আপনাকে বাদ দিয়ে, প্ল্যানসহ শুধু ড্রইং-বোর্ডের ফটো তুলে থাকতে পারে।'

'না.' বলল শারমিন। 'তা সম্ভব নয়। কারণ এইমাত্র একটা কথা মনে পড়ে গেল। ফটোতে. ড্রইং-বোর্ডের যে ডকুমেন্টগুলো আমরা দেখছি সেগুলো তখনও ফাইনাল করা হয়নি। খসড়া অবস্থায় ছিল। কিছু সমস্যার সমাধান তখনও আমরা বের করতে পারিনি. সেগুলো আরও কয়েক হপ্তা পরে বেরিয়ে আসে। তারপর প্ল্যানগুলো ফাইনাল করা হয়।'

'ঠিক জানেন?'

'পজিটিভ। কারণ. যেদিন ফাইনাল হলো সেদিন তারিখ ছিল পনেরোই এপ্রিল, তারিখটা আমার ভোলার কথা নয় এই জন্যে যে ওটার সাথে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের সম্পর্ক আছে। কয়েক বছর আগে. ওই দিনে. ডিভোর্স পাই আমি।'

'ও আচ্ছা. ভেরি স্যাড।' মুখ তুলল রানা। 'আর একরামুল হক ল্যাবে এসেছিলেন মার্চ মাসে?'

'হ্যাঁ।'

'উফ্. ডারি স্মৃতিবোধ করছি.' বলল রানা. যদিও স্মৃতিটুকুর ভাগ শারমিন পেল

'কাজেই ব্যাপারটা দাঁড়াল—হয় হাসান ভাই নয়তো সুব্রত।' এই সময় নক হলো দরজায়। 'বেয়ারা!' ঝট করে দাঁড়াল শারমিন, এগিয়ে এসে রানার হাত ধরে টান দিল। 'আসুন আমার সাথে, তাড়াতাড়ি!'

বাথরুমে নয়, রানাকে বেডরুমে দিয়ে গেল সে। স্যান্ডেলের মৃদু শব্দ তুলে ড্রইংরুমের দরজা খুলতে চলে গেল। একটু পরই তার গলা পেল রানা, 'এসো, সগির।'

বেডরুমের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। মাঝারি আকারের কামরা, বিছানার চাদর থেকে শুরু করে জানালার পর্দা পর্যন্ত সব দুধের মত সাদা।

শারমিনের চিৎকার ভেসে এল, 'বিলকিস, ডিনার এসে গেছে, তাড়াতাড়ি এসো!'

'আসছি বাবা, আসছি! খিদেতে চোঁ চোঁ করছে পেট!' নারীকণ্ঠ নকল করল রানা।

এ-ধরনের কিছু প্রত্যাশা করেনি শারমিন, তার হাত থেকে কিছু একটা পড়ে যাওয়ায় ঝন ঝন শব্দ হলো, সম্ভবত একটা চামচ। খুট-খাট আওয়াজ শুনে রানা বুঝল ড্রইংরুমের নিচু টেবিলটাতেই খাবার সাজানো হচ্ছে। হাতে দু'চার মিনিট সময় আছে মনে করে বাথরুমে উঁকি দিল ও। ভেতরে ছোট্ট একটা কাবার্ড রয়েছে, তাড়াতাড়ি সেটা খুলে পরীক্ষা করল। ওষুধ ইত্যাদি ছাড়া আর কি আছে দেখা দরকার। এই সময় ড্রইংরুমের দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। ফিরে এল রানা।

ওকে দেখে হেসে উঠল শারমিন। 'দরজার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল বেয়ারা। বোধহয় বিশ্বাস করতে পারেনি।'

'নাই করুক,' বলল রানা। 'আপনি যে জগতের স্বপ্ন দেখেন, আপাতত সেই জগতে রয়েছি আমরা। আমাদের কোন অপরাধবোধ নেই, কোন বাধাই আমরা ফেস করছি না।'

'আসুন, খেতে খেতে গল্প করি।' পাশাপাশি বসল ওরা, পরিবেশন করল শারমিন। খেতে প্রচুর সময় নিল ওরা, খাওয়ার চেয়ে কথা বলল বেশি। সবশেষে, রানার কাপে কফি ঢালল শারমিন।

তার হাত থেকে ধূমায়িত কাপটা নিয়ে রাখল রানা। 'গন্ধটা দারুণ, আপনিও একটু খান না?'

'বললাম না···'

'মনে আছে,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'কফি বা চা আপনি খান না। আজ নাহয় নিয়মটা ভাঙলেন, আমার সম্মানে।'

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল শারমিন। তারপর ধীরে ধীরে বলল সে, 'ও, বুঝেছি—আপনি ভাবছেন আমি বোধহয় আপনার কফিতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছি, তাই না?' আড়ষ্ট একটু হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

মুচকি একটু হাসি রানার ঠোঁটেও ফুটল। 'একেবারেই কি অসম্ভব? আপনাকে আমি কতটুকু চিনি, বলুন?'

সোফা ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে গেল শারমিন, কিচেন থেকে হাতে একটা কাপ

নিয়ে ফিরে এল। রানার কাপটা নিজের দিকে টেনে নিল সে, খালি কাপটায় পট থেকে কফি ঢালল, কাপটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা, 'আমি সম্মানিত বোধ করছি।' যে-যার কাপ মুখের সামনে তুলল ওরা, চুমুক দিল একসাথে।

'রাতে যদি ঘুম না আসে, আপনি দায়ী,' বলল শারমিন।

'তারমানে আপনাকে ঘুম না পাড়িয়ে এখান থেকে আমার যাওয়া হবে না।'

'ইস! না মশাই, আমি ছোট্ট খুকিটি নই যে আমাকে ঘুম পাড়াতে হবে। তবে আপনার যদি আপত্তি না থাকে, রাতটা আমরা গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারি, লোকে যাই বলুক।'

'তারমানে স্বরচিত জগতে সত্যি সত্যি বাস করতে শুরু করেছেন।'

কাপে পর পর দু'বার চুমুক দিল শারমিন, দেখাদেখি রানাও।

'আরে, ভালই তো লাগছে! তারমানে কি এতদিন বঞ্চিত করেছি নিজেকে?'

'আপনার অভ্যেস নেই বলেই বোধহয় ধরতে পারছেন না, একটু বেশি তেতো লাগছে কফিটা,' বলল রানা। 'নাকি সত্যি সত্যি বিষ মিশিয়েছেন? আমাকে নিয়ে মরতে চাইলে···'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল শারমিন।

'কি হলো?' অবাক হয়ে রানা দেখল, শারমিন টলছে, তারপরই তার হাত থেকে খসে পড়ল কাপ-পিরিচ। 'আপনি অসুস্থবোধ করছেন?' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে, চোখ দুটো বিস্ফারিত, দু'হাতে পেট চেপে ধরল।

'ব্য-থা···!'

এক লাফে তার পাশে চলে এল রানা, দু'হাত বাড়িয়ে দিল কাঁধ দুটো ধরার জন্যে, কিন্তু পৌঁছুল মাত্র একটা হাত। অপর হাত দিয়ে নিজের পেট চেপে ধরল ও, ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখ।

এরপর সব যেন স্লো মোশান ছায়াছবির মত লাগল। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে রানার। দেখল অনন্ত সময় নিয়ে মেঝের ওপর পড়ে যাচ্ছে শারমিন। ওর মনে হলো, মাথার ভেতরটা দ্রুত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চিন্তাশক্তি দুর্বল। পা বাড়াতে গিয়ে হোঁচট খেলো, পতনটা ঠেকাল একটা চেয়ার ধরে ফেলে। চিৎকার করল রানা, কিন্তু গলা দিয়ে অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুল, 'জলদি, শারমিন! আপনার ডাক্তারের ফোন নম্বর!'

মেঝে থেকে ঘাড় বাঁকা করে রানার দিকে তাকাল শারমিন। তার ঠোঁট নড়ল, কিন্তু আওয়াজ বেরুল না, কিংবা বেরুলেও শুনতে পেল না রানা। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল রানার, শারমিনের বুকের ওপর মুখ দিয়ে পড়ল ও। মাথা তুলে তাকাল মেয়েটার আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ জোড়ার দিকে। 'ডাক্তার! ফোন!'

উত্তরে ঘরের কোণে তাকাল শারমিন, ওখানে টেলিফোনের পাশে ইমডেন্স নোটবুক রয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল রানা। গলা, বুক আর পেটে যেন আগুন ধরে গেছে ওর। সারা শরীর হু হু করে জ্বালা করছে। নোটবুকটা কখন হাতে চলে এসেছে জানে না। পাতা ওল্টাচ্ছে, কিন্তু প্রথমে মনেই করতে পারল না কি খুঁজছে

সে। ইংরেজি ক্যাপিটাল লেটারের ডি দেখল, তার পাশে স্মল লেটার আর, তারপর ফুলস্টপ। ডক্টর। ডক্টর মনিরুল ইসলাম। ফোন···

রিসিভার তোলার পর হাত থেকে সেটা খসে পড়ে গেল মেঝেতে। শুয়ে পড়ল রানা, মনে হলো যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে সে, কিংবা মারা যাবে। শেষবার একবার চোখ মেলে তাকাল। রিসিভারটা নাকের সামনে। বাঁচার আকুতিতে ঝাঁকি খেলো ওর গোটা শরীর। সমস্ত সচেতনতা আর পেশীর শক্তি এক করে মাথা তুলতে চেষ্টা করল। ক্রেডলটা নিচু টেবিলের ওপর, ধরতে গিয়ে সেটাকেও মেঝেতে ফেলে দিল রানা। শুয়ে শুয়েই ডায়াল করল ও। কিন্তু নাম্বারটা ভুল হচ্ছে না তো? নোটবুকে এই নম্বরই কি ছিল? রিসিভারে কথা বলল রানা, 'গিলটি মিয়াকে জানাও···'

ক্লিক করে শব্দ হলো অপরপ্রান্তে, একটা ভারী পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, 'ডক্টর মনিরুল ইসলাম স্পিকিং···'

জিভ অসম্ভব ভারী হয়ে গেছে, নাড়তে পারছে না রানা। কথাগুলো বলল, কিন্তু অপরপ্রান্তে ডাক্তার কি বুঝলেন বলা মুশকিল, 'তাড়াতাড়ি করুন, ডাক্তার। মিসেস শারমিন চৌধুরী, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, পাঁচতলা···জলদি, ডাক্তার, জলদি!' মাথা মেঝেতে ঠুকে গেল রানার, স্থির হয়ে গেল শরীর।

# বারো

একটা প্রাইভেট ক্লিনিকের কেবিনে শুয়ে, জেগে জেগে শারমিন চৌধুরীকে স্বপ্ন দেখছে রানা। এই সময় হাতে একগোছা লাল গোলাপ আর বগলের নিচে ব্রীফকেস নিয়ে ভেতরে ঢুকল সোহেল আহমেদ, পিছু পিছু এল আঙুর ভর্তি বেতের ঝুড়ি হাতে ক্লিনিকের একজন কর্মী। টেবিলের ওপর ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা।

কমপ্লিট স্যুট পরে আছে সোহেল, বোঝাই যায় না তার একটা হাত নেই। 'কেমন আছিস?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কথা বলতে পারবি?'

'তোর ফুল আর ফল, সব নিয়ে যা,' ঝাঁঝের সাথে বলল রানা। 'এমন ভাব দেখাচ্ছিস, আমি যেন কঠিন কোন রোগে ভুগছি, সারার কোন আশা নেই।'

'কঠিন রোগ হলে তবু তো ভাল, তোর সেবা-শুশ্রূষা করার সুযোগ পাব,' সহাস্যে বলল সোহেল। 'কিন্তু বিনা নোটিশে পটল তুললে একটা দুঃখ থেকে যাবে। বেঁচে গেছিস ভাগ্যের জোরে, সে-খবর রাখিস? ডাক্তার এইমাত্র আমাকে বললেন, কাপের সবটুকু ককি খেলে আর দেখতে হত না! ঠিক কি বলেছেন, শুনবি? আর মাত্র এক চুমুক খেলেই হত! ভাল কথা, দুটো কাপ দু'রকম কেন?'

'একজনের জন্যে অর্ডার দেয়া হয়েছিল, শারমিন চা বা ককি খায় না,' বলল রানা। 'আমার সম্মানে খাচ্ছিল।'

'মাসুদ রানাকে সম্মান দেখানোর খেসারত!' হেসে উঠল সোহেল। 'তার সাথে কথা হয়েছে তোর?'

'টেলিফোনে।'

'আঙুর খাবি?'

'তুই খা।'

ঝুঁকে ঝুড়ি থেকে আঙুর তুলে নিয়ে খেতে শুরু করল সোহেল। রানার বুকের ওপর পড়ে থাকা ফুলগুলো ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'বস্ পাঠিয়েছেন।'

'তোর মাধ্যমে যখন পাঠিয়েছেন, আমার ধন্যবাদটাও পৌঁছে দিস তুই।'

'তোর বিপদ কেটে গেছে শোনার পর আজ সকালে ঢাকায় ফিরে গেছেন তিনি।'

বিছানার ওপর উঠে বসল রানা। 'বস্ আমাকে দেখতে এসেছিলেন? আগে বলিসনি কেন?'

ট্রাফিক পুলিসের মত একটা হাত তুলল সোহেল। 'থাম। খুশি হবার কিছু নেই। যা পাস তাই খাস জনে রেগে বোম হয়ে আছেন।'

'জানতে পেরেছিস, বিষটা কোত্থেকে এল?'

'হ্যাঁ এবং না। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার লোকটার ব্যাকগ্রাউন্ড তন্নতন্ন করে চেক করা হয়েছে, চেক করা হয়েছে বেয়ারার অতীত আর বর্তমান—দু'জনেই ক্লিন।'

'না, ওদের কোন হাত থাকার কথা নয়।'

'তবে বেয়ারা ছেলেটা বলছে, গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে তার সাথে এক লোক এলিভেটরে উঠেছিল। লোকটা তাকে জিজ্ঞেস করল, ডিনার নিয়ে কোথায় যাচ্ছে সে। ছোকরা বোকার মত জবাব দেয়, মিসেস শারমিন চৌধুরীর রুমে, পাঁচতলায়।'

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'গায়ে-মাথায় চাদর জড়িয়ে ছিল, চেহারার বর্ণনা দিতে পারছে না। ছোকরা হাবা গোছের।'

'ডিনার কি খোলা ট্রে করে আনে সে? কোন কাভার ছিল না? আনার সময় আমি দেখিনি।'

'হ্যাঁ। কফি পটটা ছিল ট্রের এক কোণে, বরফ ভরা জগ-এর আড়ালে। ডিনার কোথায় যাচ্ছে, লোকটা জিজ্ঞেস না করলেও পারত। শারমিন চৌধুরীর নামে বিল ছিল ট্রেতে।'

'কিন্তু তাকে টার্গেট করা হয়নি,' বলল রানা।

'কেন, এ-কথা বলছিস কেন?'

'খুন-খারাবির ব্যাপার, কেউ আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছে তা হতে পারে না। পটে যে-ই বিষ মিশিয়ে থাকুক, সে জানত কফি একা শুধু আমি খাব। পরিচিত কেউ, জানে, শারমিন খায় না।'

মুখে একটা আঙুর পুরে সোহেল বলল, 'মেয়েটার ঘরে তুই যাঁরা গেলে বেচারির কি অবস্থা হত বুঝতে পারছিস?'

'খুনের দায়ে গ্রেফতার হত—খুনী সম্ভবত সেটাই চেয়েছিল।'

'ইতিমধ্যে আমরা গ্রেফতার করেছি সুব্রত বড়ুয়াকে।'

'তাই নাকি?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কেন?'

'সে তার বান্ধবীর দরজার পাশে, অন্ধকার সিঁড়ির ধাপে ঘাপটি মেরে বসেছিল,' বলল সোহেল। 'নিজের লোকের কাছ থেকে তোর অবস্থা জানার পর গিলটি মিয়া দলবল নিয়ে গোটা হোস্টেল তল্লাশি চালায়, তখনই ধরা পড়ে সে।'

'কি বলছে সুব্রত? কোন ব্যাখ্যা দেয়নি?'

'শিকটি নট। ছত্রিশ ঘণ্টা হলো চোদ্দশিকের ভেতর বসে রয়েছে। মুখ খুলতে রাজি নয়।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'শারমিনের হোস্টেলে তার আসার কারণ স্রেফ ঈর্ষাও হতে পারে। মেয়েটাকে ভালবাসে সে। ওর সাথে আমি যে রাতে ছিলাম, কথা ছিল ওকে নিয়ে সুব্রত ডিনার খেতে যাবে। ফোনে মানা করে দেয় শারমিন।'

'ও, আচ্ছা, তা হতে পারে।'

'রিয়াজুল হাসানের খবর কি?'

'সে-রাতে একবারও সে বাড়ি থেকে বের হয়নি। তোর লোকেরা এ-ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত।'

'তারমানে গোটা ব্যাপারটা আবার সুব্রতর কাছে ফিরে এল, তাই না? ভাল কথা, একরামুল হক সম্পর্কে তদন্ত কতদূর এগোল?'

ব্রীফকেসে টোকা মারল সোহেল। 'একরামুল হক আর রফিকুল বারী, দু'জন সম্পর্কেই এখানে কিছু তথ্য আছে।'

'দেখি।'

ব্রীফকেস খুলে দুটো মোটা ফাইল বের করল সোহেল। দেখেই আঁতকে উঠল রানা।

'দেখতে না চাইলে...'

'না-না, দেখব,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। দুটো ফাইল নিয়ে কোলের ওপর রাখল একটা, অপরটা খুলল। 'তবে কি জানিস, এখন আর এ-সব থেকে তেমন সাহায্য পাওয়া যাবে না। একরামুল হক খুদে একটা ঘুঁটি ছিলেন। কিন্তু আমাদের ভুল পথে চালানোর জন্যে তাকে এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন তিনিই প্রধান চরিত্র। স্বীকার করছি, বেশ কিছুটা সময় ভুল পথে ছিলামও আমি। তুই তো জানিস, অনেক ছোটখাট তথ্য এড়িয়ে গেলে তার পরিণতি কী মারাত্মক হতে পারে।' একরামুল হকের ফটোটা খুঁটিয়ে দেখল রানা। তারপর দ্বিতীয় ফাইলটা তুলে নিয়ে খুলল। সাথে সাথে চমকে উঠল ও।

'কি হলো?'

'এ কার ফটো? ইনি তো রফিকুল বারী নন!'

'মন মানে? পারিবারিক একটা ফটোগ্রাফ থেকে এনলার্জ করা হয়েছে...'

'তাহলে ভদ্রলোকের মণিপুরী পাড়ার বাসায় গিয়ে আমি যাকে দেখেছি সে রফিকুল বারী ছিল না। মোটাসোটা, টাক, ভারী ফ্রেমের চশমা—হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিন্তু মুখের গোটা আকৃতি মেলে না।' ফাইলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা পায়ের

কাছে। 'ফটোটা যদি আগে দেখতাম তাহলে আর এই সর্বনাশ হত না! শালা আমাকে ভারি বোকা বানিয়েছে তো!'

'কিন্তু···' সোহেল চিন্তিত।

'তবে লোকটা ডুখোড় অভিনেতা। রফিকুল বারী যেমনটি আচরণ করবেন বলে ধারণা করা যায় ঠিক তেমনটিই করেছে।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'তারমানে, মণিপুরী পাড়ার বাসা থেকে আসল লোক, রফিকুল বারী, তার পরিবারকে নিয়ে শনিবার বিকেলেই রওনা হয়ে গিয়েছিলেন, রোববার ভোরে নয়।'

'এখন আর নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় নেই,' বলল সোহেল।

'জানাটা এখন আর জরুরীও নয়। ফটোটাই প্রমাণ। তাহলে সমস্যা দাঁড়াল—ভুয়া একজন রফিকুল বারীর প্রয়োজন হলো কেন? আরেকটা প্রশ্ন, কিভাবে সে আমাকে ভুল পথে থাকতে সাহায্য করল?'

'সম্ভবত একরামুল হক সম্পর্কে তোকে ভুল তথ্য যোগান দিয়ে। কি কি বলেছে বল্ দেখি?'

কপালটা একবার টিপে ধরল রানা। 'স্মৃতি শক্তি নষ্ট করতে সায়ানাইডের জুড়ি নেই। দাঁড়া, কি বলেছিল? আমি জানতাম না এমন কিছু বলেনি সে। একরামুল হকের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে লেকচার দেয়। আভাসে বলতে চায়, পাকিস্তান সরকারের সাথে বা পাকিস্তানী অপরাধচক্রের সাথে তার গোপন একটা চুক্তি হয়ে থাকতে পারে। ব্যস, আর কিছু তো মনে পড়ছে না। অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? একজনের বাড়িতে ভুয়া এক লোককে রোপণ করা অত্যন্ত ঝুঁকির কাজ। এর পিছনে বড় একটা উদ্দেশ্য না থেকেই পারে না। কি সেটা?'

'ওরা জানবে কিভাবে ওই বাড়িতে যাবি তুই?'

'ধরে নিয়েছিল। সাধারণ যুক্তি। ওরা জানত একরামুল হক সাহেবের পিছনে লেগেছি আমি, তার সম্পর্কে তথ্য দরকার আমার। রফিকুল বারীর চেয়ে ভালভাবে আর কে আমার চাহিদা মেটাতে পারে?'

'সত্যি যদি আঙুরগুলো খেতে না চাস, আমি সাবাড় করলে তোর কোন আপত্তি···?'

মৃদু হাসল রানা। 'চালিয়ে যা।'

'ধন্যবাদ।' ঝুঁকে আরও কয়েক থোকা আঙুর ঝুড়ি থেকে তুলে নিল সোহেল। খেতে খেতে বলল, 'সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, নিজেদের ইনফরমারকে বাঁচাবার জন্যে প্রচুর কাঠখড় পুড়িয়েছে ওরা।'

'আমি একমত। আর কফি পটে বিষ ঢালার ব্যাপারটা ছিল ভূমিকা বদলানোর সূচনা। চিন্তা করে দেখ, কি ধুরন্ধর চালাক ওরা।'

'কি বলতে চাস?'

'ওরা জানে ব্লাকটা কাজে লাগেনি। একরামুল হক খতম হলেও, তদন্ত চলছে। এখন তাহলে কি করা? এক ঢিলে দুই পাখি মারো—শফিকুর রহমান ওরফে মাসুদ রানাকে খুন করো, তাতে তদন্ত স্থগিত রাখা হবে। একই সাথে, আপনাআপনি, সন্দেহ গিয়ে পড়বে আরেকজনের ওপর।'

'শারমিন চৌধুরী?'

'হ্যাঁ–নির্দোষ একটা মেয়ে, জানা কথা–কাজেই আবার যখন শুরু হবে তদন্ত, তদন্তকারীরা আরেকটা ভুল পথ ধরে এগোবে।'

অস্থির হয়ে উঠল সোহেল। 'কী ভয়ঙ্কর!' তারপর সে জিজ্ঞেস করল, 'এরপর কি করবে ওরা?'

'ব্যাপারটা যখন কেঁচে গেছে, ওদের সামনে দ্বিতীয় আর কোন বিকল্প আছে বলে মনে হয় না,' বলল রানা; 'আসল ইনফরমারকে খতম না করে উপায় নেই ওদের। তাকেই আমরা খুঁজছি, বিশ্বাসঘাতক নম্বর এক। কাজেই চোখ কান খোলা রেখে দুই চিড়িয়াকেই প্রটেকশন দিতে হবে আমাদের। দু'জনের একজন ওদের লোক, তাকে ওরা···'

'তারমানে মইয়ের একটা ধাপ খুলে নেবে?'

'হ্যাঁ। ওটাই ওদের পদ্ধতি।'

চেয়ার ছাড়ল সোহেল। 'রিপোর্ট দুটো রেখে গেলাম। আজ বিকেলে সুব্রত বাবুর সাথে কথা বলতে পারবি, নাকি···?'

'পারব বোধহয়। তবে প্রথমে আমি রিয়াজুল হাসানের সাথে কথা বলতে চাই। ইতিমধ্যে তুই এক কাজ কর, গিলটি মিয়াকে বলে যা সে যেন এক পায়ে খাড়া থাকে।'

'ঠিক আছে, আবার দেখা করব।'

সোহেল চলে যাবার পর ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামল রানা। বিষ আর প্রতিষেধক এখনও ওকে দুর্বল ও আচ্ছন্ন মত করে রেখেছে। পা এত কাঁপছে দেখে বিস্মিত হলো ও। ড্রেসিং গাউন পরে করিডরে বেরিয়ে এল, সাদা পোশাক পরা দু'জন বডিগার্ড পায়চারি করছে, একজন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশের কামরাটাই শারমিন চৌধুরীর। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। বিছানায় রয়েছে শারমিন, বসে বসে বই পড়ছে। মুখ তুলে তাকাল, হাসিটা স্বতঃস্ফূর্ত হলেও ম্লান।

'কি, এরইমধ্যে বিচরণ শুরু হয়ে গেছে?'

'এইমাত্র দেড় হাজার মাইল হেঁটে এলাম, আপনার বিছানার কিনারায় একটু বসতে পারি?' অনুমতির জন্যে অপেক্ষা না করে বসে পড়ল রানা। 'আপনাকে এখনও ফ্যাকাসে লাগছে। কেমন বোধ করছেন?'

'শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।'

'কিন্তু সৌন্দর্য হারাননি।' শারমিনের একটা হাত ধরল রানা, তালুর উল্টোপিঠে আলতো স্পর্শে চুমো খেলো। 'এটা অন্য কোন অর্থে নেবেন না, স্রেফ কৃতজ্ঞতা জানালাম। আমি যতদূর বুঝেছি, এ-যাত্রা আপনার জন্যে প্রাণে বেঁচে গেছি আমি। আজ আমাকে কবর দেয়ার কথা।'

'আমার জন্যে? কি বলছেন? কিভাবে?' শারমিন অবাক।

'আপনার সাথে ছিলাম, কফির অর্ডার দেয়া হয়, তাই ওরা বিষ মেশানোর সুযোগ পেয়েছে। তা না পেলে ওরা অবশ্যই অন্য কোন মাধ্যম বেছে নিত। সেটা পিস্তল থেকে একটা গুলিও হতে পারত। তাছাড়া, আপনাকে ভাগ দেয়ায় আমি মাত্র

আধ কাপ পেয়েছিলাম কফি...'

'আমার অবদান, এ স্রেফ আপনার কল্পনা। তা সে যাই হোক, কে দায়ী জানা গেছে?'

'এখনও যায়নি, তবে আজই আবার ধাওয়া শুরু করব। বিকেলের আগেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমি।'

'চলে যাচ্ছেন?' কণ্ঠে ক্ষীণ উদ্বেগ নিয়ে জিজ্ঞেস করল শারমিন। 'কিন্তু এখনও তো আপনি...!'

'চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক আছি। তিনজন দেহরক্ষী থাকছে করিডরে, আপনাকে পাহারা দেবে। তবে আপনি বিপদে আছেন বলে মনে করি না আমি। সন্ধের দিকে একবার এসে দেখে যাব।'

'দাঁড়ান,' রানা উঠতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিল শারমিন। ওর একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সে। 'যাবেনই যখন, বাধা দেব না। আমি আপনার জন্যে দোয়া করব।'

শারমিনের হাতে আরেকবার চুমো খেলো রানা।

বালিশে হেলান দিয়ে হাসল শারমিন, কিছু বলল না। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে দিল রানা।

# তেরো

কলিংবেলের বোতামে চাপ দিল সিকিউরিটি অফিসার, তার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। করিডরের শেষ মাথার দেয়ালঘড়িতে তিনটে বেজে পাঁচ মিনিট। বগলের তলায় ফাইল নিয়ে বাঁক ঘুরল একটা মেয়ে, সরাসরি ওদের দিকে এগিয়ে এল। এই সময় ওয়েটিং রুমের দরজা খুলে গেল। এক পাশে সরে গিয়ে রানাকে ঢোকার পথ করে দিল রিয়াজুল হাসান। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল সে। হেঁটে চলে এল কামরার মাঝখানে, চেহারায় গাম্ভীর্য আর উদ্বেগ মাখামাখি হয়ে আছে। দোতলা থেকে কি যেন ভাঙার আওয়াজ ভেসে আসছে।

'আবার আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' বলল রানা।

'আরে না, ভাই। বিরক্ত হব কেন। তাছাড়া এভাবে দমাদম ছাদ পেটানো হলে কিভাবে মানুষ কাজ করে!'

সিলিঙের দিকে একবার তাকাল রানা। 'কি করছে ওরা?'

'পার্টিশন ভেঙে কারা যেন বড় করছে অফিসঘর। ইতিমধ্যে তিনবার আপত্তি জানিয়েছি আমি। বুঝি না রাতে কাজ করলে ওদের অসুবিধেটা কি!' খুব চটে আছে রিয়াজুল হাসান, তবে নিজেকে দমন করল সে। একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল রানাকে, সিগারেট ধরাল। 'আপনার খবর শুনে ভারি আপ-সেট হয়ে পড়েছিলাম। আজ সন্ধ্যায় শারমিনকে দেখতে যাব। কেমন আছে ও?'

'আগের চেয়ে ভাল, তবে এই মুহূর্তে ভিজিটরদের যেতে দেয়া হচ্ছে না। আমি

কাল দেখতে যাব। আপনি জানেন, সুব্রত বাবুকে গ্রেফতার করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। উইং কমান্ডারের কাছ থেকে শুনলাম। কি ঘটেছিল?'

কাহিনীটা সংক্ষেপে বলল রানা। মনোযোগ দিয়ে শুনল রিয়াজুল হাসান। রানা থামতে মাথা ঝাঁকাল সে, শান্তভাবে বলল, 'এখন আর চেপে রেখে লাভ নেই···সত্যি বলতে কি, সুব্রতকে আমি সব সময় সন্দেহ করতাম। খুব বেশিদিন হয়নি ওর পেছনে শারমিনকে লাগাই আমি—ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে বলি, এই যেমন সন্ধের দিকে একসাথে বেড়াতে বেরোতে পারে, রাজনীতি নিয়ে কথা তুলতে পারে। আগে থেকেই জানতাম, শারমিনের ওপর ওর দুর্বলতা আছে। ভেবেছিলাম চেষ্টা করলে ওর গোপন কথা শারমিন বের করে আনতে পারবে···'

'হ্যাঁ, আমি জানি। শারমিন আমাকে বলেছে।'

বিস্মিত হলো রিয়াজুল হাসান, কিন্তু অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত বলে মনে হলো না। 'তাই? আচ্ছা···ঠিক আছে। কিন্তু আরেকটা বিষয় আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম আমি···এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা কেন যে আগে মনে পড়েনি! সত্যি আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। কি কাণ্ড দেখুন, মাত্র কালকে মনে পড়ল। হক সাহেবরা যেদিন ল্যাবে এলেন, অ্যান্টি-রেডিয়েশন স্ক্রীনের ব্লু-প্রিন্ট সেদিন ড্রইং-বোর্ডে থাকতে পারে না, কারণ ওটার তখনও কোন অস্তিত্ব ছিল না। কাজটা আমরা শেষ করি এপ্রিলের পনেরো তারিখে।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে হাসল রানা। 'হ্যাঁ, তা-ও আমি জানি! সেদিন কফি খাবার আগে শারমিন আমাকে বলেছে।'

'আপনাকে শারমিন বলেছে? তাহলে আমাকে কেন মনে করিয়ে দেয়নি সে? খেয়াল করেনি, সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার ঘাড়ে পড়তে যাচ্ছে?' হেসে উঠল রিয়াজুল হাসান। 'কি মেয়ে বলুন দেখি! এটা একটা ভাইটাল ক্লু, তাই না? দু'জনের একজনেরও যদি আগে মনে পড়ত কথাটা, আপনাকে তাহলে আর এত ঝামেলা পোহাতে হত না।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, সিগারেটে টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল সিলিঙের দিকে। 'আগে কেন মনে পড়েনি আপনার?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল সিগারেট, তারপর হাসল রিয়াজুল হাসান। 'শুনুন তাহলে, আপনাকে সত্যি কথাই বলি। প্রফেশনাল এবং অন্যান্য কারণে, আমি চাইনি টীমটা ভেঙে যাক। সুব্রতকে আমি সন্দেহ করতাম ঠিক, আপনাকে তো বললামই, কিন্তু ব্যাপারটা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে এল, কি যে হলো আমার, সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে ওকে আড়াল করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম···'

'যা বলা যায়, সব দোষ একরামুল হকের ঘাড়ে চাপিয়ে···?'

'হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত তাই দাঁড়ায়। তবে, নিতান্তই অবচেতন মনের কারসাজি, বুঝতেই পারছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য মনে পড়তে বাধা দিল। কোন সন্দেহ নেই মনের গভীরে সুব্রতকে সাংঘাতিক ভালবাসি আমি।'

সিগারেটের লাল আগুনের দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থাকল রানা। 'তাহলে বলতে হয়, আপনার মন দু'ভাগে ভাগ হয়ে দু'রকম কাজ করেছে। মনের একটা

অংশ চেয়েছে শারমিনের সাহায্য নিয়ে সুব্রতকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করাতে। আরেকটা অংশ, চূড়ান্ত পর্যায়ে, সে যে অপরাধী এই বাস্তবতা মেনে নিতে পারেনি।'

'বিদঘুটে শোনাচ্ছে, জানি। কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা সেরকমই। নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল না আমার, এটাই হলো আসল কথা। আসলে বোধহয় আমি চেয়েছিলাম সুব্রত সম্পর্কে নিরেট কোন প্রমাণ পেলে তাকে তার ভুল পথ সম্পর্কে সতর্ক করে দেব, ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব...'

'তাকে শোধরাবার একটা সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর যখন দেখলেন, তা সম্ভব নয়, অনেক দেরি হয়ে গেছে, আপনার অবচেতন মন আপনাকে সাবধান করে দিয়ে বলল- "রোখো! আওর আগে মাত বাড়ো"!'

হেসে ফেলে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রিয়াজুল হাসান। তার সাথে রানাও হাসল। 'তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? দোষী একরাম সাহেব নন, রফিকুল বারী নন, শারমিন নয়-কারণ ফটোতে দেখা যাচ্ছে তাকে-আমিও নই, তাহলে আর বাকি থাকল কে? ও কি স্বীকারোক্তি দিয়েছে?'

'এখনও দেয়নি।'

'একটা আহাম্মক,' বিষণ্ন সুরে বলল রিয়াজুল হাসান। 'এত সুন্দর একটা ক্যারিয়ার...'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'সব জানিয়ে আপনাকে নিশ্চিন্ত করার জন্যেই আসা। খুশি হয়েছি স্ক্রীন যেদিন শেষ করলেন সেদিনের তারিখটা আপনার মনে পড়ায়। আপনার মুখ থেকে কথাটা শুনতে চেয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারি।'

'গুডবাই, হাসান সাহেব। যোগাযোগ থাকবে। কাল হয়তো একবার দেখা করতে আসতে পারি।'

'গুডবাই, মেজর। এক মিনিট, আমি সিকিউরিটি অফিসারকে ফোন করি।'

কয়েক মিনিট পর, ধীর পায়ে গাড়ির দিকে হাঁটছে রানা। সাক্ষাৎকারটা ওকে ক্লান্ত করে তুলেছে। কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছে, দুর্বলতা দূর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় নেই। খুব তাড়াতাড়ি অনেকগুলো কাজ সারতে হবে।

জেলখানার এক কোণে, আলাদা একটা সেলের ভেতর আটকে রাখা হয়েছে সুব্রত বড়ুয়াকে। সরু একটা চৌকির ওপর বিছানা ছাড়াও বসার জন্যে চেয়ার দেয়া হয়েছে ওকে। শুয়ে ছিল, রানাকে দেখে উঠে বসল। সাথে জেল সুপার এসেছেন, তাঁর উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, ওদেরকে একা রেখে সেল থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

'কি বলে অভ্যর্থনা জানাব আপনাকে?' ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করল সুব্রত বড়ুয়া। 'শুনলাম-আমি নাকি আপনাকে বিষ খাইয়েছি। বেঁচে গেছেন, সেজন্যে

অভিনন্দন জানাই।'

লোকটা যদি অপরাধী হয়, স্বীকার করতে হবে প্রতিভাবান অভিনেতা।

'আমাকে শুধু একা নয়, শারমিনকেও ঝাওয়ানো হয়েছে,' হাসিমুখে বলল রানা। 'সে-বিষয়েই কথা বলার জন্যে এলাম। সেদিন রাতে জুবিলী রোডে কি করছিলেন আপনি?'

হাত দিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গি করল সুব্রত বড়ুয়া। 'এই একই প্রশ্ন অন্তত একশো বার করা হয়েছে আমাকে,' ঝাঁঝের সাথে বলল সে। 'আবারও বলছি, আমি উত্তর দেব না।'

কঠিন পাত্র, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে হুমকি ইত্যাদি কম দেয়া হয়নি, সব প্রতিরোধ করেছে সে। তবে, সন্দেহ নেই, মনের গভীরে নিঃসঙ্গ বোধ করছে, ভয়ও পাচ্ছে। এই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত কোমল ব্যবহারে হয়তো জাদুমন্ত্রের মত কাজ হতে পারে।

'বসতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনাকে আমি বাধা দিয়ে রাখতে পারব না।'

চেয়ারটায় বসে সিগারেট ধরাবার প্রস্তুতি নিল রানা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে না ধরিয়ে পকেটে রেখে দিল, 'শুনুন। আপনাকে বুঝতে হবে, বিপদটা এখনও খুব বড় হয়ে দেখা দেয়নি। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ঠিক যখন বিষটা কফিতে মেশানো হয় তখন আপনি শারমিনের ঘরের আশপাশে ছিলেন। ওখানে আপনার উপস্থিত থাকার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, সেটা চেপে গেলে নিজের জন্যে বিপদটাকে আপনি সত্যি সত্যি ভয়ঙ্কর করে তুলবেন। মুখ বন্ধ রাখুন, খুব দ্রুত হত্যার অভিযোগে কাঠগড়ায় দেখতে পাবেন নিজেকে। ঠিক সেটাই কি চাইছেন আপনি, সুব্রত বাবু?'

ভয়ের একটা ছায়া ফুটল সুব্রত বড়ুয়ার চোখে। 'কেন তা চাইব! কিন্তু কারণটা যদি বলি, কেউ বিশ্বাস করবে না। গোটা ব্যাপারটা এমন ছেলেমানুষি যে···এখন বরং আমার লজ্জাই লাগছে···' থামল সে, যেন আশা করছে কোন মন্তব্য শুনতে পাবে। রানা কিছু বলল না দেখে আবার শুরু করল সে, 'কারণটা আর কিছুই নয়, ঈর্ষা।'

'ঈর্ষা?'

'শারমিন আমাকে ফোন করে বলল, সে আমার সাথে বেরুতে পারবে না। প্রথম কয়েক মিনিট সব ঠিক ছিল, স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিলাম। তারপরই সন্দেহটা জাগল—শারমিনের সাথে কি অন্য কোন পুরুষ আছে? তারপর ভাবলাম, হ্যাঁ, ঠিক তাই। মনের অবস্থা এমন দাঁড়াল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে কখন হোস্টেলের সামনে পৌঁছে গেছি নিজেই জানি না। কি বলবেন জানি···পরিণত একজন মানুষ এ-ধরনের অদ্ভুত আচরণ করতে পারে না···'

'না,' সহাস্যে বলল রানা। 'মোটেও অদ্ভুত নয়।' গলার স্বর হঠাৎ খাদে নামাল ও, 'প্রেমে পড়ে আমিও একবার···থাক সেকথা।' হঠাৎ গম্ভীর হলো ও।

'যদি জানতাম শারমিনের ঘরে আপনি আছেন তাহলে তো যেতামই না···'

'পুলিসকে আপনি কথাটা বলেননি কেন? আটচল্লিশ ঘণ্টা মুখ বন্ধ করে থাকার কি কারণ? কি ঘটতে যাচ্ছে আপনি জানেন না?'

'কে বিশ্বাস করবে? এই বয়সে···প্লীজ, আর কেউ যেন না শোনে···'

'বলতে হয়তো হবে, তবে সম্ভব হলে চাপা থাকবে, কথা দিলাম।'

'না, মানে···শারমিন জানলে লজ্জায় আমি···'

'ঠিক আছে। জানবে না।'

বাইরে থেকে দেখে যাই মনে হোক, অন্তত এই মুহূর্তে অসহায় শিশুর মত লাগল সুব্রতকে। শারমিনকে দেবীর মত পুজো করে সে, আর দেবী স্বয়ং তার প্রতি এখনও পুরোপুরি সদয় নয় বলে নিজের ব্যক্তিত্বহীন আচরণ গোপন রাখতে চায়। সুব্রতকে আরও অসহায় করে তোলার কোন ইচ্ছে রানার নেই, তবে দেবীর আসন থেকে শারমিনকে নামাতে পারলে ওর তদন্তের স্বার্থে অনুকূল ফল পাওয়া যেতে পারে। 'না বলে পারছি না,' খুক করে কাশল রানা, 'শারমিনকে নিয়ে আপনি বোধহয় খানিকটা বোকামি করে ফেলেছেন।'

একটা ঝাঁকি খেলো সুব্রত। 'কি? মানে?'

'যা বললাম।'

'আপনি বলতে চাইছেন আমার প্রতি তার ধারণা, অনুভূতি···?'

'আপনি জানেন কিনা জানি না, তবে একটা কথা সত্যি, আপনার সাথে ঘন ঘন বেড়াতে বেরুনোর পিছনে তার একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল।'

'গোপন উদ্দেশ্য? কি বলছেন আপনি!'

'শারমিন আপনাকে রাজনীতি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করেছে, তাই না?'

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে রানার মুখে কি যেন খুঁজল সুব্রত, তারপর বলল, 'হ্যাঁ, আমাকে কথা বলাতে চেয়েছে সে। কারণটা আমি বুঝিনি।'

'সহজ ব্যাখ্যা আছে। কাজটা শারমিন নিজের বুদ্ধিতে করেনি। আরেকজন তাকে অনুরোধ করে।'

বিছানা থেকে লাফ দিয়ে রানার সামনে পড়ল সুব্রত বড়ুয়া। 'সব খুলে বলুন তো! নাকি আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন?'

'আপনার রাজনৈতিক আনুগত্য সম্পর্কে একজনের মনে সন্দেহ দেখা দেয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করেন। তাঁর সে অধিকার আছে, কারণ প্রজেক্টের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তাঁকে দায়ী করা হবে। তাঁর কথামতই শারমিন আপনার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়।'

স্থির পাথর হয়ে গেল সুব্রত, শুধু মুখে ছায়া পড়ল গভীর বেদনার। 'শারমিন··· শারমিন আমাকে···আপনি ঠিক জানেন এ-সব সত্যি?' ধীরে ধীরে গম্ভীর হলো সে। 'কে সে? কার কথায় শারমিন···?'

'তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল, ব্যস, এখানেই ব্যাপারটার ইতি ঘটুক না?'

হাত দুটো শক্ত মুঠো হয়ে গেল সুব্রত বড়ুয়ার। 'না, আমাকে জানতে হবে। তা না হলে আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব না।'

'বিশ্বাস করতে অসুবিধে হলে শারমিনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

'না, আমি ভাবতেও পারি না···আপনি কি এ-বিষয়েই তার সাথে সেদিন রাতে আলাপ করছিলেন?'

'হ্যাঁ, আরও অনেক বিষয়ের মধ্যে এটাও ছিল।'

'সুব্রতটা কি বোকা, বলে হেসে গড়িয়ে পড়ল শারমিন, তাই না?' প্রায় হিংস্র হয়ে উঠল বড়ুয়া বাবুর চেহারা। 'আমাকে নাকানিচোবানি খাইয়ে···'

'না, আপনি তাকে ভুল বুঝবেন না। কাজটা করতে হয়েছে, কিন্তু সেজন্যে খুশি হওয়া তো দূরের কথা, লজ্জায় বেচারি মরে যাচ্ছে! আমি যখন তাকে বললাম যে আপনি তাকে ভালবাসেন, আরও কষ্ট পেয়েছে সে···'

'কি।' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সুব্রত। 'আপনি তাকে বললেন! ওভ গড! এতদিনেও সে বোঝেনি, ব্যাখ্যা করে তাকে আপনার বোঝাতে হলো?' ঝট্ করে ঘুরে লোহার রড আর তারের জাল লাগানো খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল সে।

'শারমিন আপনাকে পছন্দ করে, সে নিজে আমাকে বলেছে।'

'পছন্দ করে!' ঘৃণায় হিসহিস করে উঠল সুব্রত বড়ুয়া। জানালার দিকে পিছন ফিরল সে, চোখ দুটো বিস্ফারিত। 'আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে, ছিহ্! ও এত নীচ হতে পারল! আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করিনি শারমিন একটা··· একটা দুশ্চরিত্রা মেয়ে···!'

'তা সে নয়,' শান্তভাবে বলল রানা।

'রাখুন সাহেব!' প্রায় ধমকে উঠল সুব্রত বড়ুয়া। 'আপনার কি, এই জঘন্য আচরণ যদি আপনার সাথে করত তাহলে দেখতেন কেমন লাগে!'

কথা না বলাই উত্তম বলে ভাবল রানা।

'আমাকে তাহলে বেঈমান বলে মনে করে সে! বেশ বেশ! উপযুক্ত প্রতিদানই বটে!'

'হ্যাঁ, অন্তত এ-ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজ করেছেন। শারমিনের সন্দেহ, বেঈমান আপনিও হতে পারেন।'

'ওটা একটা ডাইনী!' চিৎকার জুড়ে দিল সুব্রত বড়ুয়া। 'আমি তাকে ঘৃণা করি! আমি বেঈমান, তাই না? সে নয় কেন? সে হতে পারে না? আমি যদি বলি, সে-ই ডকুমেন্টগুলো চুরি করে জাপানে পাচার করেছে?'

'কথাটা আমিও ভেবেছি,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দেখছি না।'

হঠাৎ হেসে উঠল সুব্রত বড়ুয়া। 'তারমানে জালে আপনাকেও সে আটকেছে? রূপ আর ভঙ্গি দেখিয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছিল মেয়েটা, ভুলে যাবেন না! বিশ্বাস করুন, পরিষ্কার করে কিছু না বললেও আমি হলপ করে বলতে পারি, সে আমার সাথে আগাগোড়া প্রেমের অভিনয়ই করে গেছে। বোধহয় আপনার সাথেও···'

'না,' বলে চুপ করে থাকল রানা।

রানার দিকে বাঁকা চোখে তাকাল সুব্রত বড়ুয়া। 'ফটোটায় সে আছে, কিন্তু তারমানে এই নয় যে ওটা সে-ই তোলেনি। আপনি জানেন, সে দক্ষ ফটোগ্রাফার? তার পক্ষে যে-কোন ষড়যন্ত্র করা সম্ভব।'

'ষড়যন্ত্র করে বিষ মেশাবে কফিতে, তারপর সেটা খেয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নেবে?'

'মানে?' প্রসঙ্গটা ধরতে এক সেকেন্ড সময় নিল সুব্রত বড়ুয়া। 'ও, বিষ।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ঠিক আছে, আসুন ওটা নিয়ে আলোচনা করি। শুনেছি, আপনারা একসাথে ডিনার খেয়েছেন। প্রস্তাবটা কার ছিল?'

'শারমিনের।'

'সে কফি খায় না। শুনেছি আপনার জন্যে আনানো হয়। কফির কথা কে তোলে?'

'শারমিন।'

'খায় না, কিন্তু সেদিন খেলো—কেন? নিজের ইচ্ছেয়, নাকি আপনি তাকে অনুরোধ করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, মানে…'

'আপনি তাকে খাইয়েছেন। কেন?'

'কারণটা আপনাকে আমি বলতে বাধ্য নই।'

'কিন্তু পরিষ্কার, তাই না? আপনি ভয় পেয়েছিলেন শারমিন হয়তো আপনার কফিতে বিষ মিশিয়ে রেখেছে।'

'শুনুন,' বলল রানা। 'এখানে কে কাকে জেরা করছে?'

'আমি আপনাকে,' গলা চড়িয়ে বলল সুব্রত বড়ুয়া। 'সে অধিকার আমার আছেও বটে। আপনি আমার মাথাটাকে প্রায় বিগড়ে দিয়েছেন। কয়েকটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝার চেষ্টা করছি আমি। ধরুন, শারমিন সন্দেহ করল আপনি জানেন সে আপনার কফিতে বিষ মিশিয়েছে। এবার, আপনি যদি তাকে কফি খেতে বলেন, খাবার জন্যে চাপ দেন, কি করার ছিল তার? খেতে অস্বীকার করলে, আপনি হয়তো খাবেন না। যদি খায়, তাহলে তাকেও মরার ঝুঁকি নিতে হয়—যদি না সময়মত ডাক্তারকে খবর দেয়া যায়। কিন্তু শুধু এভাবেই নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারে সে—চিরকালের জন্যে। ঝুঁকিটা ভয়ঙ্কর, কিন্তু নিয়েছে সে, এবং আপনাকে বোকা বানিয়েছে।'

হেসে উঠল রানা। 'রূপকথা পড়ার অভ্যেসটা এখনও ছাড়েননি দেখছি। আপনার বিবেচনা থেকে মেয়েটা স্বয়ং বাদ পড়ে যাচ্ছে। এতদিন ধরে তাকে দেখে কি মনে হয় আপনার, তার পক্ষে কাউকে বিষ খাওয়ানো সম্ভব? প্রেম আর ঘৃণা নাকি পাশাপাশি থাকে, এই মুহূর্তে আপনার ভেতর সম্ভবত শুধু ঘৃণাই উথলে উঠছে।'

হিংস্রদৃষ্টিতে রানার দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সুব্রত বড়ুয়া, তারপর হিসহিস করে বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে আপনার মাথায় আগুন ধরাবার ব্যবস্থাই করি। বলুন তো, শারমিন আর একরামুল হক যে পরস্পরের আত্মীয়, আপনি জানেন?'

রানার দম বন্ধ হয়ে এল। 'আত্মীয়?'

'জানেন না! একরামুল হক শারমিনের শ্বশুর ছিলেন, বুঝলেন! আমার বানানো কথা নয়, ইচ্ছে করলেই খোঁজ নিয়ে যাচাই করতে পারবেন। শারমিনের স্বামী,

আহসানুল হক, যার সাথে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, তার সৎ ভাই ছিলেন একরামুল হক–মা এক, তবে বাবা আলাদা।' বিজয়ীর ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে রানার দিকে সহাস্যে তাকিয়ে থাকল সুব্রত বড়ুয়া।

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়েছে রানা। কথাটা আগে কেন কেউ জানায়নি তাকে?

'ইন্টারেস্টিং, তাই না?' জিজ্ঞেস করল সুব্রত বড়ুয়া। 'সম্ভবত তাৎপর্যপূর্ণও বটে, কি বলেন?'

হ্যাঁ, অবশ্যই। কিন্তু সে-কথা স্বীকার করতে রাজি নয় রানা, তাই শুধু বলল, 'ঠিক আছে। আপনি তাহলে শারমিনকে অভিযুক্ত করছেন। আপনার প্রতি অন্যায় করে তার মন খারাপ হয়ে আছে, তবে আপনার অভিযোগ শোনার পর আশা করি তার মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। আপনি বরং প্রস্তুতি নিন, তার সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগটা করলে ভাল হয়।'

'তার সামনে···কেন? তার দরকার কি? কেন আমি···' কিন্তু ইতোমধ্যে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা, প্রতিবাদরত সুব্রত বড়ুয়াকে সেলের ভেতর রেখে বাইরে বেরিয়ে এল ও।

সোহেলের কাছ থেকে পাওয়া রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে সুব্রত বড়ুয়ার দেয়া তথ্য যাচাই করা সম্ভব হলো। একরামুল হকের এক সৎ ভাই আছে বটে, নাম আহসানুল হক। শারমিন চৌধুরীর ফাইল ঘেঁটে জানা গেল, আহসানুল হক নামে এক লোকের সাথেই তার বিয়ে হয়েছিল; তবে আহসানুল হক বাংলাদেশে আরও অনেক আছে, ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখা দরকার।

ক্লিনিকে পৌঁছে রানা দেখল, নিজের কেবিনে ঘুমে ঢুলছে শারমিন। দরজা খোলার আওয়াজ শুনে চোখ মেলে তাকাল সে। রানাকে দেখে হাসল। বলল, 'এইমাত্র আপনার কথা ভাবছিলাম।'

দরজা বন্ধ করে বেডের সামনে এসে দাঁড়াল রানা, শারমিনের বাড়ানো হাতটা দেখতে না পাবার ভান করল। 'আপনার প্রাক্তন স্বামী সম্পর্কে বলুন আমাকে।'

'ও, আচ্ছা, তার কথা তাহলে জেনে ফেলেছেন!'

একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। 'কথাটা কি সত্যি? একরামুল হক আর আহসানুল হক পরস্পরের সৎ ভাই?'

'হ্যাঁ,' কোন রকম ইতস্তত না করেই বলল শারমিন। 'কথাটা আগেই আপনাকে বলা উচিত ছিল। হয়তো বিশ্বাস করবেন না, এইমাত্র আপনাকে দেখেই বলার ইচ্ছে হয়েছিল আমার···'

'হ্যাঁ। আপনার মুখে শুনতে পেলে ভাল হত। ইদানীং আপনার সাথে একরামুল হকের দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল?'

'না। ল্যাবে যেদিন এলেন, বহু বছর পর সেদিনই প্রথম দেখা হলো।'

'যোগাযোগ ছিল না? ফোন করতেন না আপনারা? কিংবা চিঠি···?'

বিছানায় উঠে বসল শারমিন। 'কি আশ্চর্য! ডিভোর্স হয়ে গেছে কত বছর আগে, স্বামীর বড় ভাইয়ের সাথে কেন আমি যোগাযোগ রাখব?'

'ল্যাবে যেদিন এলেন, আপনাদের মধ্যে কি আলাপ হলো?'

'অতীতের কথা? কিছুই আলাপ হয়নি। পরস্পরকে আমরা চিনতে পারলাম, কিন্তু প্রসঙ্গটা তুললাম না।'

'এক সময় ভাসুর ছিলেন ভদ্রলোক, তার সম্পর্কে নিশ্চয়ই সব কথা জানা আছে আপনার। কি কি জানেন বলুন দেখি।'

তীক্ষ্ণচোখে তাকাল শারমিন। 'ঠিক কি জানতে চান আপনি?'

'তাঁর মত জ্ঞানী-গুণী মানুষের অমন অধঃপতন হলো কেন?'

'শুনেছি প্রথম জীবনে প্রেমে ব্যর্থ হবার ফলেই তিনি মদ ধরেন। তারপর আর ছাড়তে পারেননি। বোধহয় সেজন্যেই সারা জীবন বিয়েও করেননি...'

'তাঁর পাকিস্তানে গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে কি জানেন আপনি? লাহোর থেকে পালিয়ে আসার পর ভারত সরকারই বা কেন তাঁকে গ্রেফতার করেছিল?'

'পাকিস্তানে গ্রেফতার হয়েছিলেন? ভারত সরকার তাঁকে গ্রেফতার করেছিল?' আকাশ থেকে পড়ল শারমিন। 'কই, আমি তো কিছু জানি না। অবশ্য এ-সব আমার বিয়ের অনেক আগের ঘটনা। তবে,' চিন্তিত দেখাল তাকে, 'এ-ধরনের কিছু ঘটলে আহসান আমাকে বলত...'

'আপনাদের বিয়েটা ভেঙে গেল কেন?'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার...'

'আমি কিন্তু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করছি না,' ঠাণ্ডা গলায় মনে করিয়ে দিল রানা। 'ভুলে যাবেন না, একজন বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আমি।'

'আহসান ড্রাগ অ্যাডিক্ট ছিল,' বলে মাথা নিচু করল শারমিন। 'কোনভাবেই তাকে আমি ভাল করতে পারিনি।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তাহলে একরামুল হকের গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে কিছু জানেন না?'

'না।'

'কিন্তু এখানে বলা হয়েছে,' সোহেলের দেয়া রিপোর্টটা পকেট থেকে বের করল রানা, পাতা উল্টে তথ্যগুলো পড়ল। প্রচণ্ড বিস্ময়ের সাথে দেখল, ভারত বা পাকিস্তানে একরামুল হকের গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে সোহেলের দেয়া রিপোর্টে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। শুধু লেখা আছে, 'অসুস্থ অবস্থায় লাহোর থেকে পালিয়ে আসেন তিনি, তারপর দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতের একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন ছিলেন'। 'ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! এখানে ও-সব কিছুই লেখা নেই।' শারমিনের দিকে তাকাল ও। 'ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আহসানুল হককে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে। বলতে পারেন, তাঁকে কোথায় পাব আমি?'

'খুলনার একটা ওষুধ কোম্পানীতে চাকরি করে। কোম্পানীর নাম ছাড়া আর কিছু আমি জানি না।'

'প্লীজ, নামটা বলুন।'

নামটা জেনে নিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা, শারমিনকে বলল খানিক

পর ফিরে আসবে। ক্লিনিকের অফিস থেকে খুলনায় ফোন করল রানা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওষুধ কোম্পানীর হেড অফিসের সাথে যোগাযোগ হলো। আহসানুল হকের এক সহকর্মী জানাল, একরামুল হকের জানাজায় যোগ দেয়ার জন্যে আহসানুল হক এই মুহূর্তে ঢাকায় রয়েছে। ঢাকায় হোটেলে উঠেছে সে। হোটেলের নামটা জেনে নিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল রানা।

ঢাকার হোটেলে ফোন করে, ভাগ্য ভাল, আহসানুল হককে পেয়ে গেল রানা। নিজের পরিচয় দিল সাংবাদিক বলে, অধ্যাপক একরামুল হকের বিশদ জীবনী জানতে পারলে একটা লেখা লিখবে। বিশেষ করে ভদ্রলোকের লাহোর সেন্ট্রাল জেল ভেঙে পালানো আর ভারতে গ্রেফতার হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দরকার তার। উত্তরে কর্কশ স্বরে হাসল আহসানুল হক। কে, সে জানতে চাইল, আজগুবি গল্পটা বানিয়েছে? পাকিস্তান থেকে একরামুল হক পালিয়ে এসেছিলেন বটে, কিন্তু জেল ভেঙে নয়, কারণ সেখানে তিনি গ্রেফতার হননি। আর ভারতে তাঁর গ্রেফতার হওয়ার কাহিনীও স্রেফ ভিত্তিহীন। অতিরিক্ত মদ খাওয়ার দরুন তাঁর লিভারে সংক্রমণ দেখা দিয়েছিল, একটা ক্লিনিকেই কাটে তিন মাস। তারপর, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান তিনি।

হতভম্ব হলো রানা। তারপর ভাবতে বসল ও। হঠাৎ করেই মনে পড়ল এক কর্নেলের কথা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন ভদ্রলোক। আবার ঢাকায় ফোন করল রানা। ভদ্রলোককে বাড়িতেই পাওয়া গেল। রানার প্রশ্ন শুনে তিনি হাসলেন। বললেন, 'দূর, কে বলল তোমাকে? আর্মি ইন্টেলিজেন্সে ছিলাম আমি, একরামুল হককে চিনতামও। না, তাঁকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হলেও, পাকিস্তান পুলিস ধরতে পারেনি। আমরা দু'দিন আগে পরে ভারতে পালিয়ে আসি। আহমেদাবাদে তাঁর সাথে আমার দেখা হয়। ভারত সরকার তাঁকে গ্রেফতার করার প্রশ্নই ওঠে না। হ্যাঁ, তখন তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন।'

ধন্যবাদ জানিয়ে ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। দ্রুত কাজ করছে ওর মাথা। গোটা ব্যাপারটা এতদিনে একটা আকৃতি পাচ্ছে বলে মনে হলো ওর।

# চোদ্দ

সময় বয়ে চলেছে অথচ টাইগার পাস, কদমতলীতে গিলটি মিয়ার ছায়া পর্যন্ত কোথাও দেখা যাচ্ছে না। প্ল্যান বদল করার দরকার হবে কিনা ভাবছে রানা, এই সময় নাটকীয় আকস্মিকতার সাথে গাড়ির পাশে সটান খাড়া হলো এক লোক।

আগেই পৌঁচেছে গিলটি মিয়া, ক্রল করে গাড়ির জানালার নিচে এসে হঠাৎ এভাবে খাড়া হবার কারণ, তাকে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিল রানা। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার, তারপর তাকে চিনতে পেরে ধড়ে প্রাণ ফিরে

পেল। 'এ-সব কি? জিনিসটা এনেছ?'

গিলটি মিয়ার ছোট্ট মুখে চওড়া হাসি ফুটল। 'ইয়েস, স্যার।' চোরের মত চারদিকে চট করে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঢোলা ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করল সে, জানালা গলিয়ে ধরিয়ে দিল রানার হাতে। পিস্তলটা জ্যাকেটের পকেটে ভরে গাড়ি থেকে নেমে এল রানা।

'চলো।'

'আশপাশটা নির্জন তো, স্যার? একবার চষে এলে হত না?'

'এখন আর সময় নেই।' একশো গজের মত হেঁটে গলির মুখ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। 'ঝুঁকিটা নিতেই হবে।' বাড়িটার সামনে দিয়ে দশ গজের মত এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, রাস্তায় লোকজন থাকলেও তারা সবাই এইমাত্র ওদেরকে পাশ কাটিয়ে গেছে, কেউ তাকিয়ে নেই। ঘুরল রানা, ওর সাথে গিলটি মিয়াও। 'যাও, তালা খোলো।'

বাড়িটার দরজায় বড় একটা তালা ঝুলছে, ভেতরে লোকজন নেই। এক হাতে কোমরের কাছে ট্রাউজার ধরে, অপর হাতটা পকেটে ভরে চাবি বের করল গিলটি মিয়া, তার পিছনে এসে দাঁড়াল রানা।

চাবি নয়, গিলটি মিয়ার ভাষায় জাদুর কাঠি, তার নিজের আবিষ্কার। ফুটোয় ঢুকিয়ে বার তিনেক ঘোরাতেই খুলে গেল তালা।

'তালা লাগিয়ে কেটে পড়ো,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'খবরদার, রাস্তায় ঘুরঘুর করবে না। তাড়াতাড়ি, যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে।'

'ঠিক আচে, স্যার। আশপাশেই আচি আমি।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। কবাট বন্ধ করল। বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল গিলটি মিয়া। কান পেতে থাকল রানা, তার পায়ের শব্দ দ্রুত মিলিয়ে গেল দূরে।

এই ঘরে আগেও এসেছে রানা, কোন ফার্নিচার নেই কেউ এসে পড়ার আগে ঘরগুলো একবার ঘুরে দেখা দরকার। ড্রইংরুমটাও পরিচিত–সোফা, কালার টিভি, কার্পেট সব আগের মতই আছে। দুটো জানালা, তার মধ্যে একটা খোলা। বাইরে রেললাইন দেখা যায়। ড্রইংরুম থেকে একটা করিডরে বেরিয়ে এল ও। উল্টোদিকের দেয়ালে দুটো দরজা, দুটোই বেডরুম, দুই বেডরুমের মাঝখানে একটা দরজা।

করিডরের ডান দিকে আরেকটা দরজা খোলা দেখে ঢুকে পড়ল রানা। এটা ডাইনিং রুম। ডাইনিং রুমের আরেকটা দরজা দিয়ে দ্বিতীয় বেডরুমে ঢোকা যায়। আত্মগোপন করার জন্যে দ্বিতীয় বেডরুম আর ডাইনিং রুমটাকে পছন্দ হলো রানার। করিডরের ডান দিকে আরেকটা দরজা আছে, তবে সেটা উল্টোদিক থেকে বন্ধ।

লুকোনোর জন্যে ডাইনিংরুমটাকে বেছে নিল রানা। জানালা আর দরজাগুলোয় মোটা পর্দা ঝুলছে, আড়াল নেয়া সম্ভব। ড্রইংরুমে ফিরে এসে একটা সোফায় বসল ও, অপেক্ষার পালা শুরু হলো। মাঝে মধ্যে একটা করে ট্রেন পাশ কাটাচ্ছে, থর থর

করে কেঁপে উঠছে গোটা বাড়ি। তারপর আবার সব চুপচাপ। আশপাশের কোন ছাদ থেকে খানিক পর পর মিঁউ মিঁউ করছে একটা বিড়াল।

সোয়া ছ'টার মত বাজে, ইতোমধ্যে চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, এই সময় সদর দরজায় শব্দ হলো। তালা খুলছে কেউ। চিতার মত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে সোফা ছাড়ল রানা, ড্রইংরুম থেকে করিডর হয়ে অন্ধকার ডাইনিং রুমে ঢুকে পর্দার আড়ালে গা ঢাকা দিল। খুট করে আওয়াজের সাথে আলোকিত হয়ে উঠল ড্রইংরুম, আলোর আভাটুকু শুধু দেখতে পেল রানা। করিডরে পায়ের আওয়াজ, প্রথম বেডরুম হয়ে দ্বিতীয় বেডরুমে ঢুকল। একবার ইচ্ছে হলো পর্দার বাইরে মুখ বের করে দেখে, কিন্তু ঝুঁকিটা নিল না রানা। খুক করে কাশির শব্দ হলো—পুরুষকণ্ঠ। পায়ের আওয়াজ সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। পানির আওয়াজ হলো। বাথরুম থেকে বেরিয়ে কোথাও থামল না লোকটা, সোজা গিয়ে ঢুকল কিচেনে। কাপ-পিরিচের শব্দ হলো।

দশ মিনিট পর সব চুপচাপ, কোথাও কোন শব্দ নেই। দ্বিতীয় বেডরুমে ঢুকেছে লোকটা, কি করছে আল্লা মালুম। ঝুঁকি নিয়ে পর্দার আড়াল থেকে ধীরে ধীরে চোখ বের করল রানা।

দ্বিতীয় বেডরুমে একটা চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কি যেন লিখছে লোকটা। ইতোমধ্যে কাপড় বদলেছে সে। পরনে স্লিপিং গাউন। রানার দিকে পিছন ফিরে বসেছে সে। খস খস করে লিখছে, সম্ভবত চিঠি। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে সেফটি ক্যাচ অন করল রানা।

একটানা পনেরো মিনিট লেখায় ব্যস্ত থাকল রিয়াজুল হাসান। তারপর রানার প্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘটল, যদিও ঠিক এভাবে ঘটবে বলে আন্দাজ করেনি ও। করিডর আর দ্বিতীয় বেডরুমের মধ্যবর্তী দরজা দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে ভেতরে ঢুকল দু'জন লোক। দু'জনের একজন মোটাসোটা, মাথায় টাক, যদিও এই মুহূর্তে তার চোখে চশমা নেই। লোকটাকে দেখার সাথে সাথে চিনতে পারল রানা। ঢাকার মণিপুরী পাড়ার ফ্ল্যাটবাড়িতে এই ভুয়া রফিকুল বারীকেই দেখেছিল ও। দ্বিতীয় লোকটা লম্বা, একহারা, চেহারায় কাটখোট্টা ভাব।

'গুড ইভনিং, মিস্টার হাসান,' মৃদু, শান্তকণ্ঠে বলল রফিকুল বারী।

চমকে উঠে ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল রিয়াজুল হাসান, মুখ ঝুলে পড়েছে। টেবিলের ওপর হাতের তালু রেখে চেয়ার ছাড়ার চেষ্টা করল সে, কিন্তু রফিকুল বারী হাত নেড়ে তাকে নিষেধ করল।

'নড়বেন না, প্লীজ। ওখানেই ভাল আছেন।' ভুয়া রফিকুল বারী আর তার সঙ্গী দুটো চেয়ার টেনে টেবিলের উল্টোদিকে বসল। আশ্চর্য কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, উপলব্ধি করল রানা। কিন্তু, ভাবল ও, লোকগুলো বাড়ির ভেতর ঢুকল কিভাবে? আগে থেকে কোথাও লুকিয়ে ছিল? তা সম্ভব নয়, উঁহুঁ। সবগুলো ঘর আর বাথরুম দেখে তারপর ডাইনিং রুমে লুকিয়েছে ও। তাছাড়া, ওদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে না ওর উপস্থিতি সম্পর্কে ওরা সচেতন।

'গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাটা আজ, এখনই হয়ে যাওয়া দরকার,' ঠাণ্ডা, প্রায় নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল নকল রফিকুল বারী। 'এভাবে তো আর চলতে দেয়া যায় না।'

ঘটনা যেদিকে মোড় নেবে বলে ধারণা করেছিল রানা, তার সাথে আলোচনার ধরন মিলে যাচ্ছে। রানার দিকে পিছন ফিরে থাকায় রিয়াজুল হাসানের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছে না ও, তবে কল্পনা করে নিতে অসুবিধে হলো না। বেশ জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে সে।

'আমরা আপনাকে কিছু না করে, হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলাম,' বলল রফিকুল বারী। 'যাই ঘটুক না কেন, আপনি কোন অ্যাকশনের মধ্যে যাবেন না। টোপ হিসেবে একরামুল হককে ব্যবহার করা হলো, কিন্তু ধাপ্পাটা কাজে লাগল না, কাজেই আরেকটা উপায় বের করার জন্যে কাজ শুরু করলাম আমরা। আগেই পরিষ্কার করে আপনাকে বলা হয়েছিল, এ-সব আমাদের কাজ। কিন্তু আপনাকে বারবার করে সাবধান করা সত্ত্বেও আপনি নির্দেশ অমান্য করলেন। নিজের পেশায় আপনি যতই দক্ষ হন, বিষ মেশাতে গিয়ে এমন কাঁচা একটা কাজ করে ফেললেন যে সব এলোমেলো হয়ে গেল।'

'কোথায়, এলোমেলো হলো কোথায়?' প্রতিবাদের সুরে বলল রিয়াজুল হাসান। 'সুব্রতকে গ্রেফতার করেছে ওরা। ওরা জানে সুব্রতই কাজটা করেছে। আজ সকালে মেজর রহমান আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন...'

রফিকুল বারী কর্কশ শব্দে হাসল একবার। 'তিনি ভাব দেখিয়েছেন, আপনাকে তিনি সন্দেহ করছেন না, এই তো? আপনার জায়গায় আমি হলে, ভদ্রলোককে ছোট করে দেখতাম না। প্রথমবার ধাপ্পা দেয়ার সময় এই ভুলটা আমাদেরও হয়েছে। আগাগোড়া, প্রথম থেকেই, ওটা যে একটা ধাপ্পা তা তিনি আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। তাই সমস্ত যুক্তি যখন বলছে যে একরামুল হকই দোষী, তখনও তিনি আসল অপরাধীর খোঁজে তদন্ত চালিয়ে গেছেন। একটা কথা পরিষ্কার, এই লোককে বেশিদিন বোকা বানিয়ে রাখা সম্ভব নয়। চিন্তা করবেন না, ভদ্রলোক খুব তাড়াতাড়ি চিনতে পারবেন আপনাকে।'

'তাহলে আমার...?' প্রায় ধরা গলায় শুরু করল রিয়াজুল হাসান।

বাধা দিয়ে ভুয়া রফিকুল বারী বলল, 'ভয় নেই, তাঁর দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আপনাকে ধরার সুযোগ তাঁকে আমরা অবশ্যই দেব না-দিতে পারি না। কারণটা পরিষ্কার, তাই না? সব দিক বিচার করে বলা যায়, তাঁর হাতে ধরা পড়ার জন্যে আপনি ঠিক ফিট নন। আমরা জানি, ধরা পড়লে আপনি কথা বলবেন।'

'কি বলছেন! কেন? না, অসম্ভব-কেন বলব!' ভয়ে কেঁপে গেল রিয়াজুল হাসানের কণ্ঠস্বর। 'আমি কথা দিচ্ছি, আমাকে নিয়ে যাই করুক ওরা, একটা কথাও আদায় করতে পারবে না। এদিক থেকে আপনারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। বিশ্বাস করুন...'

'কথা যদি আপনি না-ও বলেন,' আবার বাধা দিল রফিকুল বারী, 'আপনি আমাদের আর কোন কাজে লাগছেন না। আপনি আপনার চাকরি হারাবেন, তারমানে আমরা হারাব তথ্যের উৎস। এই যখন পরিস্থিতি, এখন তাহলে আপনিই বলুন, কেন আমরা আপনাকে প্রোটেকশন দেব?'

প্রশ্নটার কোন উত্তর হয় না, ষাড়া দশ সেকেন্ড অটুট থাকল নিস্তব্ধতা। এখনও অন্ধকার ডাইনিং রুমে, পর্দার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে রানা। বিজনেস

সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিরা যদি মুখ তুলে এদিকে তাকায়ও, পর্দার বাইরে বেরিয়ে থাকা ওর মুখ তারা দেখতে পাবে না। তিনজন লোক, তিনটে কাঠের মূর্তির মত বসে থাকল টেবিলের দু'দিকে। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল তৃতীয় লোকটি। চেহারা যেমন কাটখোট্টা, তার কণ্ঠস্বরও তেমনি বেসুরো।

'তাছাড়া, আপনি আমাদের তেমন কোন কাজে লাগেননি, মি. হাসান। ডকুমেন্টগুলো তিন ভাগে ভাগ করা, তারমধ্যে আমরা মাত্র দু'ভাগ পেয়েছি। বাকি এক ভাগ...'

'পাবেন, ওটাও পাবেন!' ব্যাকুল কণ্ঠে বলল রিয়াজুল হাসান। 'আমি আপনাদের কথা দিয়েছি, শেষ পর্যায়ের ডকুমেন্টগুলো ফাইনাল হওয়া মাত্র আপনাদের হাতে এক সেট তুলে দেব।'

'কিন্তু সে-সময় আমরা যদি বা আপনাকে দিইও, মেজর রহমান দেবেন না,' বলল তৃতীয় লোকটা। 'কাজেই আমরা ঠিক করেছি, ফাইল ক্লোজ করব। বি.সি.আই. বিস্তর কাঠ-খড় পুড়িয়েছে, তারা একটা রেজাল্ট পেতে ইচ্ছুক, কাজেই অপরাধীকে আমরা তাদের হাতে তুলে দিতে চাই—আসল অপরাধী, আপনাকে।'

শুধু ভাল করে দেখার জন্যে নয়, তৈরি থাকার জন্যেও বটে, পর্দা সরিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা। ডাইনিং রুমে আলো নেই, কাজেই লোকগুলো ওকে দেখে ফেলার ভয় কম। বিজনেস সিন্ডিকেটের এজেন্ট দু'জন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মহা আনন্দে হাসছে, তাদের কাছে যেন খুব মজার লাগছে পরিস্থিতিটা।

'কিন্তু আপনারা যে এইমাত্র বললেন আমি যাতে ওদের হাতে ধরা না পড়ি...' প্রতিবাদ জানাচ্ছে রিয়াজুল হাসান, কিন্তু সুরটা এমন করুণ যেন উত্তরটা কি হবে তা-ও তার জানা।

'আপনাকে ওদের হাতে তুলে দেয়া আর আপনার নির্জীব শরীর ওদের হাতে তুলে দেয়া, এক কথা নয়,' একঘেয়ে সুরে বলল দ্বিতীয় লোকটা। 'অপরাধ স্বীকার করে একটা চিঠি লিখে ফেলুন, ঝটপট। লিখুন, অ্যাটমিক এয়ারক্রাফট তৈরির জন্যে অ্যান্টি-রেডিয়েশন স্ক্রীন সম্পর্কে যে গবেষণা আপনারা চালাচ্ছেন তার বিশদ বিবরণ, আংশিক, আপনি একটা বিদেশী রাষ্ট্রে পাচার করেছেন। বিজনেস সিন্ডিকেটের নাম লিখবেন না; লিখুন বিদেশী রাষ্ট্র। লিখুন, কাজটা আপনি আদর্শগত কারণে করেছেন। তারপর লিখুন, পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার উপক্রম হওয়ায় আপনি...'

'দুনিয়া থেকে মুখ লুকোবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,' বাক্যটা সমাপ্ত করল ভুয়া রফিকুল বারী।

'চমৎকার! দুনিয়া থেকে মুখ লুকানো! ব্যস, আর কিছু নয়। ছোট্ট একটা স্বীকারোক্তি। আমাদের কথা বা আমাদের অর্গানাইজেশন সম্পর্কে কিছু লিখবেন না।'

দ্বিতীয় বেডরুম আর ডাইনিং রুমের মধ্যবর্তী দরজার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে। এখনও ওর দিকে পিছন ফিরে নিজের চেয়ারে বসে আছে রিয়াজুল হাসান। গত ক'মিনিটে কুঁকড়ে আকারে ছোট হয়ে গেছে সে। তার মাথা

নড়তে দেখে রানা বুঝল, সামনে বসা লোক দু'জনের দিকে পালা করে তাকাচ্ছে সে। তার ঘাড় ঘামে চকচক করছে।

'আপনি দেরি করছেন কেন?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল রফিকুল বারী। 'ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি সারা যায় ততই ভাল, তাই না? আপনার সাথে আমাদের এতদিনের সম্পর্ক, আমরাও তো চাই না এই নরক যন্ত্রণা দীর্ঘসময় ভোগ করুন আপনি। নিন, নিন—কাজটা সেরে ফেলুন।'

কাটখোট্টা লোকটা একটা সিগারেট ধরাল, একটা মাত্র টান দিয়ে সেটা বাড়িয়ে দিল রিয়াজুল হাসানের দিকে। 'ধরুন, এটা টানতে টানতে লিখে ফেলুন।'

প্রায় ছোঁ দিয়ে নিয়ে সিগারেটে ঘনঘন টান দিল রিয়াজুল হাসান, তার মাথার ওপর ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী উঠল। 'ঠিক আছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'আপনারা যা চান তাই হবে। দেব···একটা স্বীকারোক্তি লিখে দেব আমি···'

'আমরা এখুনি চাই,' বলল রফিকুল বারী। 'টেবিলে কাগজ কলম রয়েছে, শুরু করে দিন। আমি ডিকটেট করছি—আই, রিয়াজুল হাসান, অভ টোয়েনটি সেভেন টাইগার পাস, কদমতলী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ···'

আর কোন উপায় নেই বুঝতে পেরে কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল রিয়াজুল হাসান। লেখা শেষ করে কাগজটা বাড়িয়ে দিল সে।

'ওখানে, টেবিলের ওপরই রাখুন ওটা,' বলল রফিকুল বারী। 'কোথায় পাঠাতে হবে, আমরা জানি।' কোটের পকেটে হাত ভরে ছোট্ট একটা শিশি বের করল সে। ছিপি খুলে হাতের তালুতে খুদে একটা ক্যাপসুল নিল। ক্যাপসুলটা রাখল রিয়াজুল হাসানের সামনে, টেবিলের ওপর। 'কিছু না, স্রেফ গিলে ফেলুন,' সহাস্যে বলল সে, যেন প্যারাসিটামল খেতে বলছে। 'সাথে সাথে ফল পাবেন। কষ্টটুকু টেরই পাবেন না।'

তোতলাতে শুরু করল রিয়াজুল হাসান, 'দে-দেখুন এখনও আমি আ-আপনাদের কাজে আসতে পা-পারি। ভারতে নিয়ে চলুন আমাকে। ওখানে আপনাদের জন্যে কাজ করব আমি। নতুন একটা আইডিয়া আছে আমার মাথায়, সেটার ওপর কাজও শুরু করেছি। বিজনেস সিন্ডিকেট সাংঘা-ঘাতিক উপকৃত হবে। যদি চান, আমি স-সব লিখে দিতে পারি। শুধু একটা সুযোগ দিন আপনাদের কাজে লাগার···'

'না। নিজের সম্পর্কে আপনার যা ধারণা, তার সাথে আমরা একমত নই। আমরা জানি, আপনি একা প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান কমপ্লিট করতে পারবেন না। বেশিরভাগ কাজ তো আপনার সহকর্মীরা করেছেন। আপনাকে নিয়ে গেলে আমাদের গাড়ি ভাড়া পর্যন্ত উঠবে না···'

কাটখোট্টা লোকটা চেয়ার ছেড়ে উঠল। তার হাত যেন হাত নয়, একজোড়া পাকানো রশি। সে-দুটো সামনে বাড়িয়ে হেঁটে এল সে, দাঁড়াল রিয়াজুল হাসানের পাশে। 'আপনি যদি দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে চান, আই য়্যাম অ্যাট ইওর সার্ভিস। একটু হয়তো বেশি সময় লাগবে, তবে ফলাফল একই।'

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রিয়াজুল হাসান। আতঙ্কে আরও যেন একটু ছোট হয়ে গেল তার আকৃতি। হাতটা বাড়িয়ে দিল সে ক্যাপসুলের দিকে, আঙুলগুলো কাঁপছে।

'হ্যান্ডস আপ!' পিস্তল হাতে দ্বিতীয় বেডরুমে ঢুকল রানা।

কাটখোট্টা সাথে সাথে আদেশ পালন করল। কিন্তু ভুয়া রফিকুল বারী চেয়ার ছাড়তে শুরু করে খপ্ করে হাত ভরল পকেটে। এ-ধরনের সঙ্কটে দ্বিধা করা মানে অবধারিত মৃত্যু, ট্রিগার টেনে দিল রানা। বোমা ফাটার মত বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো পিস্তল। ব্যথায় ককিয়ে উঠল রফিকুল বারী, বাম হাত দিয়ে ডান হাতের কনুই চেপে ধরল, আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। রিয়াজুল হাসানের হাত দুটো বিদ্যুৎবেগে খাড়া হলো মাথার ওপর। শান্ত, সাবলীল ভঙ্গিতে সামনে বাড়ল রানা, চোখ দুটো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে তিনজনকে।

'দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ান, তিনজনই। যদি তাড়াহুড়ো করেন, গুলি করব। জেনে রাখুন, কোন লাভ নেই—গোটা বাড়ি ঘিরে রাখা হয়েছে। ভুয়া বারী সাহেব, বাম হাতটা ওপরে তুলুন।'

কেউ কোন শব্দ করল না, তিনজনই হেঁটে গেল দেয়ালের দিকে। নিঃশব্দ পায়ে রফিকুল বারীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, তাকেই সবচেয়ে বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছে ওর। লোকটার টাক মাথায় উল্টো করা পিস্তলের বাঁট দিয়ে সজোরে আঘাত করল ও। ছেড়ে দেয়া পাথরের মত পড়ে গেল রফিকুল বারী। অপর লোকটা আধপাক ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার ওপর। সতর্ক ছিল রানা, ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে লোকটার তলপেটে প্রচণ্ড গুঁতো মারল। কোমর বাঁকা হয়ে গেল কাটখোট্টার, পরিবেশনের ভঙ্গিতে তার মাথা আর ঘাড় রানার সামনে নুয়ে পড়ল। পিস্তলের দ্বিতীয় আঘাতে তার খুলি ফাটিয়ে দিল রানা। বন্ধুর পাশে নেতিয়ে পড়ল সে।

'না, ভাই, না-না, আমাকে মারবেন না!' করুণ সুরে আবেদন জানাল রিয়াজুল হাসান। 'আমি নড়ব না!'

'ঠিক আছে,' বলল রানা, তারপর তারও খুলি ফাটাল।

ধরাশায়ী তিনজনের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ একটু হাসল ও। কার্পেটের ওপর মজার একটা নকশা তৈরি করেছে লোকগুলো। রিয়াজুল হাসানের মাথা রফিকুল বারীর কোমরের ওপর পড়েছে দেখেই হাসি পেল ওর।

পালা করে তিনজনকে সার্চ করল রানা। একমাত্র রফিকুল বারীর পকেটে একটা পিস্তল পাওয়া গেল। সেটা পকেটে ভরে ড্রইংরুমে চলে এল ও, ফোনের রিসিভার তুলল। 'চলে এসো, গিলটি মিয়া। আবর্জনা সাফ করবে না?'

দ্বিতীয় বেডরুমে ফিরে এসে তিনজনকে পরীক্ষা করল রানা। জ্ঞান ফিরে পেতে সময় নেবে ওরা। করিডরে বেরিয়ে এসে ডান দিকে এগোল ও, আগেই দেখেছে বন্ধ দরজাটা খোলা হয়েছে। সন্দেহ নেই, এ-পথেই ঢুকেছে বিজনেস সিন্ডিকেটের লোকগুলো। খোলা দরজা টপকে বেরিয়ে এল রানা একটা ছোট্ট উঠানে। চারদিকে উঁচু পাঁচিল, উল্টোদিকের পাঁচিলে একটা দরজা, পাশের বাড়ি যাওয়ার পথ।

এতদিনে বোঝা গেল রেললাইনের ধারের এই বাড়িটায় কেন বাস করছে রিয়াজুল হাসান। দুটো বাড়ির মাঝখানে এই দরজাটা থাকায় বিজনেস সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিরা তার সাথে নির্বিঘ্নে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারত। তথ্য পাচার করার জন্যে অত্যন্ত নিরাপদ একটা সুযোগ করে দিয়েছে বাড়িটা। সারারাত সাতাশ নম্বর বাড়ির ওপর নজর রেখেছিল গিলটি মিয়া, কসম খেয়ে রানাকে জানিয়েছে সে, রিয়াজুল হাসান বাড়ি থেকে একবারও বেরোয়নি। কিন্তু ঠিকই বেরিয়েছিল সে, তবে উনত্রিশ নম্বর বাড়ি থেকে, সাতাশ নম্বর থেকে নয়। কফিতে বিষ মিশিয়ে আবার সে সাতাশ নম্বরে ফিরে আসে, উনত্রিশ নম্বর বাড়ি হয়ে।

কলিংবেলের আওয়াজ শুনে রানা ধারণা করল, গিলটি মিয়া পৌঁছে গেছে।

# পনেরো

ধূমায়িত কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে চুরুটে অগ্নিসংযোগ করলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। হাসি হাসি মুখ, তাকালেন রানার দিকে, খানিকটা নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে হাতের চুরুটটা নাড়লেন। 'রিপোর্ট তো দেবেই, তার আগে তোমার মুখ থেকে গল্পটা শুনতে চাই। বলো।'

'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান ও ভারতে গ্রেফতার হয়েছিলেন একরামুল হক, এই মিথ্যে তথ্যটা সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে আমাকে,' বলল রানা। বসের চেম্বারে, একটা হাতলহীন চেয়ারে বসে রয়েছে ও। 'কোত্থেকে পেলাম তথ্যটা? রিয়াজুল হাসানের দেয়া নোট থেকে। তথ্যটা সত্যি বলে সমর্থন করল কে? ভুয়া রফিকুল বারী। প্রজেক্ট ডিরেক্টরের সাথে কথা বললাম। উনি বললেন, হ্যাঁ, রফিকুল বারী আর একরামুল হক সম্পর্কে একটা নোট উনি রিয়াজুল হাসানকে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাতে একরামুল হকের গ্রেফতার হওয়ার কোন তথ্য ছিল না। মূল কপিটা দেখেই কথাটা আমাকে জানালেন তিনি। তারমানে ওটা রিয়াজুল হাসানের বানানো তথ্য। কারণটা পরিষ্কার, তদন্তে দেরি করানো বা আমাকে ভুল পথে চালানো। কাজেই রিয়াজুল হাসানই অপরাধী।'

কাপে আরেকবার চুমুক দিয়ে রুমালে ঠোঁট মুছলেন রাহাত খান। 'তাকে সন্দেহ করার এটাই কি তোমার একমাত্র কারণ ছিল?'

'না, স্যার। এটা জানার পর আরও কয়েকটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগল। প্রথমবার যেদিন তার সাথে আমি দেখা করতে গেলাম, সে আমার পরিচয় জানতে চায়নি। ব্যাপারটা শুধু অবহেলা নয়। সে অপরাধী, কাজেই আমি ভুয়া হলে তার কিছু আসে যায় না। বরং আমি ভুয়া হলেই তার জন্যে ভাল হত।'

'তাছাড়া বিজনেস সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিরা তাকে তো আগেই জানিয়েছিল যে তার সাথে একজন দেখা করতে আসছে।'

'জী, স্যার। তারপর, তার বাড়িটা। বাড়ির সামনে দিয়ে খানিক পর পর একটা

করে ট্রেন যাচ্ছে। তার মত সচ্ছল এক জন লোক, নিরিবিলি পরিবেশ যার একান্ত দরকার, কেন সে ওই পরিবেশে থাকবে? আমাকে বলল বটে যে আওয়াজে তার কোন অসুবিধে হয় না, কিন্তু পরে দেখলাম ল্যাবের ছাদে আরও অনেক কম আওয়াজ হলেও রাগে ছটফট করছিল সে। তারমানে ওই বাড়িতে থাকার বিশেষ একটা কারণ আছে। কারণটা এখন আমরা জানতে পেরেছি।'

'লোকটাকে খুব একটা চালাক বলা যায় না, কি বলো?'

'কিন্তু অভিনেতা হিসেবে খুব ভাল, স্যার। ভুল করেছে ছোট্ট দু'একটা ব্যাপারে। একরামুল হক সম্পর্কে মিথ্যে তথ্যটা আমাকে দেয়া বোকামি হয়ে গেছে। তবে, আইডিয়াটা তার ছিল না…'

'তুমি তাহলে সন্তুষ্ট যে প্রজেক্ট জিরো-জিরো-ওয়ান এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ…?'

'সুব্রত আর শারমিন নিষ্কলঙ্ক,' বলল রানা। 'রিয়াজুল হাসান না থাকায় গবেষণার তৃতীয় পর্যায়টা ফাইনাল করতে ওদের বেশ অসুবিধে হবে, তবে বেশ কিছু সময় দেয়া হলে কাজটা শেষ করতে পারবে বলে দু'জনেই ওরা আশাবাদী।'

'ওরা কি ইতিমধ্যে…?'

'জ্বী, স্যার। সুব্রত আর শারমিন কাজে যোগ দিয়েছে। আর…'

রানাকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে রাহাত খানের ভুরু কুঁচকে উঠল। 'হ্যাঁ, বলো।'

'না, মানে…ওদের দু'জনের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ছিল, সেটা আমি মিটিয়ে দিয়েছি। ব্যক্তিগত ব্যাপার…মানে…ওরা আগামী হপ্তায় বিয়ে করতে যাচ্ছে।'

'গুড।' খুশি হলেন রাহাত খান। কারণটাও বোঝা গেল। 'ওরা এখন আরও মন দিয়ে গবেষণা চালাতে পারবে। ভাল কথা, ওদের তিনজনকে নিয়ে কি করা হবে কিছু ভেবেছ?'

'সমস্ত কিছু লিখে একটা স্বীকারোক্তিতে সই করেছে রিয়াজুল হাসান। কিন্তু বাকি দু'জন মুখ খুলবে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয়, স্যার, ওদের কেস বাইরে প্রকাশ না পাওয়াই ভাল।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই বিশ্বাস। ঠিক আছে, এ-ব্যাপারে কি করা যায় দেখব আমি। সুযোগ পেলেই মেরে সাফ করো, তারপর একদম চুপ! বিজনেস সিন্ডিকেটের জন্যে এটাই সবচেয়ে ভাল ওষুধ। ঠিক আছে, এখন তুমি যেতে পারো। পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত ঢাকায় থাকছ তুমি।'

কি যেন বলতে যাচ্ছিল রানা, রাহাত খান ওকে থামিয়ে দিলেন। 'ছুটি চেয়ো না, কারণ তোমার টেবিলে অনেক কাজ জমা হয়ে আছে।'

'না, মানে, স্যার,' ঢোক গিলে বলল রানা, 'ওদেরকে আমি কথা দিয়েছি বিয়েতে উপস্থিত থাকব…'

একটা ফাইল খুলে তাতে মনোনিবেশ করলেন রাহাত খান, যেন রানার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা নেই। বসে থাকতে সাহস হলো না রানার, সাহস হলো না আর কিছু বলার। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে, ঘুরল, দরজার দিকে

কে রাহাত খান বললেন, 'রওনা হবার আগে
হলে আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু সময় হবে না।
টশন পাওনা হয়েছে ওদের, সাথে করে নিয়ে যেয়ে
!' এক বুক আনন্দ নিয়ে বসের চেম্বার থেকে বেরি

***